খানি আজও তার মধ্যে রয়ে গেছে। কারণ রসনির্ঝর-ধারার বিন্দুটুকুর আস্বাদও যে একবার পেয়েছে তার কাছে যা কিছু সুন্দর তাই চিরবিস্ময়ের জিনিস। সুন্দর তাকে কখনো ক্লান্ত করে না, তার অন্তরে অবসাদ আনে না।—অবশ্য সেই সুন্দরকে দেখবার ধরণের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আজ ঘটেছে, আর সে পরিবর্ত্তন কালের ধর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী।

যাই হোক কালে এপিকের চিরবিস্ময়ের যুগ কেটে গেল। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হতে লাগল। ব্যক্তিও একটু একটু করে সমষ্টিগত অস্তিত্বের বাইরে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। ব্যক্তির দুঃখ-বেদনা তখন সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠল।

সেই যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় মহাকবি কালিদাসের লেখায়। মেঘদূতে বিরহী যক্ষের যে বর্ণনা তিনি করে গেছেন সে তো কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখে নি। সুদূর অতীতের সমস্ত বিরহীদের অশ্রুজল মন্দাক্রান্তা ছন্দের মন্থর গতির মধ্যে দিয়ে বহন করে এনে তিনি ভবিষ্যতের অনাগত সব বিরহীর নয়ন জলের উৎস-মূলে গোপনে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

এখানে বিস্ময়ের বস্তু হচ্ছে ব্যক্তি ও তার বিচিত্র অনুভূতি। ব্যক্তির বাইরে যে বস্তুজগৎ পড়ে আছে তার প্রয়োজন শুধু ততটুকু যতটুকু সে ব্যক্তির অনুভূতিকে ঘনীভূত হতে সাহায্য করে। ব্যক্তিগত চেতনার যুগের সূচনা হয়েছে, অনুভূতির গভীরতা ক্রমশই মানুষের মনে খাল কেটে চলেছে। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার প্রভৃতি নাটক ও কাব্য সে-যুগের সাহিত্যের চরম নিদর্শন। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার মনে হয় মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের কোন কোন অংশ ছাড়া বেশীর ভাগ লেখাই উঁচুদরের সাহিত্য নয়।*

সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণায় যে সৌন্দর্য্য মাখানো আছে, আকাশের নীলিমায়, ধরণীর শ্যামলিমায়, পুষ্পের পেলবতায়, নদীর জল-ধারার কৌতুক-গতিতে—এক কথায় সৃষ্টির সমস্ত বস্তুর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য বিরাজমান ভাষার মধ্যে যখন সেই সৌন্দর্য্যের আভাষ ধরা পড়ে তখনই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ যেমন বাইরের বস্তুজগতের সৌন্দর্য্যের কথা বল্লুম তেমনি মানুষের অন্তরে যে অসংখ্য অব্যক্ত অনুভূতি আছে সেই অনুভূতির সৌন্দর্য্যকে ভাষায় প্রকাশ করাও তেমনি সাহিত্যের অন্যতম কাজ। এই সৌন্দর্য্যবোধ—যার উপর সাহিত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে তার সম্বন্ধে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য পুস্তকে সৌন্দর্য্য-বোধ নামক প্রবন্ধে কি বলেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই। তিনি তাঁর প্রবন্ধের একস্থানে লিখছেন, "ছবি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি, সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রং চং বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুসি হইয়া উঠে। ছবিকে সে বড় ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না······যে ব্যক্তি সমজ্‌দার ছবিতে সে রংচঙের ঘটা দেখিলেই অভি-ভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারিপাশের, সম্মুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রং চং চোখে ধরা পড়ে কিন্তু সামঞ্জস্যের

* এখানে একটি কথা বলে রাখার প্রয়োজন বোধ করি। কালিদাসের লেখার সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তৎসত্ত্বেও কালিদাসের লেখা উদ্ধৃত করে আমি যে মন্তব্যগুলি দিয়েছি সেগুলো কালিদাসকে বর্ণনামূলক, দেহবাদী সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে ধরে, Type হিসেবে ধরে।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখবার প্রয়োজন আছে। এ প্রবন্ধে ঐতিহাসিক ক্রমাভিব্যক্তির দিক থেকে সাহিত্যের বিচার করিনি, রসের দিক থেকে সাহিত্যের বিচার করতে প্রয়াস করেছি।

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে এমন অনেক জিনিসকে সাহিত্য বলে স্বীকার করতে হয় অথবা সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিতে হয় যাদের রসের দিক থেকে কোন মতেই উঁচুদরের সাহিত্য বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

এ প্রবন্ধে সাহিত্যকে রসের যথার্থ অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক থেকে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করেছি।

সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীর ভাবে দেখিতে হয়, এইজন্ত তাহার আনন্দ গভীরতর।……তবেই দেখা যাইতেছে শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায় না। সৌন্দর্য্য-বোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্র চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর আর একদিকে অসুন্দর এই দুয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট। তারপরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্য্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিষটা আমাদের মনকে টানে, সেটা হয়ত চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। তারপরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরো বাড়িয়া যায়, সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরো ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে। যেখানে ধৈর্য্য-বীর্য্য, ক্ষমা, প্রেম আলো ফেলে সেখানে রংচঙের আয়োজন আড়ম্বরের কোন প্রয়োজনই আমরা বুঝি না।"

কালিদাসের লেখায় সেই মনের দৃষ্টির অভাব আছে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা মেঘদূত তাতেও বিরহের বর্ণনা objective, subjective নয়। চিত্রকূট পাহাড়ে নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ উপস্থিত হয়েছে। সে আষাঢ়ের মেঘকে অনেক অনুনয় বিনয় করে অলকা-পুরীতে তার প্রিয়ার কাছে তার বারতা পৌছে দেবার জন্যে দৌত্যকার্য্য করতে রাজি করেছে। এই ভূমিকার পর অলকায় যেতে হলে মেঘকে কোন্ পথে যেতে হবে, কোন্ কোন্ জনপদ পথে পড়বে, কোন্ কোন্ নদী অতিক্রম করে যেতে হবে, অলকারই বা পথঘাট কি রকম, সেই অলকাপুরীতে তার নিজের বাসগৃহই বা কি রকম— এই সব বর্ণনায় কাব্যটি আদ্যোপান্ত পূর্ণ। বিরহের ব্যথা আষাঢ়ের মেঘের মত মেদুর হয়ে উঠতে পারল না, শ্রাবণের ধারার মত অবিশ্রান্ত বরিষণেরও আভাস দিল না, শরৎ-এর মেঘের ক্ষণিক ধারার মত মৃদু বরিষণেই সমাপ্তি হোল। তার কারণ আমার মনে হয় যে, কালিদাসের প্রতিভা ছিল বর্ণনায়, বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় ও সেই প্রকৃতিকে যথাসম্ভব মানব-ধর্ম্ম আরোপ করবার নিপুণতায়। মানুষের অন্তরলোকের বিচিত্র রস-নির্ঝর-ধ্বনি তাঁর কাণে এসে পৌছয় নি।

তাই দেখি, মেঘদূতে বিরহের প্রসঙ্গটা যেন গোড়া থেকেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। নেহাৎ যেন বর্ণনার খাতিরে ওকে টেনে আনা হয়েছে। তারপর তাকে কঠোর হস্তে সরিয়ে দিয়ে বর্ণনার আনন্দে কবি মেতে উঠেছেন। সেই বর্ণনার মধ্যে বিরহের একটা সুর ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।—প্রকৃতির মধ্যেও এতদিন যে শুষ্কতা ছিল আজ তারও পরিপূর্ণতা ঘটবে, নদীর ক্ষীণতা দূর হবে, জনপদ বধূ আকাশের দিকে চেয়ে, হে আষাঢ়ের মেঘ, তোমাকে, তাদের অভিনন্দন জানাবে। আর এই সময় অলকাপুরীতে নারীরা কি করে থাকেন সে কথাও কবি বলেছেন।

> গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
> রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভি
> সৌদামিণ্যা কনকনিকষা স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
> তোয়োৎসর্গ স্তনিতমুখর মাস্মভূ বিক্লবাস্তাঃ।

সেই সময় অন্ধকার রাজপথ দিয়ে অভিসারিকারা চলেছে তাদের প্রিয়ের উদ্দেশ্যে। ঘন অন্ধকার। শুধু আকাশের বিদ্যুৎ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে সময় তুমি বারিধারা বর্ষণান্তে শান্ত হয়ে থেকো, বজ্র-শব্দে তাদের ভীতি উৎপন্ন কোর না।

চমৎকার একটি ছবি। এমনি কতশত ছবি কাব্যের মধ্যে সর্ব্বত্রই ছড়ান আছে। কিন্তু বিরহের অনির্ব্বচনীয় রূপের ব্যঞ্জনা এতে নেই। আছে দৈহিক ভোগের অভাবের কামতৃষ্ণার ব্যাকুলতা।

দেহের সীমা ছাড়িয়ে বিরহ অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি। *প্রিয়ার দেহের যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য* সেই সৌন্দর্য্য এখন আর ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। সেই

তন্বী, শ্যামা শিখরিদশনায় বিরহ কালিদাসের যক্ষের কাছে নিছক দেহমূলক বিরহে পর্য্যবসিত হয়েছে।

কিন্তু বিরহ তো শুধু দেহের বিরহ নয়। আমি দেহের বিরহ অস্বীকার করছি না কিম্বা তাকে হেয় বলছি না, কিন্তু দেহের বিরহকে একান্ত বলে মেনে নিতে ত পারি না। চেতন-অচেতন সংখ্যাতীত অনুভূতির সমষ্টি এই মানবের মন যখন অন্য আর একজনের মনের মধ্যে আপনাকে বিস্তার করে, অনুভূতির ঐক্যে এক হয়ে যায় সেই মনের অভাব কি বিরহ আনে না? সে বিরহের ছবি কৈ কালিদাসের কাব্যে?

রঘুবংশকে দিলীপ ও তাঁর বংশধরদের একটি কুলজী বল্লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। দিলীপ থেকে স্বরু করে তাঁর বংশের অনেকগুলি রাজার স্বতন্ত্র কাহিনীর মালা গেঁথে কালিদাস এই পুস্তক রচনা করেছেন। খণ্ড খণ্ড ছবির সমষ্টি এই রঘুবংশ। কোন একজনের চরিত্রকেও ফুটিয়ে তোলা হয় নি। শুধু বর্ণনা করে কবি ক্ষান্ত হয়েছেন।

কুমারসম্ভবও কতকগুলি চিত্রের সমষ্টি। হিমালয়ের বর্ণনা ও তারপরে পার্ব্বতীর জন্ম থেকে স্বরু করে পার্ব্বতীর বিবাহ পর্য্যন্ত কতকগুলি ছবি কুমারসম্ভবে আছে। কিন্তু একমাত্র এই কুমারসম্ভব কাব্যেই কালিদাস স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম অন্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। উমা শিবের জন্য তপস্যায় রত এমন সময় ছদ্মবেশী শিব উমার কাছে এসে শিবের রূপগুণ ও স্বভাবের নিন্দা স্বরু করলেন। তখন উমা বললেন, "কি হবে তাঁর রূপ গুণ বয়স ঐশ্বর্য্যের কথা জেনে! আমি অন্তরের মধ্যে তাঁকে উপলব্ধি করেছি, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই:—মমাত্র ভাবৈক রসং মনঃ স্থিতম্—মন আমার ভাবের রসে প্রিয়তমকে উপলব্ধি করেছে, আনন্দের জন্যে আর অন্য উপকরণের প্রয়োজন নেই।

এই বাইরের উপকরণের প্রয়োজন যেখানে নেই অন্তরের আলোতে আপনি ও প্রেমাস্পদ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, প্রেম দেহের সৌন্দর্য্যে পর্য্যবসিত হয় নি—এমন আর একটি ছবি কালিদাসের লেখায় নেই। কারণ এই একই কাব্যে রতির বিলাপ বর্ণনা করতে গিয়ে কালিদাস যে ছবি এঁকেছেন তাতে নিপুণতা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে হৃদয়কে উদ্বেল করে তোলে এমন কিছুই নেই। সেই তাঁর চিরাগত প্রথায় তিনি কতকগুলি ছবি এঁকে গেছেন—নিকষ-ঘন অন্ধকার পথে মেঘ গর্জ্জনে সচকিতা অভিসারিকা, বারুণী সুরাপানে রক্তিমনয়না নারীর দল, তারপরে এল বসন্ত ঋতু তার সব দল বল নিয়ে দক্ষিণ বাতাসকে নিয়ে কোকিলকে নিয়ে, এমন সময়ে মদনের অভাবে সবই বুঝি নিষ্ফল যায়, হে অনঙ্গ, তুমি ফিরে এসে এদের গতি কর।

ব্যথা কোথায়, আবেগ কোথায়, বিরহের শুচি-স্নিগ্ধ কান্তিরই বা আভাষ কোথায়? আছে শুধু ভোগের অভাবে হা-হুতাশের বর্ণনা। অথচ সেই যুগের মহাকবি ভবভূতির উত্তর রামচরিত কালিদাসের কাব্যের মত কেবল মধুর ও সুন্দর কতকগুলি ছবির সমষ্টি নয় সেখানে মেঘ-গর্জ্জনের মত গম্ভীর নির্ঘোষ যেমন প্রকৃতির নিবিড় নিশ্চল গাম্ভীর্য্যে মুদ্রিত হয়ে ওঠে, তীব্র করুণ আবেগে সেইরূপ মানব হৃদয়ের সমস্ত গভীর সুখ, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ প্রগাঢ় হয়ে আসে। উত্তররামচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্যে দিয়ে ভবভূতি একটি করুণ বেদনার সঞ্চার করেছেন। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যেন কোন প্রিয়বিরহাকুল হৃদয় বিন্দু বিন্দু করে আপনাকে বিরহেতে ব্যস্ত করে দিচ্ছে। কালিদাস যেখানে ফুল, মালা, চন্দন-বিলাস ইত্যাদির বর্ণনা দ্বারা খণ্ড সৌন্দর্য্যের উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরে অবগাহন করে মানব হৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করে প্রিয়জনকে সেই বেদনার সমুদ্র থেকে মন্থন করে তোলেন, প্রিয়জন সেখানে পাওয়া, না-পাওয়ায়, প্রবোধে, নিদ্রায়, অচৈতন্যে, চৈতন্যে মিলিয়ে গেছেন।

কালিদাসের কাব্যে বিরহ বিলাস লালসার বেশে মোহ উদ্রেক করে, ভবভূতির লেখায় একটা সমগ্র সংহত বিরহের বিরাট গাম্ভীর্য্য মনকে অভিভূত করে।

ঋতুসংহার কাব্যখানি কালিদাসের সব কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট ব'লে আমার মনে হয়। কবি ছয় ঋতুর বর্ণনা

করেছেন। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের হৃদয়ে ভাবের যে পরিবর্ত্তন ঘটে সেই পরিবর্ত্তন কবি দেখিয়েছেন। কিন্তু দেখিয়েছেন কি করে? বিলাসিতার ছবি এঁকে, নারীকে শুধু ভোগ্য বস্তু বানিয়ে, তাকে বিলাসিনী করে, মোহিনী করে।—প্রিয়ারূপে নয়, কল্যাণীরূপে নয়। গ্রীষ্ম এল, কি করা যায়? কিছুই ভালো লাগছে না। শীতল জল, সুন্দর ঘর আর প্রিয়ার মুখচন্দ্রমা তখন একমাত্র আনন্দের বস্তু। তারপরে সুরু হল, প্রিয়া কি রকম বস্ত্র পরিধান করবেন, কি কি অলঙ্কারই বা পরবেন,—ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা। প্রিয়াকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য অন্য বস্তুর মত শুধু ভোগের বস্তু বানিয়ে তোলবার একটা অতি স্থূল আনন্দ এই কাব্যে ফুটে বের হচ্ছে। প্রেমের গভীরতম অনুভূতিতে এক হয়ে যাবার ছবি এতে নেই। এমনি করে কালিদাস বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তের বর্ণনা করে গেছেন। ঋতুর বর্ণনায় স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু ঋতুসংহার করবার উপায় সেই একই প্রিয়া!

এখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার কথা ছেড়ে দিলেও, কালিদাসের কাব্যে যে অপূর্ব্ব বর্ণনা আছে তাকে কি তুমি খুব উঁচুদরের জিনিস বলে মনে কর না?

এ প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বর্ণনামূলক কাব্যও কাব্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিছক্ বর্ণনাই কাব্যের প্রাণ নয়। যখন কেউ দেশভ্রমণ করে এসে একটা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বসেন তখন তিনি সেই ভ্রমণবৃত্তান্তে সেই দেশের আকার কি রকম, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কি রকম, তার অধিবাসীরাই বা কি রকম ইত্যাদি বহু বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, আর সে ভ্রমণ-বৃত্তান্তও হয়ত সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু কাব্য তো সে রকম বর্ণনার সমষ্টিমাত্র নয়। প্রকৃত কাব্য কাকে বলে সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রাচীন সাহিত্য-দর্পণকার বলেছেন যে, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।"—রস যার আত্মা এমন বাক্যকেই কাব্য বলা যেতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হবে যে, কেন, নিছক্ বর্ণনাতে কি রস নেই? মানুষের মনকে নাড়া দেয় এমন বস্তু কি তাতে নেই? নিছক্ বর্ণনামূলক বাক্যই বা কাব্য হবে না কেন? সাহিত্য নয় কেন?

এ-কথার উত্তরে আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকরা যা বলেছেন সেটা আলোচনা করে দেখলে ক্ষতি হবে না। তাঁরা বলেছেন শুধু বচন-বিন্যাসের রীতিতে নয়, শুধু অর্থযুক্ত বাক্যের ছন্দোবদ্ধতায় নয়, অলঙ্কার, অনুপ্রাস, উপমাবহুল বাক্যের সমষ্টিতে বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে না। তাই যদি হত তাহলে,

"উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

ও কাব্য হয়ে উঠত। কারণ এতে ছন্দ আছে। আর এই বাক্যের যে বিশেষ মানে আছে তা স্বীকার করতেই হবে, যদিও এতে অলঙ্কার উপমার বাহুল্য নেই।

তাহলে কিসে কাব্য হয়?

আলঙ্কারিক বলেছেন, ব্যঞ্জনায়।—অর্থাৎ বাক্য যখন শুধু শব্দার্থ ত্যাগ করে আর একটি গোপন অথচ সুগভীর অর্থকে প্রকাশ করে তখনই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। শুধু কথার কথার মানে নয়, বাক্যের প্রত্যক্ষ মানে যেখানে বাক্যের অতীত লোকে মনকে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেইখানেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে।

এই ব্যঞ্জনা, শব্দার্থ ছাড়িয়ে অন্য আর একটা কিছুর ইঙ্গিত মেঘদূতে স্থানে স্থানে দেখা দিয়েছে আর স্থানে স্থানে দেখা দিয়েছে কুমারসম্ভবে ও শকুন্তলা নাটকে। সেই কারণেই তারা সাহিত্য বলে গণ্য হয়েছে।

অবিশ্যি এমন অনেক জিনিস সাহিত্য বলে চলে গেছে বা চলে যায় যাতে ব্যঞ্জনার চিহ্নমাত্র নেই। কালিদাস এক জায়গায় বিরহের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ
বসতিংপ্রিয় কামিনীং প্রিয়াঃ
ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ।

নয়নাঞ্চলরুণানি ঘূর্ণয়ন্
বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
প্রমদানাং অধুনা বিড়ম্বনা।—ইত্যাদি

রজনী তিমির অবগুণ্ঠিতা, বক্ষশব্দে অভিসারিকা সচকিতা, বারুণীমদে অঙ্গনাদের নয়ন লোহিতাভ হয়েছে, বচন স্খলিত হয়েছে, এমন সময়ে হে মদন, তুমি না আসিলে যে সবই বৃথায় যায়।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের আর এক কবি এই বিরহের কথা বলতে গিয়ে বলছেন—

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।

শ্যামের কোলে রাধা বসে আছেন, গভীর ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধা, কিন্তু দুজনই কেঁদে আকুল হচ্ছেন ভাবী বিরহের কথা স্মরণ করে।

চণ্ডীদাসের এই পদে ভাবী বিরহের যে মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে সে মূর্ত্তিতে বিচ্ছেদের এমন একটি নিবিড় রূপ মূর্ত্তি নিয়েছে যে মন সিক্ত হয়ে ওঠে। দুজনে দুজনকে পেয়েছেন তবুও ভাবী বিরহের আশঙ্কায় দুজনেই কেঁদে আকুল,—সেই আকুলতার ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা ঐ কটি লাইনে কি অপূর্ব্ব গভীরতা নিয়েই না আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে!

সেই সময়ের আর একজন কবি বিরহের কথা বলতে গিয়ে যখন বলেছেন, 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর'—তখন যে বিরাট শূন্যতার ছবি এঁকেছেন সে ছবির তুলনা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির লেখায় পাওয়া যায় কি?—আজ মন্দির শূন্য, প্রেম যাকে দেবী করে তুলেছে সে নেই, তার জন্যে এই ভরা ভাদরে কাঙাল মন আথারি বিথারি করে মরছে।—বাক্যের মধ্যে দিয়ে বাক্যের অতীতকে ফুটিয়ে তোলার কি অপূর্ব্ব নিদর্শন বিদ্যাপতির এই সৃষ্টি!

আমাদের যুগের মহাকবি এই বিরহকে কি চোখে দেখেছেন তারও একটা উদাহরণ দিই—

দিন চলে যায় আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী
কিম্বা যার লাগি ফিরি একা একা
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা
তারি বাঁশী ওগো তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি
বাণী নাহি তবু কানে কানে, কি যে শুনি তাহা কেবা জানে
এই হিয়া ভরা বেদনাতে বারি ছল ছল আঁখি পাতে
ছায়া দোলে তার ছায়া দোলে ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি।

এই কবিতা কটি ব্যঞ্জনা বলতে কি বোঝায় তারি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করে দিলাম। বর্ণনা যে কবিতার উদ্দেশ্য সে কবিতাকেও এই ব্যঞ্জনা কেমন করে মাধুর্য্য-মণ্ডিত করে তোলে, তা আমরা একটু বিচার করে দেখলেই বুঝতে পারব।

কালিদাস কুমারসম্ভবে গৌরীর রূপ বর্ণনা করেছেন। সেই রূপ বর্ণনার দু একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দিই—

প্রবাতনীলোৎপলনির্ব্বিশেষমধীর বিপ্রেক্ষিত মায়তাক্ষ্যা
তয়া গৃহীতংনু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতংনু মৃগাঙ্গনাভিঃ
লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাৎসংশয়ং পর্ব্বতরাজ পুত্র্যাঃ
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যবালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ।
মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা
আরোহণার্থং নব যৌবনেন কামস্য সোপানম্ ইব প্রযুক্তং।

কিন্তু এই রূপ বর্ণনায় মন তৃপ্ত হল কি? কিসের যেন একটা অভাব রয়ে গেল! পার্ব্বতীর চোখের সঙ্গে হরিণের চোখের তুলনা করা হয়েছে, তাঁর কেশভারের সঙ্গে চামরীর পুচ্ছের তুলনা করা হয়েছে, কটিমধ্যকে যজ্ঞ বেদিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—এমনি করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করে কত শত বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় কি সত্য সত্যই

মনের মধ্যে রস ক্ষরিত হয়? চোখের আয়তন কতখানি ছিল, চোখের রঙ যথোপযুক্ত কালো ছিলো কি না, ওষ্ঠের রঙ বান্ধুলী পুষ্পের রঙকে হার মানাবার মত ছিল কি না, কেশের দীর্ঘতাই বা কতখানি ছিল ইত্যাদি দেহমাত্রিক বর্ণনাকে কি মানুষের মন রসের ঐকান্তিক নিদর্শন বলে গ্রহণ করতে পারে? শুধু চোখের আয়তন জেনে কি হবে, সেই চোখের মধ্যে প্রাণের বিচিত্র অনুভূতি ক্ষণে ক্ষণে কি রূপে ধরা দেয় তার বার্ত্তা যদি না পাই! শুধু অধরের বর্ণ জেনে কি লাভ, যদি সেই অধরের মধ্যে অকথিত যে বাণীর কিশলয় অস্ফুট অবস্থায় আছে তার কোন ছায়া যদি ভাষার বন্ধনে না ধরা দেয়! এই সব কবিতায় সৌন্দর্য্যকে শুধু দেহের সীমায় বদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কই সে কবি যিনি বলবেন—

'দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা
দেখেছিনু পুলকের লজ্জিতের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা
রূপতরঙ্গিমা

সুন্দরের এই অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা খুব কম কবির চোখেই ধরা দিয়েছে। তাই বস্তু-তান্ত্রিক কবির দল বস্তু বর্ণনাকেই কাব্যের চরম নিদর্শন বলে মনে করেন। আমাদের এই যুগের এক কবির লেখায় এই বস্তু-বর্ণনা কি রূপ নিয়েছে তা দেখাই—

আজ-লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,
বুকে পীন যৌবন উঠিছে ফুঁড়ি,'
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি!—ইত্যাদি

যদি বলি যে এ কবিতায় কোন ব্যঞ্জনা নেই, তাহলে আমার কবিবন্ধু হয় ত বলবেন, কেন রস তো প্রচুর পরিমাণে আছে, ব্যঞ্জনা নাই বা থাকল!

কিন্তু রস তো সেই যা বাক্যের রেখা বন্ধনে ধরা দেয় না, বাক্যের ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে তার আভাষ দেয়। আর ব্যঞ্জনার বাইরে তো রস নেই।

প্রশ্ন উঠবে, কেন পীন যৌবন, কাম-কণ্টক ব্রণ ইত্যাদি এমন সব রসের কথা বলা হয়েছে, তবুও কিনা বলছ যে রস নেই? মানুষের দেহ-বর্ণনায় কি রস নেই? মানুষের দেহ কি এমনি নিকৃষ্ট বস্তু যাকে বর্ণনা করলে সমস্ত রস নষ্ট হয়ে যায়?

নিশ্চয়ই না। মানুষের এই দেহ বিধাতার আশ্চর্য্য সুন্দর সৃষ্টি, মানুষের চির আনন্দের চির বিস্ময়ের বস্তু, চিরন্তন কামনার ধন। কিন্তু মানুষের দেহের এই সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশই বা কিসের উপর নির্ভর করে, সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত। মুখ চোখ নাক নিখুঁত হলেই কি একজনকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলতে পারি? আমি এ রকম লোক দেখেছি যার মুখের মধ্যে কোনই খুঁত ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও অমন মরা অমন কুৎসিত মুখ আমি খুব কম দেখেছি। আবার এমন লোকও দেখেছি যার মুখের মধ্যে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে হয় ত নিখুঁত কোন কিছুই পাওয়া যাবে না, অথচ চোখ তার মুখের উপর বারবার আছড়ে পড়েছে, কখনো ক্লান্তি মানে নি,—এম্‌নি সুষমা এম্‌নি অম্লান কান্তি সেই মুখের।

প্রশ্ন হবে, কিসের এই পার্থক্য, কিসের জন্যে নিখুঁত একটি মুখও অবয়বের দিক থেকে দেখতে গেলে তার চেয়ে নিকৃষ্ট একটি মুখের কাছে ম্লান হয়ে পড়ে?

যার অভাবে সৌন্দর্য্য পরম বিকাশ লাভ করে না, প্রাণহীন হয়ে থাকে সেটি হচ্ছে লাবণ্য। এই লাবণ্য বস্তুটি কি তাই বলতে গিয়ে প্রাচীন কবি বলেছেন যে—মুক্তাফলেষু তারল্যং তল্লাবণ্যং ইহোচ্যতে—অর্থাৎ মুক্তাফলের উপর যে তরলতা পিছলে পড়ছে দেখতে পাই তাকেই লাবণ্য বলে।—দেহের সীমায় এই লাবণ্য ধরা দেয় বটে কিন্তু এর উৎপত্তি হচ্ছে মানুষের অন্তরলোকে। অন্তর লোকের এই রস যা দেহের সীমায় এসে দেহকে এমন কমনীয় করে তোলে তার সন্ধান যে না পেয়েছে সে দেহকে শুধু মাংসস্তূপ বলে দেখে আর একটা বীভৎস লেলিহান মাংস-লোলুপতার ছবি এঁকে তাকে সুন্দরের পূজা মনে করে।

দেহের সৌন্দর্য্যকে পূজা করে যে কবি, তার চোখে

মানুষ তো শুধু মাংসস্তূপ নয়। মানুষ দেহ, মন এম্‌নি কত কিছু অব্যক্ত গোপন অনুভূতির সমষ্টি। সেই অব্যক্ত গোপন অন্তর-ঐশ্বর্য্যের ছায়া মানুষের দেহের রেখায় রেখায় যখন উপচে পড়ে, তখনই দেহ সত্যিকার সৌন্দর্য্য পায়, দেহ পূজা পাবার অধিকার লাভ করে।

কবিকে মনে রাখতেই হবে যে, দেহের আকার-তত্ত্ব শেখানো তাঁর কাজ নয়।

সৌন্দর্য্য-সাধনার ও সৌন্দর্য্য-প্রকাশের ভার যে নেবে তাকে সংযম সাধনা করতেই হবে। এ সংযম সাধনা সৌন্দর্য্যের সংযম সাধনা। এ নীতিবাদীর সংযম সাধনা নয়—সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকের সংযম সাধনা নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সৌন্দর্য্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেম্‌নি আমাদের সৌন্দর্য্যভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরায়ণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী তো পারে না। আমাদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে, তবে কি হয়? সে কেবল সৌন্দর্য্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মত্ততাকে আনন্দ বলিয়া ভুল করে, যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত, তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য্য সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নয়। যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।" তিনি আরো বলিতেছেন যে—"একথা ধর্ম্মনীতি প্রচারের দিক হইতে বলিতেছি না, আনন্দের দিক হইতে যাহাকে ইংরাজীতে আর্ট বলে—তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে শুধু ধর্ম্মের জন্য নয়, সুখের জন্যও সংযত হইতে হইবে। সুখার্থী সংযত ভবেৎ।"

মোটকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আনন্দের ও রসের পরিপূর্ণতা, অখণ্ডতা ও সমগ্রতা যিনি উপলব্ধি করতে চান তিনি শুধু বাইরেটাকে একান্ত করে দেখেই ক্ষান্ত হন না, বাইরের সঙ্গে ভিতরের, বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে অন্তরের সামঞ্জস্য খুঁজে নেন। এই সামঞ্জস্যের অনুভূতিতে যে রস সৃষ্টি হয় তাই সাহিত্যের চিরন্তন বস্তু।

সমগ্র দৃষ্টির অভাব যাঁর সে কবির সৌন্দর্য্য-সাধনা খুবই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে বলতেই হবে।

যে কবিতাটি কিছু আগে উদ্ধৃত করে দিয়েছি সেটি হচ্ছে আমার বন্ধু কবি নজরুল ইস্‌লামের। কবিতাটিতে একটা মাংস লোলুপতা ফুটে বের হচ্ছে। নারীকে শুধু মাংসপিণ্ড ভেবে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু কবি ত ফোটোগ্রাফার নন্, কবি শিল্পী। ফটোগ্রাফের মানুষের সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্ট মানুষের যে কত বড় প্রভেদ আছে তাতো রসজ্ঞ লোকমাত্রেরই জানা আছে। ফটোগ্রাফে মানুষ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে দেখা দেয়, তার বাইরের রূপটুকুই ধরা দেয়, তার আসল পরিচয় মেলে না। শিল্পীর তুলিতে সেই মানুষেরই আবার একেবারে অন্য রূপে দেখা পাই, তার অপ্রধান অংশগুলো শিল্পী বর্জ্জন করেন তার রূপকে প্রাধান্য দেবার জন্যে, ভিতরের সঙ্গে বাইরের একটা ভাবমূলক যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে। তাতে দেহ ছোট হয়ে যায় না, তার গৌরবহানি হয় না, তাতে দেহের যথার্থ লাবণ্যের বিকাশ হয়, গৌরব বাড়ে।

ফটোগ্রাফের সঙ্গে শিল্পীর আঁকা ছবির যে পার্থক্য আমার বন্ধু কবি নজরুল ইস্‌লামের এই কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সের লেখা 'তনু', 'চুম্বন', 'বিবসনা', 'দেহের মিলন' ও 'স্তন' কবিতাগুলির সেই পার্থক্য আছে বলে মনে হয়। খণ্ড রূপের বর্ণনায়ও সমগ্রতার আভাস দেওয়ার যে কি প্রয়োজন আছে তা যে কেউ এই কবিতা কয়টি পড়লেই সহজে বুঝতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

—'নারী, তোমার ঐ তনুখানি ভালবাসি। কেন না, ওই তনুর অন্তরালে একটি বিজন হৃদয় ঢাকা পড়ে আছে। সেই বিজন হৃদয়ের সুবাসে তোমার দেহখানি আকুল।

সেই গোপন হৃদয়ের সুবাসে আকুল তোমার দেহখানি বুকে তুলে নেব। নারী, তোমার বসন দূরে ফেলে দাও। তোমার অসীম সৌন্দর্য্যকে বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সঙ্গে এক করে তুমি দাঁড়াও। বিবসনা প্রকৃতির মত তুমি সুন্দর তুমি শুভ্র তুমি পবিত্র। নারী, তোমার প্রতি অঙ্গের পরশের জন্যে আমার প্রতি অঙ্গ কেঁদে মরছে। কিসের জন্যে এত ক্রন্দন জান তুমি নারী? তোমার দেহের সাগরে তোমার হৃদয় লুকানো আছে, তাই জন্যেই তো তোমার দেহের বেলাভূমিতে বসে আমি এত কেঁদে মরি। আমার এ দেহ এখন তোমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে বিলীন হয়ে যাবে'।

কোন্ সুর থেকে এই নারী-দেহকে কবি দেখেছেন তার আভাষ আমরা পেলুম। পাশ্চাত্যের দু-একজন কবিও এই নারীর বর্ণনা করতে গিয়ে কি ভাবে নারীকে দেখেছেন সেটা দেখবার ঔৎসুক্য হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মহাকবি ব্রাউনিং তাঁর Now বলে কবিতায় যে কথাটি বলেছেন তার ভাবার্থ দিলুম।

'নারী, তোমার সমস্ত জীবন আমি চাই না। তোমার সমস্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমি আমার কাছে পূর্ণ হয়ে এসো। তোমার অতীত জীবন আমি জানতে চাই না, এই একটি মুহূর্ত্তের পর তোমার যে জীবন সুদূর ভবিষ্যৎএর মধ্যে ছড়িয়ে আছে সে জীবনকেও আমি চাই না, সেই অতীত ও ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করে তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে পরিপূর্ণরূপে দেখা দাও। অতীত ও ভবিষ্যৎকে মন থেকে অপসারিত করেই না হে নারী, তুমি এই মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে! সেই এক মুহূর্ত্তে তোমার সমস্ত চিন্তা, তোমার আত্মা, তোমার চেতনা—সব জমাট হয়ে উঠবে, আর সেই মুহূর্ত্তে নারী আমি তোমাকে আমার পাশে পাবো। জীবনের সমস্ত অতীত সমস্ত ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নারী তুমি আমায় ভালবাসবে। কিন্তু হায় নারী কতটুকু তার পরমায়ু! তার প্রাণ কত ক্ষণিকের! তার আয়ু মাত্র এক মুহূর্ত্তের, কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে যে অনন্তের স্পর্শ পায়—যে মুহূর্ত্তে কপোল প্রাণের উত্তাপে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, বাহু প্রসারিত হয়, চোখ আপনা থেকে বুজে আসে, আর দুটি অধর একটি চুম্বনে মিলিত হয়।'

পাশ্চাত্যের আর একজন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের Leaves of Grassএর একটি কবিতার ভাবার্থ দিই—'নারী, তোমার দেহের, তোমার যৌবনের পরিপূর্ণ ভোগ আমি করবো, তোমাকে কিছুতেই আমি ছেড়ে দেবো না। তোমার মধ্যে আমার জীবন ভবিষ্যৎ-এর মধ্যে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, তাই তোমাকে চাই। বড় বড় সাম্রাজ্য যারা গঠন করবে, মহান্ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যারা করবে, আত্মত্যাগের দীপ্তিতে যারা সমস্ত মানুষের চেতনাকে উদ্ভাসিত করবে সেই সব মহান্ কর্ম্মী, মহান্ রূপস্রষ্টা, মহান্ ত্যাগী তোমার আমার মিলনের দ্বারা সৃষ্ট হবে। নারী, সেই অনাগত ভবিষ্যৎ-এর ছায়া তোমার মধ্যে দুলছে, সেই ছায়াকে আমি রূপ দেবো, তাই তোমার দেহকে চাই।'

এই প্রসঙ্গে একটি গান এখানে দিই। গানটি কেন্দুবিল্ব গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির দিন জয়দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে যে বিরাট মেলা বসে সেই মেলায় একজন বাউলের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। গানটি এই—

যে জন ডুবলো সখি তার কিসের আর বাকি গো
বঁধুর ভাবে।
তার কূল অকূল দুকূল গেল সদানন্দে সেই সুখিল
বঁধুর ভাবে।
যে জন গুরুর চরণ সদা সর্ব্বক্ষণ হৃদয় মাঝারে রাখে
শ্যামসোহাগিনী হইল যে ধনী তার কি কলঙ্ক থাকে গো
বঁধুর ভাবে।
পিরীতের রীত শোন তার চরিত উত্তম লোকেতে বলে
আনন্দবাজারে যদি রাখো তারে তবু সে কাঁদিতে হয় গো
বঁধুর ভাবে।
পিরীত কেমন প্রেমেরি মরম সেই জনা ভাল জানে
দিবানিশি বসি বঁধুয়ারে ডাকে পিরীতি ভাঙ্গিবে কেন গো
বঁধুর ভাবে।

(সে জন) লোকেরি বারণ না শুনে কখন কূলেতে দিয়েছে
কালি
ভবসিন্ধু পারে যেতে হবে তারে গেছে চলি বেলাবেলি গো
বঁধুর ভাবে।
গুরুর চরণে দায়েম ইহা ভণে শুন শুন রসবতী
মূঢ় জানে কয় সর্ব্বশাস্ত্রে জয় বঁধুপদে রেখো মতি গো
বঁধুর ভাবে।

মানুষ যখন রসের কেন্দ্রে পৌছয় তখন সে কি ভাবে রস সৃষ্টি করতে পারে তার চমৎকার নিদর্শন এই বাউলের গানটি। গানের কোন কথাটিই দুর্ব্বোধ্য নয়, অত্যন্ত সাদাসিদে কথায় লেখা, কিন্তু কি গভীরতা, কি মাধুর্য্যই না এই গানটিতে আছে! এই যে গভীরতা, এই যে শিশির-ধৌত পুষ্পের পেলবতা এই গানটিকে বেষ্টন করে আছে তার প্রাণ, তার মূল আছে ব্যঞ্জনায়।

ভাষার মধ্যে সৌন্দর্য্যের যে দিব্য অনুভূতি ছন্দের বন্ধনে ধরা দেয়, সে ছন্দ শুধু অক্ষর গুণে লাইন মেলানোর ছন্দ নয়, সে ছন্দ হচ্ছে অনুভূতি প্রকাশের বিশেষ ভঙ্গিমা। একই মুখকে একদিক থেকে দেখতে যত না সুন্দর লাগে অন্য দিক থেকে ঘুরিয়ে দেখলে তার সৌন্দর্য্য ততো প্রকাশিত হয়, আলোর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও পরিপূর্ণতা পায়। আলোর কাজ হচ্ছে আপনার প্রকাশের দ্বারা বিশ্বের সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করা। ভাষার কাজও সেই আলোর মত। যেখানে ভাষা অনুভূতির পরিপূর্ণতাকে প্রকাশ না করে নিজেকে জাহির করে সেখানে সে নিজের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে।

তাই প্রকৃত কবি যিনি তিনি ধ্যানী। তিনি উপলব্ধি করেন সুন্দরকে, আর সেই উপলব্ধির গভীরতা থেকে তিনি যা সৃষ্টি করেন তার মধ্যে পরিপূর্ণতার আভাষ আছে, ইঙ্গিত আছে।—সে লেখা সূর্য্যমুখী ফুলের মত, এই পৃথিবীর মাটিতে সে জন্মায় কিন্তু তাকিয়ে থাকে সুদূর আকাশের অরুণের দিকে। সাহিত্য হচ্ছে এই ঊর্দ্ধমুখী সূর্য্যমুখীর ফুল। তার শিকড় বাস্তবে থাকলেও সে অবাস্তবকে ধরবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে। *

* আশ্বিন মাসে শিবপুর সাহিত্যসংসদে পঠিত।

চয়নিকা

গান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওগো সুন্দর, একদা কি জানি
কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায়
ছিলাম তোমার গলে।
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুম-ভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা
জেগেছে জলে-স্থলে।

আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে
লুপ্ত আলোয় পাখীর সুপ্ত গানে
শ্রান্তি-আবেশে যদি অবশেষে
ঝরে ফুল ধরাতলে,
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক্ তা'রে,
ধূলায় ধূলায় দীর্ণ-জীর্ণ
না হোক্ সে পলে পলে॥

প্রাগ
১১ অক্টোবর, ১৯২৬

কোথায় ফিরিস্ পরম শেষের
অন্বেষণে?
অশেষ হ'য়ে সেই তো আছে
এই ভুবনে॥
তারি বাণী দু'হাত বাড়ায় শিশুর বেশে,
আধো-ভাষায় ডাকে তোমায় বুকে এসে,
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ঐ
কুসুম-বনে॥
কোথায় ফিরিস্ ঘরের লোকের
অন্বেষণে,
পর হ'য়ে সে দেয় যে দেখা
ক্ষণে ক্ষণে।
'তার বাসা যে সকল ঘরের বাহির দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপন রূপে
জনে-জনে॥

প্রাগ্
১২ অক্টোবর, ১৯২৬

আকাশে তোর তেম্‌নি আছে ছুটি,
অলস্ যেন না রয় ডানা দুটি॥
ওরে পাখী, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে' বলে
শিথিল কভু হ'বে না তা'র মুঠি॥
জানিস্‌নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস্ গেয়ে গেয়ে?
জানিস্‌নে কি ভোরের আঁধার মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে,
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে' টুটি॥

ভিয়েনা
২০ অক্টোবর, ১৯২৬ —উত্তরা, মাঘ, ১৩৩৩।

সাহিত্যে শুচি-বিকার

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাত আছে সব দেবতার—কেউ উঁচু কেউ নীচু, কেউ হিন্দু কেউ অহিন্দু। জাত নেই শুধু বাগ্‌দেবতায়—সব দেশে সব জাতের মানুষের সঙ্গেই তাঁর ভাব। এমন যে জাতিসংস্পর্শ-দোষবিরহিত দেবতা—তিনিই হলেন সাহিত্যিকদের দেবতা।—বাগ্‌দেবতা—যিনি সাহিত্যের সঙ্গীতের দেবতা—তাঁর আচার বিচার নেই, সর্ব্বজীবের কণ্ঠে তাঁর অধিষ্ঠান। যখন তখন কোনো একটা জাতীয় সাহিত্যকে বিশুদ্ধ ও খাঁটি বলে ধরে নেওয়া চলে না এবং সব দেশের সব মানুষের সাহিত্য নিয়ে কারবার না করলেও সাহিত্য-চর্চ্চাই বৃথা হয়ে যায়। গীতা পড়বো, বাইবেল কি কোরাণ ছোঁবোই না, এ শুচিবাই যার আছে তাকে সাহিত্যিক বলিনে তো কেউ? সাহিত্যের উপরে হেল্‌থ অফিসারের নোটিস্ জারী করা চলেনা, কেননা ফরাসী নভেল সেও একটা সাহিত্য, অথচ শুধু বৈরাগীদের জন্যে তা নয় তা পড়লেই বুঝবে। হেল্‌থ অফিসারের মতে চলতে হলে আলমারি থেকে রামায়ণ কুমারসম্ভব জয়দেব বিদ্যাপতি এবং প্রায় সব ভাল ইউরোপীয় সাহিত্যকে বাদ দিয়ে কেবল রাখতে হয় 'শিশুবোধ' 'ধারাপাত' 'খাদ্যাখাদ্য বিচার'—এম্‌নি গোটাকতক বই। পরমহংসদেবের জীবনী রাখবার যো নেই, তাতে কামিনী কাঞ্চনের কথা আছে—বাইবেল তো পাতায় পাতায় সাহিত্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর জিনিষে ভরা, সেক্সপীয়র একেবারে বিষের কুম্ভ, জ্ঞানদাস চণ্ডীদাস কবীর এঁদের তো কথাই নেই! বিশুদ্ধি-পুলিশের তাড়ায় বাগ্‌দেবতাকে পালাই-পালাই ডাক ছাড়তে হয় সব পাবলিক্-লাইব্রেরী ও রিডিংরুম থেকে, সরস্বতী ইন্‌স্টিটিউটটিও টিক্‌টিকির উৎপাতে বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না—শুচিবাইগ্রস্তের হাতে সাহিত্য-সৃষ্টির ভার দিয়ে বসলে।

রস নিয়ে কারবার সাহিত্যিকের, নব রসের গোটা-কতক সে রাখবে গোটাকতক বাদ দেবে ধমকে, এর

উপায় নেই। যারা সাহিত্য রচে, যাদের দিয়ে বিচিত্র চরিত্র সমস্ত ফোটে সাহিত্যে এবং যাঁরা পড়েও সাহিত্য, তারা যদি সবাই শিব হতো তবে বিশুদ্ধ গাঁজা এবং বমম্-বম্ এই ছুটোকেই সাহিত্যে ও সাহিত্য-সভায় রাখলেই কাজ চলতো; কিন্তু যে লেখে, যে পড়ে,—সবাই মানুষ কিনা, রসের জন্মে ব্যাকুলতা আছে তাদের, কাজেই খালি শুদ্ধি মন্ত্র দিয়ে লেখা পুঁথি পড়ে মজা পায় না তারা, এবং বিশুদ্ধির দল বেশী তাড়া করে যখন, তখন লেখক ও পাঠক ছুইজনেই চন্দননগরে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, কেননা সেখানে যা খুসী ছাপানো চলে, পড়াও চলে, এবং অনেকটা ফরাসী দেশের সাহিত্যের অবাধ হাওয়া খেয়ে বাঁচেন থেকে থেকে বাগ্দেবতাটি। আমাদের শুচিবাই-গ্রস্ত মাষ্টার মশায় দণ্ড হাতে দরজায় পাহারা দেবেন, আর আমরা লিখবো তোমরা পড়বে—এ কাণ্ড চলতে পারে জেলখানার মধ্যে, সাহিত্য-সভাতে নয়।

ছবিতে নীল রং আমি যথেষ্ট ও যথেচ্ছা ব্যবহার করি; ছেলে যদি সেই নীলবড়ি গালে দেয় তবে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, কিন্তু তাই বলে আমাকে নীল রং ব্যবহার করতে কে নিষেধ করতে পারে জানিনে! বই পড়ে মনের স্বাস্থ্যভঙ্গ যে পাঠকের হয় এবং স্বাস্থ্য ফিরেও আসে যার, এমনতরো ঠুন্‌কো স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা এটা কে না বোঝে! যা বিশ্রী তাই খারাপ লাগে—মন্দ বই থেকে আপনাকে সরিয়ে রাখার মস্ত ওষুধ রয়েছে আমাদের নিজেদেরই হাতে যখন, তখন ঝাঁটা হাতে সাহিত্যের কোঠায় আবর্জনা ঘেঁটিয়ে লাভ হয় এই, যা তলিয়েছিল আপনিই তা ঘুলিয়ে ওঠে উপরে এবং ধুলোর কাদার বৃষ্টি করতে থাকে আশ পাশের উপরে।

আজ সমাজের স্বাস্থ্য কাল সাহিত্যের স্বাস্থ্য পরশু আর্টের স্বাস্থ্য তারপর সঙ্গীতের স্বাস্থ্য—এই নিয়েই যদি দিন যায় তবে লিখি বা কখন পড়ি বা কখন?

বাগ্দেবতা—যিনি নিজেই শ্রেষ্ঠ—ইতর নির্বিশেষে সবারই এবং অগ্নির মতো বায়ুর মতো নদীর মতো যিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে বিশুদ্ধ—তাঁকে শুদ্ধি মন্ত্র পড়িয়ে জাতে তোলার অর্থ সোণাকে গিল্‌টি করার চেয়েও অনর্থক ব্যাপার, কিম্বা দক্ষিণ বাতাসকে ছেঁকে নেওয়া, আগুণকে অগ্নিপরীক্ষায় পাশ করিয়ে নেওয়ার মতোই অর্থহীন কাণ্ড।

—ভারতী, কার্ত্তিক, ১৩৩৩।

গান

শ্রী অতুলপ্রসাদ সেন

চাঁদিনী রাতে
কে গো আসিলে,
উজল নয়নে
কে গো হাসিলে?
মোহন সুরে,
ধীরে মধুরে
পরাণ-বীণায়
কে গো বাজিলে?

হেম-যমুনায়
প্রেম-তরী বায়
ডাকে আমায়—
"আয় গো আয়,"
প্রভাত-বেলায়
সোনার ভেলায়
কেমনে চলে' যাবে হায়!
ভব সে কূলে
যাবে কি ভুলে'
যে ভালবাসা বাসিলে?

—উত্তরা, মাঘ, ১৩৩৩।

বুড়োর সুখ

শ্রী জগদীশ গুপ্ত

বুড়োবুড়ীর মনে সুখ নাই।—

মানুষ যেমন বর্ষার পর ছাতি তুলিয়া রাখে ছেলেরা তেম্‌নি এই বুড়োবুড়ীকে বেশ যত্নের সহিত নামাবলী দিয়া ঢাকিয়া উপর-তালায় তুলিয়া রাখিয়াছে, কোনোদিন যে আর তাহাদের ব্যবহারের জন্য নামাইবে সে আশাও যেন নাই।—

ছেলেরা নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত যেন সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছে। সংসার-সংগ্রামে ক্লান্তি কত তাহা ছেলেরা বেশ বোঝে; বুড়োবুড়ী আজন্মকাল সংসার লইয়া বিব্রত ছিলেন, এখন উপর-তালাতে নিরিবিলি একটু বিশ্রাম করুন, ছেলেদের মনের ইচ্ছা তাই; কিন্তু বুড়ো বড় অসন্তুষ্ট অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

ছেলেরা সংসারের কোনো কাজে তাহাব পবামর্শ লইতে আসে না; চাকুরী বুড়ো ভাল বোঝে না; কিন্তু তেজারতি, মাম্‌লা, সেরেস্তার কাজ, হিসাব নিকাশ, মানুষ চেনা, দলিলের মুশাবিদা, সাক্ষী সাজান', প্রভৃতি কঠিন কঠিন কাজে ছেলেরা কি ইহারই মধ্যে এত বড় লায়েক পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে যে একবার আসিয়া এই বুড়োকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিবারও দরকার পড়ে না! বুড়ো ভাবে,—হিসাবের ভুলে, বুঝিবার ভুলে, নজরের ভুলে ছেলেরা সুশৃঙ্খল সংসারটাকে জলাঞ্জলি দিতেছে নিশ্চয়।—

বুড়ো বুড়ীকে ডাকে।

বুড়ী গলা কাঁপাইয়া বলে,—বৌরাও তাই। একা এতগুলো ছেলে মানুষ করেছি, আকাশ পাতাল কাজ করে' বেড়িয়েছি; আজ ওরা হয়েছে বড় বুঝ্‌নে'অলী। কথা যেন পাত্তেই দেয় না। যেন—

বুড়ো বলে,—হুঁ। বলিয়া গম্ভীর হইয়া থাকে।

মনে মনে ভাবে জীবনের কথা।—কেমন করিয়া বিন্দু বিন্দু মধুসঞ্চয় করিয়া সে এই সংসারের মধুচক্রটি নিঃশব্দে নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছিল; সে কি অষ্টপ্রহরব্যাপী কঠিন পরিশ্রম, হাত তুলিয়া কপালের ঘাম মুছিবার সময় থাকিত না।—মাঝে মাঝে চারিদিক হইতে অন্ধকার ছাইয়া আসিত—তখন পাশে থাকিত কেবল সে-ই এখনো যে এই নির্ব্বাসনে তাহার সঙ্গিনী।—আকাশকুসুম একটি একটি করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সে পদ্মাসনার পাদপদ্ম সাজাইয়াছিল—জয়ের সে উল্লাস এখনো তার বুকে নারায়ণের কৌস্তভমণির মত জ্বলিতেছে।—এতদিনের এত মমতা কি সহজে যায়!—

ছেলেদের মতিভ্রমের কথা মাঝে মাঝে তার কানে আসে—তারা মানুষকে দয়া করে। শুনিয়া বুড়োর ইচ্ছা হয়, ছেলেদের ডাকিয়া শাসন করিয়া দেয়।—সব দোষ আধুনিক রুচির······বুড়ো নিজে কখনো কাহাকেও দয়া করে নাই। প্রার্থীকে দান করিয়াছে—নিজে যে ধনগরিষ্ঠ সেই জ্ঞানটাকেই সার্থক করিতে, নিজেকে পরের চোখে বড় আর বিস্ময়ের বস্তু করিয়া তুলিতে, দয়া করিয়া নয়। নিজের প্রাপ্য সে দয়া করিয়া ছাড়ে নাই; তাই এই ললাটের ঘর্ম্মে, বুকের রক্তে, চিন্তার আগুনে গড়া এই চক্রে মধু আজ ধরে না, চক্রের চতুর্দ্দিকে গুঞ্জনের অবধি নাই।—

কিন্তু মধু শুধু সঞ্চয় করিলেই কাজ খতম্ হয় না; সহস্র লোলুপচক্ষুর খরদৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়া থাকে; মধু রক্ষা করিতে জানা চাই।—

বুড়ো ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া উঠে—বুঝি সব গেল।

ছেলেরা কাজ বোঝে।—

কিন্তু বুড়োকে কেন অ-দরকারী মূল্যবান আস্‌বাবের মত তুলিয়া রাখিয়াছে?

বুড়োর মনে হয়, তার যেন দিকের ঠিক্ নাই।

ছেলেরা কাজ করে, আনন্দ করে, কুশল প্রশ্ন করে, যত্ন যথেষ্ট করে; তবু তার মনে হয় সে যেন কোথাও নাই; বুঝি তাহাকে ঠেলিয়া নেপথ্যে দিয়াছে—সেখান হইতে ছিট্‌কাইয়া একেবারে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে নিরুদ্দেশের মাঝে সে পড়িল বলিয়া।—এমন নির্জ্জন কর্ম্মহীন দিন; সংসার বাহির হইতে আঘাত করা ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু মন ভিতর হইতে বলে—চলো চলো; বলিয়া কেবলি অঙ্কুশ মারিতে থাকে—অথচ চলিবার স্থান নাই।—অসহ্য হইয়া বুড়ো মৃত্যুকে ডাকে।…

হঠাৎ একদিন ছেলেরা বড় চিন্তান্বিত মুখে বুড়োর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—বাবা, ব্যাঙ্ক ফেল কর্‌বে শুন্‌ছি। কি ক'র্‌ব তা' জানিনে।……

বুড়ো যেন এতদিন ছল করিয়া বার্দ্ধক্যের ছদ্মবেশ পরিয়া ছিল; এমনি সহজে সে সেই লোল আবরণটা চোখ মুখ ত্বক এমন কি তাহার মনের উপর হইতেও সেই মুহূর্ত্তেই মোচন করিয়া দিল। ছেলেরা দেখিল, অসীম একটা আনন্দে বুড়োর যৌবন যেন সর্ব্বাঙ্গের রেখায় রেখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।—

বুড়ো মনে মনে বলিল,—আমাকে কে তাড়ায়! আমি আছি, আছি, আছি।—

শরৎ-প্রশস্তি

শ্রী সুবোধ রায়

এ ধরায় একই ঋতু বার বার ঘুরে ঘুরে আসে,
সব শিশু-মুখে একই মাতৃ-নাম ভাসে,
সন্ধ্যার শ্মশানে নিত্য দিবা-অবসান,
মৃত্যুর ফুৎকারে প্রাণ হ'য়ে আসে ম্লান,
একান্ত পুরান সব—তবু এ ধরণী
হ'য়ে আছে নিত্য-নব রহস্যের খনি।
এই তো সৃষ্টির লীলা
নূতনের রসধারা বহে অন্তঃশীলা

চিরপুরাতন মাঝে ; তাই
দেখি, শুনি, জানি, তবু শেষ নাহি পাই।
এক চন্দ্র-সূর্য্য-তারা
ঢালে নিত্য অফুরন্ত হর্ষ-রস-ধারা।
দীপ্ত তারি সঞ্জীবনীরসে হেথা নিখিলের প্রাণ
মৃত্যুর প্রাকার পরে উড়াইল বিজয় নিশান।

সেইমত মানস-জগতে, যেইজন
অতর্কিতে, আচম্বিতে, আনে নব-সৃষ্টি-আয়োজন ;
সৃষ্টি কি প্রলয়, বোঝা নাহি যায়
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত, হেলায় ফেলায় ;
আনন্দে রভসে
ডুবায় সে পুরাতন-কথা-কমণ্ডলু নব-ভাব-অমৃতের রসে ;
স্নান করি', পান করি' তায়,
ক্লান্ত শ্রান্ত পথহারা
আপনার পথ খুঁজে পায়
তাপদগ্ধ ধরাতল লভে যেন বরষার ধারা—
এইমত মানসজগতে যেইজন
অতর্কিতে, আচম্বিতে, আনে নব-সৃষ্টি-আয়োজন
বিধাতার সেই সৃষ্টি-সাথী
নিখিল-মানব-প্রাণ তারি প্রতীক্ষায় জাগে নিদ্রাহীন রাতি।
পরশে তাহার
পলকে ভাঙ্গিয়া যায় প্রাচীনের অন্ধ কারাগার
চিরাভ্যস্ত রীতিনীতি দুশ্ছেদ্য শিকল
নিমেষে খসিয়া পড়ে হইয়া বিকল।

বিধাতার সৃষ্টি-সাথী তুমি সেই কবি,
আঁকিলে পুরান পটে নূতনের ছবি।

মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-অশ্রু-ফুলে
গাঁথিলে যে মালা
সাজালে যে ডালা
রবে তা অম্লান চির ভারতী-দেউলে।

বহুদিন ধরি
বিজনে বিরলে বসি
কাটালে জীবন তুমি আপনার দেবতায় স্মরি।
কঠোর সাধনা-শেষে লভি তাঁর বর
প্রকাশিলে আপনায় দুর্জ্জয় ভাস্বর।
প্রাণের সাধক, তব অতুল সাহস—
নির্ভয়ে করিলে পান জীবনের তপ্ত সোমরস।
জীবনের বীরাচারী,
সাধনার পথে তব মান নাই কোন মিথ্যা বাধা
প্রাণ-তন্ত্রে সিদ্ধ হ'লে—যজ্ঞ তব হইল সমাধা,
লভিলে পরমাশক্তি—অনন্ত বিস্তারী।
আত্ম-প্রবঞ্চনা করি কর নাই আত্ম-অপমান,
সত্যেরে রেখেছ ধরি ঊর্দ্ধমুখ জলজ্যোতি শিখার সমান,
মিথ্যা-গ্লানি, লোকভয়, রাজভয় গেছে ফিরে ফিরে
ব্যথাহত হ'য়ে সেই সত্যের প্রাচীরে।
ভেবেছ, বুঝেছ যাহা, দিব্য-দৃষ্টি ল'য়ে তুমি দেখেছ যে ছবি,
সৃষ্টির ব্যথায়, আর ব্যথার আনন্দে তাই দিলে উপহার
হে মরমী কবি।
তাই তব কথামাঝে নাই কোন' ভয়
সঙ্কোচ, সংশয়;
বাণী তব সহজ সরল পুন একান্ত নির্ম্মম
বিধিলিপি সম।
ভারতীর বরপুত্র তপস্বী সাধক,
অশুচিরে শুচি করি' জ্বল তব অন্তর-পাবক।

ভীরু যারা, যারা কাপুরুষ
জীবনের যাত্রাপথে হারাল পৌরুষ;
ভোগের বাসনা আছে, প্রাণে নাহি বল,
পদ্মপত্রে জল সম মনে বৈরাগ্যের স্মৃতি করে টলমল,
তা'রা ভয় পায়, তারা উঠে যে শিহরি',
তোমার বাণীর মাঝে সত্যের সে নগ্নরূপ হেরি'।
ভাবে না স্বপনে
পাপ জন্ম লভে মিথ্যা-আঁধারে গোপনে।
যেথা আলো, খোলা হাওয়া, সহজ-ভাষণ
সেথা দেবতার বেদী, সত্য-সিংহাসন।
সহজ সে দৃষ্টিবলে,
ভারতীর মন্ত্রপূত অপূর্ব্ব সে লিপির কৌশলে
দেখাইলে পাপপুণ্য-সত্যমিথ্যা-সীমারেখা ভেদ,
তব হাতে নব ভাষ্য লভিল গো জীবনের বেদ।
অন্নদা, অভয়া, আর পার্ব্বতীর মাঝে
সাজালে নারীরে তুমি অপরূপ সাজে।
সে 'কিরণময়ী'
জ্বলিবে মানস-পটে চির-জ্যোতির্ম্ময়ী।
ভাল-মন্দে, পাপপুণ্যে মিশে
অমৃত ও বিষে
রচিয়াছে এ ধরার মানব-হৃদয়
তব হস্তে মনুষ্যত্ব লভে সেই নূতন অন্বয়।
ঘৃণিত ও অনাদৃতে সত্যের মহিমা-মাঝে করিলে উজ্জ্বল
মিথ্যা নেতা মিথ্যাগুরু গেল ডুবে কোন্ রসাতল!
ইন্দ্রনাথ-দেবদাস-করুণ কাহিনী
আনিল জীবন মাঝে অমৃত বাহিনী।
অভাগীর স্বর্গ কোথা করিলে নির্দ্দেশ
আঁধারে আলোক ফেলি' দেখাইলে অজ্ঞাত সে দেশ।
সংসারের ক্লিন্ন পঙ্কতল
তব প্রাণ-রসে রসি' জন্ম দিল অপরূপ প্রেম-শতদল।

প্রেমের সে প্রফুল্ল কমল
ব্যথার সরসী-নীরে আনন্দের বাতাসেতে করে টলমল।
তব সৃষ্ট বিশ্ব সে যে রূপে রূপে অপরূপ সুন্দর অম্লান
মোর দীন ক্ষীণ কণ্ঠে সাজে কি গো তব জয়গান ?
স্রষ্টা তুমি, দ্রষ্টা তুমি, তুমি পুণ্য-নাম
তোমারে প্রণাম দেব, তোমারে প্রণাম। *

* শিবপুর সাহিত্য-সংসদে শরৎচন্দ্রের আবাহন সভায় পঠিত।

ইজ্জৎ

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

সুলতানপুরে শ্রমিক-সভার একটা বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণলিপি পেয়ে ভোর ছ'টার গাড়ীতে রওনা হব ব'লে খালি পায়ে একখানা খদ্দরের চাদর কাঁধের উপর টেনে দিয়ে, ষ্টেশনের দিকে হন্-হন্ করে ছুটে চলেছি।

বেলা ন'টার সময় মিটিং।

গভর্ণমেণ্ট, পুলিশ, কুঠিয়ালসাহেব আর জমিদারদের বিরুদ্ধে যে সব .কথা বল্‌বো—সেইগুলোই মনের মধ্যে শানিয়ে তুল্‌ছিলাম—এমন সময় পিছন থেকে একখানা মোটর গাড়ী এম্নি আওয়াজ ক'রে দাঁড়িয়ে গেল যে চমকে উঠে নর্দ্দমায় ঠিক্‌রে পড়ি আর কি!

ভিতর থেকে কে একজন ভারি গলায় কথা কয়ে উঠতে ফিরে দেখি,—আমাদের জমিদার-নন্দন চারু রায়!

চারু আমার বাল্যবন্ধু।

চা। কি হে, পবন-গতিতে চলেছ কোথায় ?

মোটরটার বেয়াদবির জন্য রাগটা আমার তখনো পড়েনি; তাই বল্লুম,—এই তোমাদেরই মস্তিষ্ক ভক্ষণ কর্‌তে।

চা। এ যে চিংড়িমাছের মাথা, বাবা; চিবিয়ে বড় বেশী লাভ ক'র্ত্তে পারবে কি ?.. ...এসো গাড়ীতে,—কোথায় যাবে ?

নাঃ—ব'লে এগিয়ে যাবার উপক্রম করাতে চারু বল্লে, আরে, যাবে ত ষ্টেশনে, চলনা পৌছে দি......

গম্ভীর ভাবে ফিরে বল্লাম, ষ্টেশনে যাচ্চি—জান্‌লে কি ক'রে ?

সে তাচ্ছিল্য ভরে হেসে বল্লে,—আরো ঢের বেশী জানি, সুলতানপুরে বক্তিমে দিতে যাচ্চ।..... তোমাদের খবরা-খবর একটু আধটু জানা থাকে—বুঝেছ কিনা ?

বল্লাম, নাঃ, গাড়ীতে চড়বো না।

চা। গাড়ীটা আবার কি দোষ করলে ?

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বল্লাম,—গরীবের অর্থ অপহরণ ক'রে গরীবের বুকের হাড়-পাঁজর চূর্ণ করবার এই কুৎসিৎ যন্ত্রটাকে ছুঁলেও পাপ হয়।

চা। বটে! গুরুর চেয়ে শিষ্য দড়! কত ভিরকুটিই জান তোমরা ভাই! এসো—এসো—নাও, চড়ে পড়।

যেন একটু লজ্জা অনুভব করলুম। বাক্যব্যয় না করে গাড়ীটায় চড়েই ব'সলুম।

মিনিটখানেক পরে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাবে?

সুলতানপুরেই।

মিটিংএ?

বাপ্‌রে! তা হ'লে তোমরা কি আর আস্ত রাখবে?

তবে?

বিদ্রূপচ্ছলে বল্লে, গৌরাঙ্গ-সেবায়।

কিছু নতুন ফন্দি-টন্দি এঁটেছ বুঝি?

চারু হেসে বল্লে, সে সবের ভার তোমাদের উপরেই। আমরা আত্মরক্ষা ক'রেই বেসামাল, ফুরসৎ কোথায়!

তবুও—

ব্রাণ্ড-বেটা ডেকে পাঠিয়েছে।

জমিদার ব্রাণ্ড?—হঠাৎ, না, কিছু ব্যাপার আছে?

কিছু আছে বৈ-কি। শালা সেদিন আমাদের এক বেটা রেওৎকে বে-ধড়ক ঠেঙ্গিয়েচে। কেঁদে এসে পড়লো। একটা নালিশ ঠুকে দেওয়া গেছে। এখন তুলোরাম খেলারাম!

তারপর?

ফেরবার সময় জানতে পারবে।

ক'টার গাড়ীতে ফিরূচ?

পাঁচটার আগে ত' গাড়ী নেই।

আমাদের সনাতন থার্ড ক্লাশ—আর বুক ফুলিয়ে চারু রায় চড়লে ফার্ষ্ট ক্লাশে!

রাগে আমার গা গিস্-গিস্ ক'রতে লাগলো। ইস্—যারা একদিনের জন্য কুটোটা পর্য্যন্ত সরালে না,—যাদের মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে—হাতের মুঠো টাকায় ভরে ওঠে—তারাই, কেবল তারাই,—বে-দরদ টাকার শ্রাদ্ধ করে!

২

শান্তরাম শর্ম্মা গুপ্ত-পুলিশের বড় কর্ম্মচারী। প্রকাণ্ড গোঁফ-জোড়া নিয়ে বেচারা যেখানেই কেন বিরাজ করুক—লোকে দেখতে পাবেই-পাবে!

চারু রায় গাড়ী থেকে নামতেই—মিলিটারি সেলাম! আর এই অধমের উপর বাঁকা কটাক্ষ হেনে বুঝিয়ে দিলে, অমন নিঃশব্দে চলে গেলেও আমাদের চক্ষু এড়াতে পারনি—বাছাধন!

মিটিংএ উপস্থিত হয়ে দেখি, রেল-কারখানার কুলিতে ময়দানটা একেবারে ভর্ত্তি। তাদের সশব্দ চিন্তায় শব্দ-ব্রহ্ম থর-হরি!

অনেকেই আমাকে চিনতো—দেখবামাত্র সোৎসাহ ভীষণ চীৎকার,—বোলো গান্ধী মহারাজ কি জয়!

সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন মিষ্টার বিক্রম সিং, জমিদার। এঁকে সকলেই ভয় করে। বিলেতে গিয়ে বছর দশেক কাটিয়ে—এক মেম বিয়ে করে ইনি সম্প্রতি ফিরে—একেবারে আড়েহাতে—দেশোন্নতির কাজে লেগে গেছেন। সহধর্ম্মিণী ইংরাজ-রমণী—অতএব ইঙ্গ মহলে অশেষ প্রতিপত্তি—আর সেই অজুহাতে যো-হুকুমের দলও বিশেষ সায়েস্তা!

দাঁড়িয়ে উঠে বিক্রম সিং বক্তৃতা সুরু করলেন,—

এই আন্দোলন বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে নয়; ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই···

সবাই গা টেপা-টিপি করতে লাগলো। অর্থাৎ দেশের লোকের বিরোধ থাকতেও পারে কিন্তু—তোমার কেমন করে থাকে বাবা?

অদম্য উৎসাহের সঙ্গে তিনি বলে যেতে লাগলেন,—

একথা—অবহেলা করবার নয়, ভেবে দেখবার বিষয়। আসল বিসম্বাদ রাজায় প্রজায় নয়; এ যুগের মূল বিরোধের কারণ—শ্রমিক এবং মূলধনীর অবস্থার বৈষম্য······

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্।

মনে কর, এক জায়গায় একশ' ঘর ধনী আছে; কিন্তু

এক ঘরও দরিদ্র নেই; সেখানে ধনী তার টাকা নিয়ে কি করবে?

ধনী তার অর্থ দিয়ে গরীবকে আকর্ষণ করে—নিজের কষ্টকর কায়িক কর্ত্তব্যগুলো করিয়ে নেয়! যেখেনে তার সুবিধা নেই, সেখেনে ধনীর অর্থের কোনই মূল্য নেই!

তাই বলছিলাম, ধনী চায় তার প্রতিবেশী ভাইদের দরিদ্র করে রাখতে! বড় লোক গরীবকে ঠিক ততটুকুই দিতে চায় যতটুকুতে সে কোন রকমে প্রাণধারণ ক'রে ধনীর সেবার কাজে লাগে!

কিন্তু এরই পরিবর্ত্তন আনা দরকার হয়েচে। কি ক'রে সেই পরিবর্ত্তন আসবে, কি ক'রে দরিদ্র ধনীর কবল থেকে উদ্ধার পাবে—সেই কথাই আমাদের আজ স্থির করতে হবে।

আমার প্রিয়বন্ধু আজ তোমাদের এই কথাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবেন। তোমরা অভিনিবেশপূর্ব্বক তাঁর কথা শুন্‌বে, আশা করি।

সভাপতি আসন গ্রহণ করলেন।

বক্তৃতা দিতে মঞ্চের উপর উঠে—প্রথমেই নজর পড়ল শান্তরামের বিপুল গোঁফজোড়ার উপর। শশা-বিচির মত নাকের উপর হাম্‌দো একজোড়া চশমা!

শর্ম্মা বক্তৃতা রিপোর্ট করছিল।

বিক্রম সিং চাপা গলায় বল্লেন, একটু বুঝে-শুঝে—পুলিশ রিপোর্ট করচে।

ধাঁ করে মাথায় আগুন চড়ে গেল। সত্য বল্‌বো—তাও পুলিশের ভয়ে—বুঝে-শুঝে! ততখানি কাপুরুষ নই! জেল? জেলের ভয় আমরা করিনে। জেলেই স্বাধীনতা জন্ম লাভ করে।

বক্তৃতা সুরু করলাম:—

প্রিয় ভাই সকল, আমাদের শ্রমিক ভাই সকল, আমাদের ধনীর অত্যাচারপীড়িত ভাই সকল, সরকার বাহাদুরের অবহেলিত ভাই সকল, পুলিশের নিষ্ঠুর কবলে……

বিক্রম সিং চাদরের খুঁট ধরে টেনে বল্লেন, কাজ কি রূঢ় বলায়—ওটা আমাদের বক্তব্য নয়।

নিজেকে অনেক কষ্টে সাম্‌লে বল্লুম:—

এই দুনিয়াতে টাকাই কেবলমাত্র মূলধন নয়। তা' যদি হতো ত' টাকাওয়ালা লোক কোন দিন গরীবকে ডাকতো না।

মাটিতে যেমন বৃষ্টির জল না পড়লে, লাঙ্গলের ফাল না ব'সলে—চাষীর কপালের ঘাম না ঝরলে ফসল ভাল হয় না—পাথরের মত হ'য়ে থাকে—তেমনি ধনীর অর্থের সঙ্গে দরিদ্রের শ্রমশক্তি না মিশলে অর্থও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না।

সূর্য্য যেমন আলো দিচ্চেন—একথা সত্য—তেমনি ধ্রুব সত্য এই কথাটিও।

ধনী মূলধনের মুনাফার সমস্তটা পকেটস্থ ক'রে এতদিন তার ঘরেই নিয়ে গিয়েছে; দুর্ব্বল দরিদ্র কথা কয়নি, কিন্তু আজ আর তা' করা চলবে না। এই মুনাফাতে আমাদের ন্যায়তঃ যে অংশ আছে তার দাবী—একান্ত সত্যের দাবী!

মূলধনী যদি তা' না দিতে চায় ত' থাকুক সে নিজের ঘরে বিজ্‌লির আলো আর খস্‌খসের পাংখার তলায়। আমরা আমাদের এই সক্ষম হাত দিয়ে অনেক-কিছু করতে পারি—যাতে আমাদের দিন সুখেই গুজ্‌রান্‌ হবে।

আকাশ ভেদ করে' জয়ধ্বনি উঠ্‌লো—জয় গান্ধী মহারাজ্‌ কি জয়!

নিস্তব্ধ হ'লে আবার বল্লুম—

দরিদ্র দুর্ব্বল, একথা একেবারেই সত্য নয় ভাই! এই অসত্যকে মন থেকে দূর ক'রে দিতে হবে।

তবে দুর্ব্বল কে?

যে স্বার্থ এবং লোভের বশে নিজেকে অতিমাত্রায় বাড়িয়ে তুলে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে; যে স্বার্থপর সেই দুর্ব্বল;—নিজের হীন স্বার্থের জন্য অন্যের কল্যাণের যোগ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে—আপনার গণ্ডীকে একান্ত খাটো ক'রে তুলেছে, সেই বাস্তবিক দুর্ব্বল!

দশের এবং দেশের কল্যাণ চিন্তা ক'রে আমাদের এক হ'তে হবে। তৃণগুচ্ছে হাতী বাঁধা পড়ে; আমরাও ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে যেদিন এক হতে পারবো সেদিন বিপুলকায় ধনীও আমাদের দরজায় বাঁধা পড়বে! সত্যের অঙ্কুশ তার মাথায় পড়লে—তাকেও সোজা পথ ধরতেই হবে!······

দীর্ঘ জয়ধ্বনির পর সভা-ভঙ্গ হলো।

৩

মেমসাহেবকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বিক্রম সিং ফ্যাক্টরীর বড় কর্তার অতিথি হলেন। আমি বটতলায় চাদর পেতে লম্বা হলুম।

বোধ করি, একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলুম, ঘুম ভাঙ্তে না ভাঙ্তে চোখে পড়ল সেই সুপরিচিত বিশাল গোঁফ-জোড়া!

একটু জায়গা দিয়ে বল্লুম, এসো শর্ম্মাজি, বসো।

শর্ম্মাজীর গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁটটি শুকিয়ে যেন খড়্খড়্ করচে, যেন জায়গায় জায়গায় ফেটেও গেছে।

কি খবর, শর্ম্মাজি?

শর্ম্মাজি বাংলা-হিন্দির সঙ্করজাত কিম্ভূত ভাষায় আলাপ আরম্ভ করলে;—আরে ভাই, কাল সাম্‌সে এৎনাভি কুছ খানে ন মিলি।

কেন?

শালালোগ্‌কো তুমলোগ ভারি সয়তানি শিখলায়া। দুধ ন মিলি; বোলে, পাঁচ রুপৈয়া সের; মুড়ী দো রুপৈয়া; তোবা তোবা—উভ্‌ভি ন মিলি!

বল কি শর্ম্মাজি! তোমাকে ভারি জব্দ করেছে ত? এখন উপায়?

কেয়া করেঁ!

কর্‌বে আর কি? চাকরি ছেড়ে দাও।

শর্ম্মাজি তা'তেও প্রায় প্রস্তুত—তবে কিনা একটা কাৎলা মাছের মাথার মত কুমীর-পেটা 'কিস্তি' ছিল—আঠ্‌-ন আদমি ভুখে মরি!

শর্ম্মাজি, কতটাকা মাইনে পাও?

একশো পচ্চিশ।

আচ্ছা, সরকারের নোকরি ছেড়ে একশ পঁচিশ টাকা রোজগার করতে পার না?

অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা নেড়ে বল্লে, সায়েদ নেহি!

আমার হাসিও এলো, কান্নাও এলো। ইস্‌—কি হয়ে গেছে দেশটা! আত্মনির্ভরতার স্বপ্ন দেখলেও আমরা আঁৎকে উঠি!

মানুষ তখনি উপুড় হ'য়ে প্রবলের পা চাটে যখন সে মনে করে যে তার মূল্য কাণাকড়িটিও নয়। পরের দাক্ষিণ্যেরও উপর বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল নয় কি?

আমার জন্য ছাতু, দই আর শর্করা নিয়ে জন দুই এসে উপস্থিত হলো।

শর্ম্মাজিকে প্রচুর ক'রে খাইয়ে নিজে পরিতৃপ্ত হলুম। কিন্তু মনের মধ্যে কি যেন একটা কাঁটার মত বিঁধে রইল।

শর্ম্মাজিও আমাদের ভাই!

৪

চলন্ত গাড়ীর দরজা ঠেলে ঢুকে প'ড়ে চারু রায় বল্লে, যাক্‌গে, টিকিট নাই কেনা হলো, চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।

আমার গাম্ভীর্য্য দেখে—সপ্রতিভ হাসি হেসে বল্লে, শালা রেল কোম্পানীও চোর, মনুতে আছে, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

হেসে বল্লুম, ধর্ম্মগ্রন্থগুলোও দেখ্‌চি নখদর্পণ ক'রে রেখেচ!

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলুম, ওদিকের খবর কি?

উঃ—বেটা কি চালাক! কি খাতির রে ভাই; তিন বেটিতে যা তোয়াজ করলে!

তিনটে—কে কে?

বুড়ীটা আর দুটো মেয়ে।

তার পর?

শেষকালে তোমাদের শ্রাদ্ধ। আচ্ছা ঠুকলে। বলে কি জানো? বলে, বলশেভিক-চর তোমরা।

ঠিকইত বলেছে।

ছোট-লোকদের নাই দিয়ে মাথায় তুলচ। সে-কথা

কিন্তু সত্যি ভাই ! শেষ পর্য্যন্ত—তোমাদের আর কি ? আমাদেরই সর্ব্বনাশটি করবে।

আর সেই মাম্‌লার কথা ?

ছি ছি ছি—সে এক মহা কেলেঙ্কারি……

নিমেষে চারুর মুখটা কালো হয়ে গেল।

আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে—যাতে আর কেউ না শুনতে পায়—এমনি ক'রে বল্লে,—উঠবার আগে ব্র্যাণ্ড বল্লে—দেখো বাবু, এখানকার গরমটা আমাদের সয় না; সেদিন এমন মেজাজটা বিগড়ে গেল—Oh, I am so sorry—তোমাদের একটা রেওৎকে—আমি ভারি অনুতপ্ত হয়েছি—ব'লে, আমার হাতে একটা মোড়া নোট দিয়ে—বল্লে—তুমি লোকটাকে একটু বুঝিয়ে দিও। আশা করি এতেই হবে।

খুলে দেখি একটা একশ' টাকার নোট !

আবার সেই ব্যাটাকে দিয়েই পাখা টানাচ্ছিল; তাকে ডেকে বল্লে,—জমিদার-সাব মাফ কর্ দিয়া—তুম্‌কো বকশিশ দিয়া—লে লেও।

তার হাতে নোটটা দিলাম।

ব্র্যাণ্ড চেঁচিয়ে বল্লে, আর দেখো—একশো হ্যায়, কোই ঠগ লায় নেই……

মুহূর্ত্তে লোকটা ধেই ধেই ক'রে নাচতে লাগ্‌লো, আর বল্‌তে লাগলো,—সাহেব—আরো জুতি মারো, শ' জুতি মারো—হাজার জুতি লাগাও……

মেমগুলো হিষ্টিরিয়ার হাসি হাস্‌তে লাগ্‌লো। আর ঘাগি বেটা আমার দিকে এমন একটা মোক্ষম চাউনি দিলে—আঃ, আমার মাথা কাটা গেল !

চারু অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে—হঠাৎ পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরিয়ে ফেলে—প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া বার ক'রে বল্লে—

উঃ, কি বেইজ্জতি ! *

* অধুনালুপ্ত 'সংহতি' হইতে

গোপনচারী

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

অন্তর প্রান্তর পারে হে সন্ন্যাসী, চিনেছি তোমায়
তমোময়ী রজনীর সুগম্ভীর তিমির-ছায়ায় !
হে ধ্যানী, তোমারি লাগি অশ্রুজলে কাটায়েছি দিন
গ্লানির মুহূর্ত্তে মোর সুরহারা জীবনের বীণ
মহাদৈন্যভরে,
গাহে নাই পূর্ণ গান হৃদয়ের মৌন শ্রোতা লাগি'
ব্যথিত অন্তরে !

সুদুর্ল্লভ, তোমা' লাগি' পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী
নিরাশার করতলে রাখিয়াছি ধীরে ধীরে আনি।
আজি এ তিমিরতলে চিনিয়াছি আনন তোমার ;
জীবনমাল্যের মোর গ্রন্থিহীন শুষ্ক পুষ্পভার
আজি তোমা' লাগি'
একে একে দিল তুলি' শীর্ণ তব করপুট ভরি'
হে মোর বৈরাগী !

কতদিন, কত সন্ধ্যা, কত রাত্রি ফিরেছে সবেগে ;
আমার জীবন ঘিরি' নব নব রূপরস লেগে
তৃণের অঙ্কুর যেথা, সেথা ধীরে ফুটিয়াছে ফুল ;—
আতপ্ত প্রাণের রসে গাঢ়তম সুধাসমতুল
আশীর্ব্বাদ-ধারা
চাহি নাই। ফিরিয়াছ ম্লান মুখে অস্তাচল-পারে
যেন বাণীহারা !

সেথা ছিলে তপস্যায় দীর্ঘকাল মোরে প্রতীক্ষিয়া
বিজন নির্ব্বাস দেশে গুহাহিত আমারি লাগিয়া।
ফিরায়েছি বারে বারে দ্বার হ'তে নির্দ্দয়ের মত ;
অকম্পিত করুণায় নেত্রদু'টি করিয়া আনত
হে গোপনচারী,
হাসিয়াছ ম্লান হাসি ; ফিরিয়াছ দূর হ'তে দূরে
গ্লানি অপসারি !

তিলে তিলে মোরে তুমি চাহিয়াছ ওগো সঙ্গহীন,
আপন বক্ষের মাঝে একেবারে করিতে বিলীন ;
মিলন সঙ্কেত তব দুর্দ্দিনের অন্ধবারিধারে
নিঃশেষে মিলায়ে যায় সীমাহীন সুদূর পাথারে,
আমি রহি বসি।
জীবন-কুসুম মোর ফুটি' উঠি' সৌরভ বিলায়
পবনে নিঃশ্বসি'।

শীত, গ্রীষ্ম, সুখদুঃখ হে গম্ভীর স্পর্শে না তোমায় ;
দিনের পশ্চাতে দিন অন্ধ বেগে ছুটি' চলি' যায়।
নীহারিকা-আবর্তনে জ্যোতির্বাষ্প শূন্যতল ঘিরে ;
গতির চরম বেগে জন্ম মৃত্যু আবরণে ধীরে—
তপস্বী আমার,
অন্তরপ্রান্তর পারে জ্বলে তব হোমশিখাখানি
দীপ্ত, দুর্ণিবার।

জ্বলে তব হোমানল ; ভস্ম হয় জীবনের গ্লানি ;
নির্মোক খসিয়া পড়ে ; বাহিরায় সত্য মুক্ত বাণী।
শিবের প্রশান্তি ভাতে জীবনের যাত্রাপথ 'পরে ;
ছলনার মোহভার দগ্ধ হয় ধীরে থরে থরে—
হয় বিনিঃশেষ ;
দীপ্ত তৃপ্ত নব মূর্ত্তি আবরণ ফেলে ম্লানিমার
ঘুচে যায় ক্লেশ।

আজি তব ধ্যানলোকে হে তপস্বী আসিয়াছি ফিরে
জীবন সেতারখানি ধ্বনি' তুল' একান্ত গম্ভীরে।
সুমহান্ কালস্রোত, বালারুণ ভাতিছে গগনে ;
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও এই মহাপ্রশান্ত লগনে
জ্ঞানের আলোকে ;—
সহস্র বন্ধন মাঝে স্মরি তব জ্যোতির্ম্ময়ী বাণী
অসীম পুলকে।

শিল্পে আত্মপ্রকাশ

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

আমরা যা-কিছু দেখি-শুনি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই শব্দস্পর্শ-রূপরসময়ী ধরণীর যা-কিছু প্রত্যক্ষ করি, তাহাকে আবার মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করিয়া চলিতে থাকি। এই সৃষ্টি, এই যে বাস্তবকে আবার মানসরাজ্যে রূপ দিয়া ধরিয়া রাখা, এ মনের একটি আশ্চর্য্য শক্তি। যাহাকে একবার কোথাও হয়ত দেখিয়াছি, আজ সে চোখের সমুখে না-থাকিয়াও কেমন এক রকম করিয়া আমার মানস-লোকে রহিয়া গিয়াছে, তাহার রূপখানি কেমন করিয়া মন না-জানি কোন্ ক্যামেরা দিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে, তাই তাহাকে যদি আবার কোথাও দেখি তাহাকে পরিচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, না-দেখিলেও তাহার কথাটি বহুকাল পরেও বলিতে পারি, তাহার চোখ মুখের ভঙ্গী, তাহার সবই স্মরণ করিতে পারি। যাহাকে দেখি, যাহা শুনি তাহাকে তো ধরিয়া রাখিতে পারি না, কিন্তু মনের মধ্যে তাহারই প্রতিরূপ সৃষ্টি করিবার এ এক পরমাশ্চর্য্য শক্তি আমরা পাইয়াছি।

মনের এই যে ফটোগ্রাফি ইহাকেও না হয় সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি, তাহার একটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু মনের আর একটি শক্তি আছে।যাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহা দেখি-শুনি তাহার প্রতিরূপ মন সৃষ্টি করিলেও করিতে পারে, কিন্তু যাহা সে দেখে নাই, শোনে নাই, তাহাকে যে সৃষ্টি করে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। মনের কাল্পনিকী সৃষ্টির এই যে শক্তি তাহা এতই অভিনব যে তাহাকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। মনের সত্যকার সৃষ্টি-প্রতিভার বিকাশ তাহার এই কল্পনা-শক্তির মধ্যে।

এই স্মরণ এবং সৃজন সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। এখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রতি নিমেষে এই বিপুল বিশ্বজগতের স্পর্শ পাইতেছি, আর তাহার কোনো-না-কোনো রূপ নিমেষে নিমেষে আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। আমরা ভাবি হয়ত, যে, এসব আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, কিন্তু এক এক সময় দেখিতে পাই, যাহা আমাদের মনে ছিল না বলিয়াই জানিতাম তাহাও অতি স্পষ্ট আমাদের মানস-পটে আঁকা রহিয়াছে। মনস্তত্ত্ব নানা ভাবে আজ এই সিদ্ধান্তের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে যে আমাদের মন হইতে আমাদের দেখা-শোনার একটি কণিকাও হারায় না, আমাদের অগোচরে ভাণ্ডারী তাহার ভাণ্ডারে প্রত্যেকটি উপলব্ধিকে সঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে।

কিন্তু যখন যাহা ইচ্ছা তাহা আমরা স্মরণ করিতে পারি না। মানস-ভাণ্ডার হইতে যাহা ইচ্ছা তাহা আসিয়া চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয় না। স্মরণ কতকগুলি নিয়মের অধীন। একটি বস্তুর পর আরেকটি বস্তু আমার স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হইয়া চলিয়াছে; এই যে অনন্ত বস্তুরাশি একটির পর আর একটি আসে আর যায়, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন ইহারা নিতান্তই এলো-মেলো, পরস্পরের সহিত ইহাদের কোনোই যোগ নাই। বিশাল নগরীর রাজপথে লোক-প্রবাহের মতই এই সব বস্তুরাশি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধহীন। কিন্তু পরখ করিয়া দেখা যায় ইহাদের প্রত্যেকটি বস্তু অব্যবহিত পূর্ব্বের কিম্বা পরেরটির সহিত একটি না একটি বন্ধনে বাঁধা রহিয়াছে।

স্মৃতি-প্রবাহে ভাসিয়া-আসা বস্তুরাশির এই যে সাহচর্য্য ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া মনস্তত্ত্ববিদেরা যাহা বলেন তাহা মোটামুটি বলিবার চেষ্টা করিব। আমাদের চেতনায় এই জগতের বস্তুরাশি বিশেষ ভাবে দুটি পরম্পরা বাহিয়া আসিতেছে। একটি দেশগত পারম্পর্য্য বা সান্নিধ্য। যেমন রামের পাশে শ্যাম বসিয়াছে দেখিলাম; তাই রামের কথা মনে হইলেই পাশের শ্যামের কথাটিও

মনে পড়ে। আর একটি কালগত পারম্পর্য্য বা নৈকট্য। যেমন, ব্যারাকপুর তোপ পড়িবার পরই ও-পাড়ায় আগুন-লাগার ভীষণ কোলাহল শোনা গেল; তাই তোপের শব্দ হইলেই অগ্নিকাণ্ডের কথাটাও মনে আসিয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, যদি দুটি বস্তুর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে অথবা যদি দুটি বস্তু পরস্পরের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী হয় তাহা হইলেও একটির আবির্ভাবে দ্বিতীয়টি আসিয়া স্মৃতি-পথে দাঁড়ায়।

সান্নিধ্য বা সাদৃশ্য দিয়া স্মৃতিব্যাপারের অনেকটা বুঝিতে পারা গেলেও সবটা বুঝিতে পারা যায় না। দেশগত বা কালগত সান্নিধ্য এবং সাদৃশ্য লইয়া কত বস্তুই তো আমাদের চেতনায় আসে, অথচ কার্য্যকালে একটির আবির্ভাবে আর সব বস্তুই আমাদের স্মরণে ভাসিয়া ওঠে না। তোপের শব্দের সঙ্গে জীবনে হয়ত অনেকবার অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে, কিন্তু তোপের শব্দ শুনিয়া সেই সব ঘটনাই আমাদের মনে আসিয়া উদয় হয় না। ঘটনা বা বস্তুরাশিকে সাহচর্য্যের সূত্রে বাঁধিবার মূলে একটা মন রহিয়াছে। সেই মন বাছিয়া বাছিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে এক করিয়া বাঁধিয়া রাখে, আর অন্য ঘটনাগুলিকে সে হয়ত কোথাও জড়ো করিয়া রাখে; কিন্তু তাহাদিগকে অনেক সময়ই আমরা কোথাও দেখিতে পাই না।

এই জন্যই কোনো দুইটি বস্তুর সাহচর্য্য বুঝিতে হইলে শুধু তাহাদের দেশকালগত সান্নিধ্য বা সাদৃশ্য সন্ধান করিলেই হইবে না। যে-মনের মধ্যে উক্ত দুইটি বস্তু সাহচর্য্য লাভ করিয়াছে সেই মনের অনুভব-ধারার সন্ধান লইতে হইবে। অনন্ত ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বস্তুরাশির মধ্যে যাহারা আমাদের স্মৃতিপথে দল বাঁধিয়া আসিতে থাকে তাহাদের আসা-যাওয়া নিতান্ত স্ব-তন্ত্র নহে। ইহাদের স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিবার জন্য আমাদের অনুভবের উত্তেজনা চাই। তাহার সহিত যাহার যোগ নাই সে কখনো আমাদের স্মরণে আসিতে পারে না। মনের সহিত যাহার অনুভবের বন্ধন নাই, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার টান নাই, তাহার সহিত মনের যোগও নাই। যে-সব বস্তুরাশি আমার রাগ-বিরাগের সংস্পর্শহীন সেই সব বস্তুরাশি আমার মানস-লোকে দেখা দিতেও পারে না।

সুতরাং স্মৃতির মূলে আমাদের অন্তরের কামনার প্রেরণা রহিয়াছে—সে প্রেরণা যত গোপনই হোক আর যত সূক্ষ্মই হোক। কোনো না কোনো প্রয়োজনের প্রেরণা আমাদের অতীতকে স্মরণ করিতে বাধ্য করে। হয়ত কোনো অবস্থায় পড়িয়াছি যাহার সহিত সংগ্রাম করিতে চাই—সুতরাং অতীতের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। হয়ত কোনো দুঃখে পড়িয়াছি সুতরাং অতীতের বুকে যে সুখের স্মৃতি রহিয়াছে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দুঃখ লাঘব করিতে চাই। ফল কথা স্মরণ-শক্তির নানা প্রয়োজন রহিয়াছে।

অন্তরের এই যে একটি কামনা তাহার আরো পরিস্ফুট প্রকাশ পাই মনের সৃজনী-শক্তির মধ্যে, যাহাকে আমরা কল্পনা বলি, স্বপ্ন বলি, নব-সৃষ্টি বলি তাহার মধ্যে। এখানে শুধু অতীতের প্রতিরূপটিকে মনের সামনে আনিয়া ধরিবার চেষ্টা নাই। এখানে আছে একেবারে নতুন একটি জগৎকে আপনার মধ্যে সৃষ্টি করিবার প্রয়াস।

কেবল স্মরণ-পথে নিজের জীবনের বিগত ঘটনা-রাশিকে টানিয়া আনার পথে অনেক বাধা আছে। তাহার পরিপূর্ণ বিবৃতি করিবার স্থান ইহা নহে; দু' একটি ইঙ্গিতই এখানে পর্য্যাপ্ত হইবে। আমাদের জীবনে এমন কতক-গুলি কামনা আছে যাহা আমাদিগকে লুব্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়, অথচ যাহাদের আমরা নিজের সামনেও স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে লজ্জা বোধ করি। অথচ ওই সব কামনার চরিতার্থতা চাই, কোনো-না-কোনো রকমে উহাদের পরিপূর্ত্তি চাই। জীবনের এমন কতকগুলি প্রেরণা আছে যাহাদের প্রকাশ করিতে আমাদের নৈতিক চেতনা লজ্জিত হয়, অথচ যাহাদের দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াইয়া যাইবার সাধ্যও মনের নাই। আবার মন আমাদের এমন সব কামনা লইয়াও অতৃপ্ত হইয়া ফিরিতে থাকে যাহাদের জন্য তাহার কোনো লজ্জা নাই কাহারো কাছে, কিন্তু

যাহাদের সফলতা সে তাহার ক্ষুদ্রপরিসর জীবনে আশা করিতে পারে না। এখানেও একদিকে কামনার অনিবার আকর্ষণ, অপর দিকে তাহার পরিপূরণে বাধা প্রবল ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই উভয় ক্ষেত্রেই বাধার অপসারণ করিতে গিয়া, কামনা-পরিতৃপ্তির আশায় মন আমাদের কল্পনার ক্ষেত্রে বাহির হইয়া আসে। যাহা কিছুর সম্বন্ধে আমরা কল্পনা করি, স্বপ্ন রচনা করি, তাহার মূলে আমাদের কামনার কোনো-না-কোনোরূপ উত্তেজনা রহিয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণে নব-মনস্তত্বের নিকট সমস্ত কাল্পনিক সৃষ্টিই ব্যক্তির অনুভব-জীবনের আত্ম-প্রকাশ, তাহার সমুখে সর্ব্বপ্রকারের কল্পনাই ব্যক্তির মনোময় জীবনের স্বরূপটিকে প্রকাশ করিয়া দেয়···

শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী তাঁহার কল্পনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছেন। কোনো কোনো শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে শিল্পীর আত্ম-পরিচয় সন্ধান করা চলিবে না; ইহা হইতেছে objective art; সুতরাং নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, চিত্রে শিল্পীর কোনো মনোভাবের সন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা—শুধু তাহাই নয়, অত্যন্ত ভুল। মনস্তত্ব কিন্তু এই কথাটিকে একটুও স্বীকার করিতে চায় না। দার্শনিক যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত মতবাদের অন্তরালে পর্য্যন্ত মনস্তত্ব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনোময় জীবনের অনুভব-ধারাটিকে আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শিল্পী যতই আপনার রাগ-বিরাগকে গোপন করিবার চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহার কল্পনার ভঙ্গীর মধ্যে তাঁহার রাগ-বিরাগের ছায়াপাত না হইয়াই পারে না। যে-সব কল্পনা কোনো একটি বিশেষ শিল্পীর মনে রূপময় হইয়া উঠিতেছে সেই সব কল্পনা সম্বন্ধে মনস্তত্বের সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন হইবে এই যে এই সব কল্পনা এই শিল্পীর মনোলোকে এত বেশি সজীব ও সচল হইয়া উঠিল কেন? এই সব কল্পনা শিল্পীর অন্তর্জ্জীবনের সহিত কোনো-না-কোনো ভাবে জড়িত হইয়া আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এইখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোনো শিল্পী যদি কোনো নীতি-বিরুদ্ধ বিষয় লইয়া কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করেন, তাহা হইলে সেই শিল্পী নীতি-বিরোধী, মনস্তত্ব একথা কখনো বলে না। কিন্তু মনস্তত্ব একথা নিশ্চয়ই বলিবে যে শিল্পী এই ব্যাপারটিকে লইয়া এতখানি মাতিয়াছেন যখন, তখন ইহা শিল্পীর মনোময় চেতনাকে কোথাও বিশেষ ভাবে স্পর্শ করিয়াছে, ইহার সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল, ঘৃণা, করুণা, বেদনা যাহাই হোক, একটা কিছু অনুভব খুব বেশি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পীর চিত্তে কোনো-না-কোনো একটি অনুভূতিকে নিবিড় করিয়া উপভোগ করিবার প্রেরণা না জাগিলে কখনো তাঁহার কল্পনা রূপ লইয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং শিল্পী যতই নিরপেক্ষতার ভাণ করুন, তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার মনোভাবের পরিচয়কে ব্যক্ত করিবেই করিবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, সত্যকার শিল্পী কখনো নিজের অনুভবের বিচার দিয়া, তাঁহার রাগ-বিরাগ দিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে বিকৃত করেন না। খাঁটি Objective art-এর লক্ষ্যই তাই। শিল্পী একটি জগৎকে সৃষ্টি করেন এই বিশ্ব সৃষ্টিরই অনুরূপ করিয়া, কিন্তু তিনি তাঁহার জগতের বুকের উপর তাঁহার নিজের মতামতটি তাহার সমালোচনাটিকেও আঁটিয়া দেন না। এই সৃষ্টির বিচার করিতে হইবে তাহার স্বাভাবিকতার দিক দিয়া—এই শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত আদর্শ ইত্যাদির দাবী করিতে যাওয়া ভুল।

এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কথা অনেকটাই সত্য। শিল্পীর সঙ্গে পেশাদার গুরুঠাকুর অথবা পাদ্রী দেবতার একটা গুরুতর রকমের পার্থক্য রহিয়াছে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। কিন্তু গুরুঠাকুর অথবা পাদ্রী তাঁহার বচন বিন্যাস দিয়া যে পরিমাণ নীতি-ধর্ম্মের প্রচার করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলা-ফেরার মধ্যে প্রচার করিতেছি সে কথাটি তো ভুলিয়া গেলে চলিবে না। এই জন্যই জীবনের প্রত্যেকটি ভঙ্গী

তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক অর্থের ইঙ্গিত বহন করিয়া চলিতে থাকে। পথের উঁচু নীচু প্রভৃতি' বিশিষ্টতার সহিত কোনো বিশেষ ব্যক্তির দেহের বিশিষ্ট গড়নের যোগে যেমন একটি বিশেষ রকমের গতির স্থষ্টি হয়, তেমনি মনের বিশিষ্ট গড়নের সহিত মনকে ঘিরিয়া যে নৈতিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক চেতনার জগত রহিয়াছে তাহার বিশিষ্টতার যোগে বিশেষ বিশেষ জীবনের ভঙ্গী গড়িয়া উঠিতেছে। এই কারণে শিল্পী যাহাদিগকে স্থষ্টি করেন তাহাদিগের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে হইলেও শিল্পীর নিজের বিশিষ্ট মনোময় স্বরূপের, শিল্পীর ভাব-জগতের স্থর না প্রকাশ পাইয়া পারে না। নিতান্ত হেয় চরিত্র আঁকিতে গিয়া তিনি তাহাকে কখনো সাধুতাব খোলস পরান না সত্য, কিন্তু যদি তিনি অন্তরে সত্যই মহত্ত্বের পিয়াসী হন—তাঁহাব দৃষ্টি যদি মানব-জীবনকে কোথাও মহীয়ান্ করিয়া ধরিতে ব্যাকুল হইয়া থাকে—তাহা হইলে ওই হেয় চরিত্রটিকে দেখাইবার বিশিষ্ট ভঙ্গীর মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তবেব বেদনা ও কারুণ্য প্রকাশ না পাইয়া পারিবে না।

শিল্পী যাহা প্রকাশ করেন তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মপ্রকাশ ঘটিবে। বিশ্বজগতের তথ্য-সংগ্রহ করাব ভার বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর ; সেখানে ব্যক্তি আপনার ভাল-লাগা মন্দ-লাগাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া যত কিছু তথ্য পান তাহা সংগ্রহ করিতে থাকেন। শিল্পীর পথ অন্য দিকে, তিনি আপনার অন্তরের কামনা-বেদনাময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করেন মানস-স্থষ্টির মধ্যে। স্থতরাং শিল্পীর স্থষ্টির মধ্যে আমরা শিল্পীর ভাব-জগতের পরিচয় পাইবার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকি।

বর্ত্তমান কালে আমাদের সাহিত্যে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর পঙ্কিল চরিত্র স্থষ্টির দিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে। সাহিত্যে এই পর্য্যন্ত বিশেষভাবে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর মানুষ লইয়াই কারবার চলিয়াছে ; এই সব তরুণ শিল্পীরা আভিজাত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের বলশেভিজম্, সোসিয়ালিজম্, শ্রমিক-আন্দোলন প্রভৃতির মূলে যে-ভাবের সাম্যতন্ত্র রহিয়াছে ইহারা অনেকটা সেই সাম্যতন্ত্রকেই বরণ করিয়াছেন। ফলে জীবন বলিতে ইহাদের দৃষ্টিতে শুধু ওই নিম্নস্তরের জীবনটাই বেশি করিয়া পড়িতেছে। জীবনের উচ্চতর বিকাশ, তাহার মহনীয় প্রেরণাগুলির দিকে, তাই তাঁহাদের দৃষ্টি ততটা পড়ে না। তাঁহারা বিশেষ করিয়া দেখিতেছেন জীবনের মধ্যে যাহা কিছু পাশবিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের হিংস্রতা, কামুকতা, তাহার নৈতিক-চেতনা হীনতা এইগুলিই তাঁহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেউ কেউ আবার সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও যে ওই সবই রহিয়াছে তাহার বর্ণন করিতেছেন।

তরুণ শিল্পীগণ তাঁহাদের এই সব স্থষ্টি দিয়া বাংলা সাহিত্যকে কতটা সার্থক করিতেছেন তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহাদের এই সব রচনার মধ্যে জীবনকে সমগ্রভাবে দিক দিয়া দেখার পরিচয় পাওয়া যায় না একথা বলা যায়। জীবন যেমন একদিক দিয়া পশুপ্রবৃত্তির পঙ্কে শিকড় বসাইয়াছে, তেমনি অপর দিক দিয়া এই জীবন অমল তার সরোবরে শ্বেতপদ্মের মত বিকশিত হইয়া স্থগন্ধে নীলাকাশকেও বিহ্বল করিতেছে। যদি কোনো শিল্পী শুধু পঙ্কিল জীবনের দুর্গন্ধকেই তীব্র করিয়া তুলিয়া থাকেন, তিনি যদি তাহার মধ্যেও কোথাও কোনো স্থরভির আভাস না দিতে পারেন, যদি অন্ধকারের বুকে কোথাও আলোকের এতটুকু দুরাশাকেও না দেখাইতে পারেন, বদ্ধ বাতাসে অবরুদ্ধতার এতটুকু বোধও যদি না জাগাইতে পারেন, যদি মানুষকে কৃমি-কীটের মত জঘন্যতার মধ্যেও পরিতৃপ্ত করিয়া দেখাইতে থাকেন তাহা হইলে তাঁহার স্থষ্টি বাস্তবতার যত বড় নজিরই উপস্থিত করুক না, তাহা জীবনকে কখনো সত্য করিয়া দেখাইতেছে বলিয়া স্বীকার করিব না। স্বীকার করি এমন মানুষ আছে যাহার মধ্যে বদ্ধতা কোনো বেদনা বা অস্বস্তিই জাগায় না ; কিন্তু ওই বদ্ধতার মধ্যে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া থাকাটাকে জীবনের চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিব কেমন করিয়া ? তাহাই যদি

জীবনের চরম সত্য হইত তাহা হইলে মানুষ তাহার বর্বরতা, অমানুষিকতাকে কাটাইয়া উচ্চতর বিকাশের দিকে প্রয়াণ করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। অবশ্য আমার বলিবার উদ্দেশ্য ইহাও নয় যে, উক্ত চেতনা-হীন মানুষটিকে দেখাইতে গিয়া তাহার মধ্যে একটা হাহাকার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। শিল্পীকে তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীর মধ্য দিয়া উক্ত মানুষটির বদ্ধতাকে, তাহার জীবনের অস্বাভাবিকতাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; তাহার মোহগ্রস্ত জীবনের দিকে চাহিয়া জীবনের মুক্তি যে কত বড় প্রার্থনার ধন তাহার বোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিব শিল্পী বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন, জীবনের ওই বিশেষ প্রকাশকে তাহার প্রকৃত পরিবেষ্টনের মধ্যে যথার্থরূপে স্থাপন করিয়াছেন। নিম্ন-স্তরের যে জীবন, তাহার অধোগতির জন্য সমাজ দায়ী হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া তাহা তো আর বড় হইয়া যাইবে না। মানব সমাজের বেশির ভাগ লোক জীবনের সূক্ষ্ম ভাবরাশির সন্ধান রাখে না বলিয়া ওই সব ভাব-রাশির স্থানকে তো নিম্নে টানিয়া আনা যায় না। সুতরাং শিল্পী যদি অধোগত জীবনকেই আঁকেন, তাহা হইলে তাহার স্থানটিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে হইবে। তাহা না করিয়া, যদি তিনি একটুকরা ফটো আঁকিয়া বলিতে থাকেন যে উহা জীবন, তাহা হইলে উহাকে সত্যকার জীবন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। উহাকে শিল্পীর আচ্ছন্ন দৃষ্টির সাক্ষ্য হিসাবেই গ্রহণ করিব মাত্র।

ফল কথা, কোনো বিশেষ সৃষ্টি শিল্প হিসাবে যে মূল্যেরই হোক, শিল্পীর আত্মপ্রকাশের দিক দিয়া তাহার একটা মূল্য থাকিবেই। এমনি আমরা বহির্জ্জগতের যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার কতটুকু যে বাহিরের আর কতটুকু যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের তাহা লইয়া মত ভেদ রহিয়াছে। পরন্তু মানসলোকে আমরা যাহা কিছু সৃষ্টি করিতেছি তাহার উপর যে আমাদের মনের অনুভূতির আলোক না পড়িয়া পারে না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শিল্পীর মনের বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীটি প্রকাশ পায় বলিয়াই আমরা শিল্পসৃষ্টি হইতে শিল্পীর বিশেষ পরিচয়টিকে সংগ্রহ করিতে পারি। বিভিন্ন বিভিন্ন শিল্পীর রচনার পার্থক্য শুধু তাঁহাদের বর্ণনা বা রচনার বাহ্যিক ভঙ্গীগত বিভেদের (technical peculiarities) উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে; তাঁহাদের জীবনকে দেখিবার ভঙ্গীর পার্থক্যই তাঁহাদের সৃষ্টিকেও বিশিষ্টতা দান করিয়া থাকে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমগ্র পরিচয় ফুটিয়া উঠে। যদি কোনোরূপ অধ্যাত্ম চেতনা, কোনোরূপ নৈতিক বোধ আমার মধ্যে জাগিয়া থাকে, জগৎ সম্বন্ধে যদি কোনো ধারণা আমার মনে গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মানস-সৃষ্টির মধ্যেও তাহার পরিচয় থাকিবেই। এই জন্যই শিল্প সৃষ্টি দিয়া শিল্পীকে আমরা বিচার করিতে অগ্রসর হইতে পারি; জীবন সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাঁহার রচনায় প্রকাশ পায় তাহাকে নৈতিক বিচারের আদালতে আনিয়া ফেলিতে পারি এবং তখন যদি তিনি বলেন উহা তো শিল্প, উহার মধ্যে আমি কোথাও নাই, তাহা হইলে সে কথা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

এই সমাজ-সংসারে আমাদের আত্মপ্রকাশের যেমন একটি দায়িত্ব রহিয়াছে, শিল্প-জগতেও তেমনি আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব রহিয়াছে। অথচ মজাই এই যে কাল্পনিক সৃষ্টির জগতে আমরা এই দায়িত্বটিকে স্বীকার করিতে চাহি না কিছুতেই। তাহার কারণ বিশেষ দুর্ব্বোধ্য নহে। কাল্পনিক জগতে মানসলোকের অবাস্তবতার মধ্যে আমরা ঘুরিয়া বেড়াই কেন? আমাদের অন্তরের কামনারাশির পরিতৃপ্তির জন্য। বাস্তব লোকের বাধা আমাদের যে-সব কামনার পরিতৃপ্তির পরিপন্থী, আমাদের মনের গোপন লোকে তাহারা অনেকটা অবাধে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই জন্য দেখিতে পাই যাহাদের সম্মুখে বাধা যত বেশি, তাহারা তত বেশি বহির্জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া অন্তরের কাল্পনিক জগতের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। আমরা সকলেই এই কাল্পনিক জগতে অল্পাধিক চলা-ফেরা না করিয়া পারি না। তাই শিল্পী যখন আমাদিগকে

তাঁহার কল্পনা-জগতে লইয়া যান তখন আমরাও মনে মনে মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করি যে উহার সহিত বাস্তব জগতের কোনোই যোগ নাই, সুতরাং এখানে অবাধ উপভোগের পথেও কোনো অন্তরায় নাই। সকলেই মানিয়া লইতে চেষ্টা করি যে এখানে আমরা যা-খুসি তাই করিতে পারি।

যদি কাল্পনিক জগতে চলা-ফেরার কোনোই প্রভাব সত্য সত্যই বাস্তব জগতের জীবনযাত্রীর উপর না থাকিত তাহা হইলে শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোনোই কারণ থাকিত না। কিন্তু কথাটি তো বাস্তবিক তাহা নয়। কল্পনার জগত একদিক দিয়া যেমন আমাদের কামনাকে আংশিক পরিতৃপ্তি দিতে থাকে তেম্‌নি অপর দিক দিয়া সেই সব কামনার দিকে উন্মুখ বৃত্তি-গুলিকে দৃঢ় এবং সবল করিয়া তুলিতে থাকে। ফলে একদিন মন আমাদের বাস্তব জগতে যখন সেই সব কামনার চরিতার্থতার সন্ধান করিতে আরম্ভ করে তখন জীবনে নানা বিপাক ও বিপর্য্যয় আসিয়া দেখা দেয়। কাল্পনিক জগতে তেমনি আবার যদি কোনো বৃহৎ ভাবের সন্ধান এবং আস্বাদন মন পায়, তাহা হইলে কালে বাস্তব লোকেও মন একদিন সেই বৃহৎকে পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই কারণেই সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির সূচনা করিয়া থাকে।

তাই বলিতেছিলাম যে শিল্পের সহিত নৈতিক জগতের দায় রহিয়াছে। শিল্পীর এই দায়িত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কি শিল্প জগতে, কি বাস্তব জগতে আত্ম-প্রকাশের সবটুকু দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

গান ও স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধু বায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে
ধরণী শিহরয় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কনে কিনি কিনি।

পারুল শুধাইল কে তুমি গো
অজানা কাননের মায়ামৃগ!
কামিনী ফুলকুল বরষিছে
পবন এলোচুল পরশিছে
আঁধার তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি।

II {ধা-র্সা.র্সা র্সা | ধনা নধা পা-া I (মা মা মা-গা | গপা-া-া-া I

নূ ০ পু র বে জে যায়্ রি নি রি ০ 'নি ০ ০ ০

I সা সা রা গা | মা পা ধা না) } I সমা-া মা-া | মা মা মা-া I

রি নি রি নি রি নি রি নি আ ০ মার্ ম ন কয়

I মা মগা মা-া | মা-র্গা-া-া I র্রা-া র্সা র্সা | ধনা নধা পা-া I

চি নি চি ০ নি ০ ০ ০ নূ ০ পু র বে জে যায়

I { পা-ধা ধপা-া | পনা ধা না-া I র্সা র্গা র্গর্রা-র্সনা | র্সা-া-া-া I

গ ন্ ধ ০ রে খে যায়্ ম ধু বা ০ ০ য়ে ০ ০ ০

সা-া রা গা | মা পা ধা না I নধা না নর্সা-র্সনা | ধপা-া-া-া } I

মা ০ ধ বী বি তা নে র ছা য়ে ছা ০ ০ য়ে ০ ০ ০

I র্সা না ধপা-া | হ্মা ধা পা-া I মা মা মা-া | মা-া-া-া I

ধ র ণী ০ শি হ রয়্ ০ পা য়ে পা ০ য়ে ০ ০ ০

I সমা মা মা-া | মা-া মা মা I মা মা মা-গা | পা-া-া-া I সা সা রা রা |

ক ল সে ০ ক ঙ্ক নে কি নি কি ০ নি ০ ০ ০ কি নি কি নি

| গা রা গা গা I মা-া পা-ধা | মপা পা মা-া I মা মগা মা-া | মা-র্গা-া-া I

কি নি কি নি আ ০ মা র ম ন ক য় চি নি চি ০ নি ০ ০ ০

I র্গরা-া র্সা র্সা | ধনা নধা পা-া I মা মা মা-গা | গপা-া-া-া I

নূ ০ পু র বে জে যায়্ রি নি রি ০ নি ০ ০ ০

I {সা-া রা-া | গা রা গা গা I গমা-গধা ধপা মা | মা-া-া-া I

পা ০ রুল্ শু ধা ই ল কে ০ ০ তু মি গো ০ ০ ০

I (সমা মা মা-া | মা মা মা-গা I রা রপা পা-হ্মা | পা-া-ধা-না I

অ জা না ০ কা ন নে ০ মা য়া মৃ ০ গ ০ ০ ০

I নধা-র্সা র্সনা ধপা | পহ্মা-ধা পা মা)} I

কে ০ তু মি কে ০ তু মি

I পা পা পা-া | না ধা না-া I র্সা র্সর্গা র্গর্রা-না | র্সা-া-া I সা রা গা-া |

কা মি নী ০ ফু ল কু ল্ ব রা ষি ০ ছে ০ ০ ০ প ব ন ০

| মা পা ধা-না I নধা না র্সা-র্সনা | ধপা-া-া-া I র্সা না ধপা-া | ল্মা ধা পা পা I
এ লো চু ল্ প॰ র শি ॰ ছে॰॰॰ আঁ ধা রে॰ তা রা গু লি

I মা মা মা-া | মা-া-া-া I মা-া-মা-া | সমা মা মা মা I মা মা মা-গা |
হ র ষি॰ ছে॰॰॰ ঝিল্‌লি॰ ঝ ন কি ছে ঝি নি ঝি॰

| গপা-া-া-া I সা সা রা রা | গা রা গা গা I মা-া পা-ধা | মপা পা মা-া I
নি ॰॰॰ ঝি নি ঝি নি ঝি নি ঝি নি আ॰মা র্ ম ন ক য়

I মা মগা মা-া | মর্গা-া-া-া I র্গর্রা-া র্সা র্সা | র্সনা নধা পা-া I
চি নি চি॰ নি ॰॰॰ নূ॰ পু র বে জে যা য়

I মা মা মা-গা | গপা-া-া-া II II
রি নি রি॰ নি ॰॰॰

মাটির রাজা

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ভেড়া-চারটার আলাদা-আলাদা নাম।

টিকুরাম পালের ধাড়ি।

"—বড় বড় শিং নিয়ে ভাবছ বুঝি কী-না হয়ে গেলাম! শেয়ালে ধরে যদি?—যদি বাঘে খায়?"

কান মলিয়া দিয়া শান্তি তাহাকে কতদিন শাসন করে।

টিকুরাম শোনে না।

মাঠের মাঝখানে সঙ্গীদের ফেলিয়া দিয়া সুমুখে শাল-বনের ভিতর গিয়া ঢোকে। কান নাড়িয়া মাথা দুলাইয়া নাচিতে নাচিতে সে ছুটিয়া যায়। লাল ফিতায়-বাঁধা গলার ঘুঙুর ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজে।

নিস্তব্ধ মাঠের প্রান্তে ঘুঙুরের আওয়াজ ভারি মিঠা শোনায়।

শান্তি অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া আনে।

"—মরবে তুমি এইবার টিকুরাম। কচি শালপাতা খাওয়া তোমার বেরোবে একদিন।"

ফাল্গুনে শিবরাত্রির দিন। বেলা তখন শেষ।

ভেড়া-ছাগলের ঘরে ফিরিবার সময়।

লছ্‌মী আসিল, বাদল আসিল, বাহাদুর আসিল,—

টিকুরাম আসে না।

শান্তি তাহার খোঁজে বাহির হইল। বাবা বাড়ী নাই।

বনের ও-পারে তাঁতিপাড়ার ডাঙায় শিবরাত্রির মেলা বসে। প্রকাণ্ড মেলা। বহুদূরের গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া জড়ো হয়। বাবা তাহার সেইখানে খেলা-তামাসা দেখাইয়া কিছু রোজগার করিতে গেছেন। তিন দিন আগে একটা গরুর গাড়ীতে করিয়া তাম্বু পাঠানো হইয়াছে। রুপী বাঁদরটাকে তিনি সঙ্গে লইয়া গেছেন। জনি কুকুরটা গেছে। ঝাঁপি-ঢাকা মোটা-মোটা গোখ্‌রো সাপ তিনটা ত' আছেই।

টিকুরামের খোঁজে সুমুখে মুচি-পাড়ার বস্তিটা পার হইয়া শান্তি নতুন পুকুরের পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

পুকুরের পাশে, কাঁকর-পাথরের বড় রাস্তাটা দূরের শহর হইতে সোজা মাঠের উপর দিয়া বনে গিয়া ঢুকিয়াছে। দিন-শেষের রাঙা আলো শাল-মহুয়ার চিকন্ কচি পাতায় পাতায় ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। এই পথ দিয়াই তাঁতি-পাড়ার মেলায় যাইতে হয়। চুণী-মাড়োয়াবীর ধান-ছাঁটাই কলের মোটর-লরিটা ধূলা উড়াইয়া খুব খানিক্‌টা সাড়াশব্দ করিয়া ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করে। দূরের যাত্রীদের মেলায় পৌঁছাইয়া দেয়, মেলার যাত্রী শহরে আসে,—ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরে। মাথাগুন্তি দু' দু' আনা!

"টিকুরাম ফিরেছে, তুই বাড়ী আয় শান্তি!"

মার ডাক শুনিয়া শান্তি ঘরে ফিরিতেছিল।

ধানের ক্ষেতের মাঝখানে একটা পুকুরের ধারে গাঁয়ের ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে মারা গেলে পুঁতিয়া ফেলা হয়; পুকুরটার নাম—ছেলে-পোঁতা।

সেই ছেলে-পোঁতার পাবায় শান্তি দেখিল, তাহাব মেজ্‌দা—কান্তি, কালো রঙের একটা মরা-কুকুরের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

"শান্তি, বাড়ী থেকে ঝোড়াটা নিয়ে আয় ভাই,—ভুলো মরে' গেছে।"

"ভুলো—!"

শান্তি কুকুরটার কাছে আসিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দাঁতগুলা তাহার বাহির হইয়া পড়িয়াছে··· বাঁ-পাশের চোখটা ইহারই মধ্যে কাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। সাত বছরের বুড়া কুকুর। শান্তির সমবয়সী।

"কি হয়েছিল মেজদা? কখন মরেছে?"

"এঁঃ! কখন মরেছে! যা—নিয়ে আয় ঝোড়াটা! যা—ছুটে একেবারে, যাবি আর আস্‌বি।"

শালের দু'টা খুঁটির মাঝখানে খড়ের দড়ি দিয়া বোনা ঝোড়ার উপর চড়াইয়া, বুড়া কুকুরটাকে তাহারা দু'জনে ধরাধরি করিয়া ঘরের দরজায় আনিয়া ফেলিল।

সুমুখের ওই জঙ্গলের ও-পারে, দূরের একটা ইংরাজি-ইস্কুলে বড় ছেলে শ্যামল তখন রোজ পড়িতে যায়,—সে আজ সাত বছর আগের কথা। সাঁওতালদের একটা বস্তি হইতে ভালুকের বাচ্ছার মত ছোট্ট এই কুকুরের ছানাটি তাহারই পিছু-পিছু চলিয়া আসে। সেদিনও ঠিক্ এম্‌নি সন্ধ্যা······

শ্যামল নাম রাখিয়াছিল—পথ-ভোলা।

কিন্তু কুকুরের নামে এত কবিত্ব সাজে না; শেষে 'ভুলো'য় গিয়া দাঁড়ায়।

মা তাহাকে দেখিবার জন্য ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শ্যামলের স্ত্রী আসিল। টুনু তাহার ডাক-নাম।

তিন বছরের ছোট বোন ভাদুর মুখে তখনও ভাল কথা ফুটে নাই। মার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "অচুক্ মা—বুলো অচুক্।"

"না মা অসুখ নয়—মরে' গেছে।"

কিন্তু মরিতে সে কাহাকেও দেখে নাই, মরিয়া যাওয়ার অভিজ্ঞতা এই বুঝি তাহার প্রথম। ভাদু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। মা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

টুনু পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। ভাদু তাহার গায়ে হাত দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বো-ডি,—মরে গেছে।"

মা বলিলেন, "খবরটা শ্যামলকে লিখে দিও বৌ-মা!"

টুনু হাসিল।

"লিখব—তোমার পথ-ভোলা আবার পথ ভুলেছে।"

মাও হাসিলেন।

"কিন্তু মা, তোমায় একটি কাজ করতে হবে মা—"

বলিয়াই মার একখানি হাত ধরিয়া টুনু হাসিতে লাগিল।

"ও এলে তোমায় বলতে হবে মা, হেই মা তোমার পায়ে পড়ি—"

টুনু আবার খানিক্ হাসিয়া বলিল,

"তোমায় বলতে হবে মা যে, বৌমা ওকে খেতে না দিয়ে মেরে' ফেলেছে। হ্যাঁ মা, তুমি বলো এই কথাটি।"

মা বলিলেন, "আগে আসুক্ বাছা। ছেলের যে কি রকম বুদ্ধি কে জানে মা! যতবার বাড়ী ছাড়বে ততবার এম্‌নি। তিন মাস হলো এবার,—না?"

টুনুর মুখের হাসি সহসা বন্ধ হইয়া গেল। বলিল,

"যাবার সময় বলে গিছল, ভুলো বুড়ো হয়েছে, চোখে আর ভাল দেখতে পায় না, ওকে ভাল করে' খেতে টেতে দিও। নইলে মারা যাবে।"

"ভুলো-মরার খবর দিলে কি আর সে আসবে বৌমা? তার চেয়ে এইবার লিখে দাও, তোমার মা মারা গেছে—তুমি এসো!"

টুনু বলিল, "না মা, তার চেয়ে তুমি লিখে দাও না, কাল রাত্তির বেলা—খুব রাত তখন,—সেই সময় টুনু হঠাৎ মারা গেল—"

"ছি মা! বাট্, বাট্, ও কথা বলে?"

ডান হাত দিয়া মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইলেন।

টুনু তাঁহার বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্যাপার দেখিয়া মার কোল হইতে ভানু তাহার ছোট হাতখানি বাড়াইয়া বলিল, "ছি কানে না বো-মা!—মা, বো-ডি কান্‌চে।"

গাঁয়ের এক বুড়ী রোজ ঠিক এই সময়ে রায়-জির এই বাড়ীর পাশ দিয়া দূরের একটা পুকুরে কাপড় কাচিতে যায়। লোকে বলে, কাপড় কাচিতে যাওয়া তাহার ছল মাত্র, সুবিধা পাইলে আলু-পেঁয়াজের ক্ষেত হইতে যাহা পায় চুরি করিয়া আনে।

ঘরের সুমুখে রায়-জির সর্ষে-ক্ষেতের পাশ দিয়া বুড়ী তখন পথ চলিতেছিল।

"তোমরা মা মেলেচ্ছ,—তোমরা মুন্দোফরাস্, তোমরা সব পার। বেশ হয়েছে, গাঁয়ের একটেরে ঘর করেছ,—কারও সঙ্গে কোনও সঙ্গ নেই। আর থাকলেই বা দিত কে?—

"কুকুর-বেড়াল মারা যাবে, ঘর থেকে টেনে দূর করে' ফেলে দেবে, শেয়াল-শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে—এই ত' জানি। তা আবার আদর যত্ন করে' ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ঘরে কে তুলে আনে মা?……

"ঘেন্না করে না গা? ছি ছি মা, ছি—ছি—এ্যাক্ থু—!"

বুড়ী পথ চলিতে চলিতে রায়-জির ঘরের দিকে তাকাইয়া বার-বার থুতু ফেলিতে লাগিল।

কান্তি ও শান্তি দু'জনে মিলিয়া তখন কবরের গর্ত্ত খুঁড়িতেছিল। ভুলোকে কবর দেওয়া হইবে। পুষি বিড়ালটার কবরের ঠিক পাশেই।

মাটির একটা ঢেলা তুলিয়া লইয়া সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া কান্তি তাহাই ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতেছিল।

"মোছলমান বলা তোর বার করছি—!"

মা নিষেধ করিলেন।

"ছি—! বলুক্ না।"

মার আঁচলে চোখ মুছিয়া টুনু এইবার মুখ তুলিয়া চাহিল।

ঘরে তখন প্রদীপ দিবার সময়।

ক্রমশ—

ফাগুন চলে যায়—

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

যায় রে যায় ফাগুন চলে যায়
ও তার বাঁধন-হারা কাঁদনখানি বাজিয়ে দিয়ে ঝরা পাতায়।
তার দেয়ালি, ওই যে বনের ডালে ডালে ;—
নতুন পাতার হুতাশ্বাস ওই হা হা রবে বন কাঁদালে।

যায় রে যায় ফাগুন চলে যায়
ওরে এই বেলা ফুল ফুটিয়ে নে সব শুক্‌নো ও তোর মরা শাখায়।
আবার ফাগুন কে জানে ভাই পাবি কি না—
হয়ত রে তোর মরা আলোয় আর ফাগুনে হাতড়াবি না।

যায় রে যায় ফাগুন চলে যায়
ও তার শেষ-ব্যাসাতির সওদা যত ছড়িয়ে রেখে ভাঙা মেলায়।
আয় দেউলে, শেষ-কড়িটায় খেল্ না জুয়া—
শেষ-ফোঁটা তোর রক্ত নিয়ে ফাগের বদল খেল ফাগুয়া!

বিচিত্রা

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র উচ্চ-মঞ্চ হইতে 'পতিত-সাহিত্য' সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত অথচ অমোঘ বেদ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা আপামর সাধারণের প্রণিধানের যোগ্য।

আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের ধূমাচ্ছন্ন আকাশে তাহা ভাস্বর হইয়া যে বহু-ব্যক্তির মনের সংশয়-তিমির হরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বহু কূট তর্কের এক নিমেষে এবং এক নিশ্বাসে সমাধান হইল।

অবনীন্দ্র শিল্পে অদ্বিতীয় এবং সাহিত্যে তাঁহার

আসন বহু ঊর্দ্ধে। সুসময়ে তিনি সাহিত্যের তত্ত্ব এবং মর্ম্ম-কথা প্রকাশ করিয়া দেশের পরম উপকার করিলেন।

আমাদের সকৃতজ্ঞ ভক্তি তাঁহার চরণে নিবেদন করিতেছি।

* * *

আজকাল প্রায় সকল সাহিত্যিকের মুখে শুনা যাইতেছে যে আগামী বৈশাখ হইতে আমাদের জন-প্রিয় সাহিত্যার্জ্জুন 'প্রবাসী'র সিংহদ্বারে বিজয়-প্রবেশ করিবেন।

Modern Review-এ অনুবাদের খিড়কি দিয়া তাঁহার প্রবেশ দেখিয়া আমরা অস্বস্তি-জড়িত একটা আরাম বোধ করি নাই, এমন নহে। এবং আশা হয় যে একথা সর্ব্বৈব অমূলক নাও হইতে পারে।

নিসর্গের মত সাহিত্যও পক্ষপাতশূন্য।

দিনমণির জ্যোতির্ম্ময় রশ্মিতে 'প্রবাসী'র দিনগুলি চিরোজ্জ্বল। আবার নিদাঘের পরিণামটিকে রমণীয় করিয়া তুলিবার এই চেষ্টা, বলা বাহুল্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতেছে। সেদিন কতকটা দুঃসাহসিকের মত এই কথারই ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। আজ আনন্দের সহিত বলিতেছি, এই চেষ্টা সফল হইলে ব্যাপারটি সুখময় হইবে।

দলাদলি-কণ্টকিত বাঙ্গালী-জীবনে সাহিত্যের দলাদলি শোচনীয় অবস্থার পরিচায়ক। তাহার অবসান—আশার কথা। এবং আনন্দের কথা এই যে সাহিত্যে নারীর মর্ম্মবাণী বলিবার সাধু-সাহস আজ জয়-যাত্রার পথে আর একপদ অগ্রসর হইল।

সকল দেশের সাহিত্যই সমাজকে চালনা করে। কেবল এই দুর্ভাগা দেশের সাহিত্য সমাজ-কবলিত। বাংলার কথা-সাহিত্য আজ শৃঙ্খলিত। এই দুর্দ্দিনে আমাদের মতদ্বৈধ নিঃশেষে ঘুচিয়া যাক্।

নর-নারীর নিগূঢ় মর্ম্মকাহিনীর সুকুমার আলোকে 'প্রবাসী'র কলেবর মণ্ডিত করিয়া শরৎচন্দ্র দীর্ঘ জীবন লাভ করুন এই আমাদের অন্তরের একান্ত কামনা।

* * *

'বসুমতী'র উপহার-সম্ভার হইতে শরৎচন্দ্রের পুস্তক-গুলি মুক্তি-লাভ করিয়াছে দেখিতে পাই।

উপহারের কাগজ ইত্যাদির কথা মনে করিলে ভোজ-বাড়ীর লুচির ঘি এবং ময়দার কথা মনে পড়ে। তবুও সুলভে শরৎচন্দ্রের পুস্তক-প্রচার করিয়া 'বসুমতী'র কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শুনিতেছি শরৎচন্দ্রের পুস্তকের সুলভ সংস্করণের চেষ্টা হইতেছে। সুলভ বলিলে আমাদের ভয় হয়। কাগজের মূল্য এখন কমিয়াছে। লাভের উপর অতিরিক্ত নজর না দিয়া যথা সম্ভব আড়ম্বরহীন সুন্দর ছাপা এবং অভঙ্গুর কাগজে, সাধারণের আর্থিক শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া যেন এই সংস্করণ বাহির হয়, সৎসাহিত্যের সুপ্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ-কর্ত্তার প্রতি আমাদের এই সবিনয় এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। তিনি নিজে সন্ন্যাসীর মত সহজ সরল আড়ম্বর-বর্জ্জিত, তাঁহার পুস্তকগুলি যদি তাঁহারই রুচির অনুরূপ হয় তাহা হইলে সকল দিক্ দিয়া সংস্করণটি শোভন হইয়া উঠিবে।

শ্রী মণিবজ্র ভারতী

* * *

বাঙলায় আজ যে বাজনা-সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা আমরা অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পারিতাম, যদি না ইহাতে আমাদের জাতীয় সমস্যা জড়িত হইয়া পড়িত।

আর এই বাজনা-সমস্যা বনাম জাতীয় সমস্যাও আমরা অনায়াসেই মিটাইতে পারিতাম, যদি না বৈদেশিক

আমলাতান্ত্রিক মতিগতি, মীমাংসা করিতে গিয়া, এই সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিত।

"বাঙ্গলার তথা ভারতের ভবিষ্য স্ব-রাষ্ট্রে বাজনা-মসজিদ-মন্দির-গরু-শুদ্ধির স্থান আর মানুষের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে বলিয়াই বাঙ্গলার তথা ভারতের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় মুক্তির সাধকদের কাছেও এই সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতাও উপেক্ষার বস্তু হইতে পারে না, জাতীয় সমস্যা বলিয়াই ইহাকে তাঁহারা গণ্য করিতেছেন।

*

* *

বাজনার শব্দে মুসলমানের সত্যই ধর্ম্মহানি ঘটে কিনা, সেই তর্কে যোগ না দিয়াই আমরা রাজপথে বাজনা বাজিবে কি বাজিবে না, সে কথার মীমাংসা করিতে পারি।—রাজপথে রাজ্যের প্রজামাত্রেরই অধিকার আছে।—সে পথে হিন্দুর খোল-করতাল মুসলমানের মহরমের ঢাক ও মশাল বাহির হয়। সে পথে গাড়ী ঘোড়া লরি বাস্ সবই চলে। রাজপথের ধারে যার বসতি, রাজপথের নিশ্চিত ধূলি-কাদা সোরগোল তাহার বরদাস্ত করিতেই হয়। রাজপথে কি বাজিবে না বাজিবে, কি যাইবে না যাইবে তাহা প্রধানতঃ রাজ্যের নাগরিক অধিকার, প্রয়োজন, ও কর্ত্তব্যের দিক্ হইতেই নির্দ্দেশ করিতে হয়।

শোভাযাত্রা কোনটা ধর্ম্মের অঙ্গ, কোনটা আমোদ প্রমোদের অঙ্গ। শোভাযাত্রা যেখানে ধর্ম্মের অঙ্গ, সামাজিক রীতি-নীতি সঙ্গত তাহা রাস্তায় বাহির হইবে, এমন ধারার অধিকার প্রত্যেক প্রজার, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের যাহাতে অব্যাহত থাকে, রাষ্ট্র-শক্তিকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

*

* *

এদেশে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বসবাস করে। হিন্দুর শঙ্খধ্বনিতে যদি মুসলমানের ধর্ম্মহানি ঘটে, আর মুসলমানের মহরম দেখিলে যদি হিন্দুর জাতি যায়—রাষ্ট্র সেখানে নাচার। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হিন্দুর শঙ্খধ্বনি ও মুসলমানের মহরম দুই-ই যাহাতে বজায় থাকে সে ব্যবস্থা করা। তবেই দুই জাতি হয় ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে অথবা সহনশীলতার অভ্যাসে ক্রমে শঙ্খধ্বনি আর মহরমের ঢক্কা-নিনাদ ধর্ম্মহানিকর বলিয়া মনে করিবে না।

*

* *

দ্বিতীয়তঃ দেশের প্রচলিত নিয়ম মাফিক মীমাংসা চলিতে পারে। বাঙ্গলার কোথায় কোন্ নিয়ম প্রচলিত, তাহা জানিতে চাহিলে জানা শক্ত নহে। অনিশ্চয়তার মধ্যে মীমাংসাকে না রাখিয়া প্রচলিত নিয়মকে চরম রূপে গ্রহণ করিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত করা এবং সিদ্ধান্তকে পরম 'শান্তি ও শৃঙ্খলার' মতই অপরিবর্ত্তনীয় ও অব্যাহত রাখিতে রাষ্ট্র-শক্তিকে উদ্যত রাখাই সরকারের কর্ত্তব্য।

বাঙ্গলার সরকার—কি নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বের দিক্ দিয়া, কি প্রচলিত নিয়মকে অব্যাহত রাখার দিক্ দিয়া বাজনা-সমস্যা মিটাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কোথাও দাঙ্গার ভয়ে, যাহা সত্য নহে তাহার সঙ্গেই আপোষ করিয়া চলিয়াছেন, কোথাও দুর্ব্বলতা বশতঃ মীমাংসাকে জোড়া-তালি দিতে গিয়া মীমাংসাকে জটিলতর করিয়া ফেলিয়াছেন।'

*

* *

কলিকাতায় তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা না প্রচলিত নিয়মের দিক্ হইতে, না নাগরিক অধিকারের দিক্ হইতে।

সেই সিদ্ধান্তের ফলে মুসলমানরা বুঝিল, আমরা

'তাল করিয়া' 'আন্দোলন' করিতে পারিলে বাজনা না বাজিতেও পারে। হিন্দুরাও ভাবিল, আন্দোলন না চালাইতে পারিলে মুসলমানদের জোর ঠেলিয়া বাজনার শব্দ আর বাহির হইবে না।

সরকারের সিদ্ধান্তে বুঝা গেল না, বাজনা রাজপথে বাজিতে পারে কি পারে না; মসজিদের সম্মুখের রাস্তায় হিন্দুর মন্দিরস্থ দেবীর শোভাযাত্রায় বাহির হইবার অধিকার আছে কি নাই।

সরকার সিদ্ধান্ত করিলেন, কলিকাতার মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজিয়া যাইবে, কেবলমাত্র 'বিশিষ্ট' দুইটি মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলেই কথা দাঁড়ায়, মসজিদের সম্মুখস্থ রাস্তায়ও হিন্দুর শোভা যাত্রায় বাজনা বাজাইবার অধিকার আছে। গোল উঠিল, 'বিশিষ্ট' কথাটি লইয়া। আয়তন বা প্রাচীনতা যে কারণেই দু'টি মসজিদ বিশিষ্ট হউক, ইহা নিশ্চিত, ধর্ম্মের দিক্ হইতে সমাজের দিক্ হইতে কোন মুসলমান কোন মসজিদকেই 'বিশিষ্ট' ভাবেন না।

কিন্তু সরকারের এই ভ্রান্তিতে এই কথা অনেক মুসলমানই ভাবিবার অবসর পাইলেন যে, জোর দেখাইতে পারিলে দু'টি মসজিদকে যে কারণে 'বিশিষ্ট' করা হইয়াছে, তেমন কারণে সব মসজিদই বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে। সরকার যদি 'বিশিষ্টতায়' আহাম্মুখী না করিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতেন যে মসজিদের সম্মুখের রাস্তায়ও বাজনা বাজিতে পারিবে, তবে আজ না হউক কাল মুসলমানরাও 'সুবোধ বালকের' মতই তাহা চরম সিদ্ধান্ত বলিয়াই মানিয়া লইত, —মীমাংসাও হইত।

সরকারের দুর্ব্বলতায় তাহা সম্ভব হয় নাই। তাই আজ সমস্ত বাঙলা জুড়িয়া বাজনা-সমস্যা উঠিয়াছে। এ সমস্যা পূর্ব্বে ছিল না। বাজনা বাজিত কি বাজিত না, তাহা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের জানা শক্ত নহে। তাহা জানিয়া প্রচলিত নিয়ম যাহা ছিল, তাহাকে রক্ষা করিতে রাজ-শক্তির উদ্যত হওয়াই সঙ্গত ছিল,—গজ মাপিয়া গোঁজামিল দিতে গিয়া গজ-কচ্ছপের লড়াই দেখিবার সখ্ তাহাদের থাকিলেও সে সখ্ দমানোই উচিত ছিল। যেখানেই কর্ত্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়মকে চরম বলিয়া উভয় পক্ষকে শুনাইয়া দিয়াছেন, সেইখানেই 'শান্তি' শীঘ্র আসিয়াছে। নূতন নিয়ম করিতে যাওয়াই নূতন বিপদকে ডাকিয়া আনা। ফলে দেশে আজ যে সমস্যা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা দেখা দিয়াছে।

*

* *

সাধারণের উপাসনার সময় বাজনা বন্ধ রাখার যে সর্ত্ত পুলিশ লাইসেন্সে বরাবর থাকে তাহা উদার। কোন সাম্প্রদায়িক লাভ লোকসান তাহাতে নাই। হাসপাতাল, গীর্জ্জা প্রভৃতি সাধারণ উপাসনা স্থলে (উপাসনার সময়) বাজনা বন্ধের কথায় মসজিদ মন্দিরের মান অপমানের কথা উঠে না। সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব এই দাবী করিতে পারে। পীড়িতের অশান্তি না হয় তাহা দেখা সকল ধর্ম্মেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুর শোভাযাত্রার বেলায় যেমন মুসলমানের মহরমের বেলায়ও তেমনি। 'উপাসনার সময়' হিন্দুর শোভাযাত্রার বাদ্য যদি বন্ধ হয়, মহরমের শোভাযাত্রার বাদ্যও হিন্দুর পূজার সময় ব্রাহ্মদের উপাসনার সময় গীর্জ্জায় উপাসনার সময় বন্ধ থাকিবে। কারণ এই বন্ধের আদেশ কোন মন্দির বা মসজিদের আয়তন লইয়া নহে, এই আদেশ পীড়িতের ব্যথা লইয়া, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উপাসকের প্রতি সহানুভূতি বা সহনশীলতা লইয়া।

*

* *

আমাদের ভারতের ভবিষ্যৎ-স্বরাজ্যে হিন্দু মুসলমানকে খৃষ্টান পার্শিকে তুল্য অধিকার দিতে হইবে। কাহারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া অপরের অন্যায় করার প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়া গণতন্ত্রের সর্ব্বনাশ করা চলিবে না।

অপরকে লইয়া যদি বসবাস করিতেই হয় (করিতেই হইবে), অপরের মতকে শ্রদ্ধা করিতে না পারি সহ্য করিতেই হইবে। নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দ্বারা—হিন্দু মুসলমান সাধারণকে তাহাতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

মুসলমান আজ বাজনা বন্ধের কথায় বলিতেছেন যে, হিন্দু যদি মসজিদের কাছে বাজনা বন্ধ না করে, আমরাও রাস্তায় গরু জবাই করিব।

রাস্তায় যদি মহিষ পাঁঠা বলি চলে, তবে মুসলমান ইচ্ছা করিলে গরু জবাই করিতে পারেন—ভারতের স্বরাজ্য সেখানে বাধা দিবে না—কেহ বাধা দিতে আসিলেই বরং বাধা দিবে। কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় পাঁঠা মহিষ বলি যদি রাষ্ট্র বন্ধ করে, গরু জবাইও বন্ধ হইবে।

*

* *

সরকারের দুর্ব্বলতার ফলে মুসলমানরা যুক্তি ছাড়িয়া লাঠি ধরিতে চলিয়াছে। কেবল হিন্দুর শোভাযাত্রাই নহে, হিন্দুর নিজ বাড়ীতে বাজনা বাজিলে সেই বাজনার ধ্বনিও যে মসজিদের এই হালের পবিত্রতা নষ্ট করে, এই আনকোরা তথ্য অজ্ঞ মুসলমানরা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে; হিন্দুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বাজনা বন্ধের চেষ্টা করিয়াছে। বাজনা বাজাইতে পারিলে ধর্ম্ম হয় কি না জানি না; কিন্তু এমন অসাম্য, অন্যায়ের কাছে অধিকারকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিলে যে অধর্ম্ম হয় তাহা জানি; কারণ ইহার ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের মূলে যে সাম্য ও গণতান্ত্রিক চেতনা রহিয়াছে তাহারই গলা টিপিয়া মারা হইবে। সুতরাং হিন্দুর এই অধিকার রক্ষার প্রেরণা জাতীয়তা বলিয়াই আমরা শ্রদ্ধা করি। মুসলমানের মহরমের বাজনা বন্ধ করিতে যদি কেহ জোর করে, আর তাহার বিরুদ্ধে মুসলমান যদি নিজ অধিকার রক্ষার জন্য এমনি চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাও আমরা জাতীয় প্রচেষ্টা বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিব।

*

* *

বরিশালের হিন্দুদের আমরা শ্রদ্ধা করি। যদি সত্যই মনে করিয়া থাক, তোমার ধর্ম্ম-চর্চ্চার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, হইতেছে, তবে কিছুতেই তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য নহে; কর্ত্তব্য, যাহা অধিকার ক্ষুণ্ণ করে তাহাকে অগ্রাহ্য করা।

আজিকার হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ, এমন কথা বলা চলে না। গত এপ্রিলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খুব কম হিন্দু-মুসলমানই ধর্ম্মস্থানের মন্দির-মসজিদের দেব-বিগ্রহের মর্য্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়াছে। দেয় নাই বলিলেও চলে। সংখ্যাবাহুল্য বশতঃ একে অন্যের উপর অত্যাচার চালাইয়াছে, মন্দির মসজিদ অপবিত্র করিয়াছে; ধর্ম্মের নামে মাতিয়াছে, মরে নাই। মুসলমান ধর্ম্মের নামে হিন্দু অপেক্ষা অধিক উন্মত্ত হয়—ইহা অনেকে বলেন, কিন্তু দেখা গিয়াছে, সেই উন্মাদনা—ধর্ম্মের নামে দাঙ্গা করিতে উৎসাহ দিয়াছে, কিন্তু মসজিদ যেখানে দুর্ব্বৃত্তের দল নষ্ট করিয়াছে সেখানে মসজিদ খোদার উপরে ছাড়িয়াই 'প্রাণ-ভয়ে' সকলে পলাইয়াছে, ধর্ম্ম-ভয়ে প্রাণ দেয় নাই। হিন্দুর বেলায়ও তাহাই হইয়াছে। ধর্ম্ম-প্রাণ এই বড়াই আজ বৃথা। ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্য্যাতনের মুখে মানুষের মত যদি প্রাণ দিত, আমরা তাহা জাতীয় গৌরব বলিয়া শ্লাঘা করিতাম। ধর্ম্মের নামে যতখানি বর্ব্বরতা মুসলমানরা দেখাইয়াছে—ততখানি মনুষ্যত্ব দেখায় নাই। গোরার সঙ্গীন যেখানে প্রসেশন্ নিয়া গিয়াছে সেখানে মুসলমান প্রাণ দিয়া মসজিদের তথাকথিত মর্য্যাদা রাখে নাই, কিন্তু নিরীহ হিন্দুর বাড়ীর বাদ্যও গায়ের জোরে থামাইয়াছে, দেব-বিগ্রহ চূর্ণ করিয়াছে।

*

* *

বরিশালে সত্যাগ্রহীদের জন্য আমরা গৌরব বোধ করি ; কিন্তু কলিকাতায় যাদবপুরের ছাত্ররা নিজেদের ব্যবহারে ছাত্র-সমাজের লজ্জা ডাকিয়া আনিয়াছেন। সরস্বতী পূজা ছাত্রদেরই পূজা। সে পূজার শোভা-যাত্রা কলেজ-ষ্ট্রীটের মোড়ে পুলিশ ভাঙ্গিয়া দেয়। ছাত্ররা সত্যই দেবী-প্রতিমাকে দেবীজ্ঞানে শোভাযাত্রায় বাহির করিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু দেবীর মর্য্যাদা—ধর্ম্মের মর্য্যাদা ' তাঁহারা রাখেন নাই—বাঙ্গলার ছাত্র-সমাজের মর্য্যাদাও বাড়ান নাই। কিন্তু ছাত্র-সমাজের ধর্ম্ম-প্রাণতা দেখাইবার—মনুষ্যত্ব দেখাইবার অবসর সেদিন মিলিয়াছিল।

*

* *

আমরা সবাই কিছু ধর্ম্মের জন্য দৃঢ়তা দেখাইতে পারি না। কিন্তু নিজেদের ত্রুটি যে ভাবে কেবলমাত্র পুলিশের জুলুমের দোহাই দিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা হিন্দুর প্রবুদ্ধ চেতনা কি মার্জ্জনা করিতে পারিবে ?

পুলিশের অন্যায় বা জুলুমের কথা এখানে আমাদের বিচার্য্য নহে, পুলিশ সে দিন কতটা বিধি-বিগর্হিত কাজ করিয়াছে, কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছে, তাহা এখানে বিচার করিব না, কিন্তু পুলিশ অন্যায় করিলে হিন্দু কি ভাবে তাহার ধর্ম্মের অধিকার রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাই আমরা দেখিব। পুলিশের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে ছাত্রগণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু সভায় যাদবপুরের ছাত্র শ্রী দেবনাথ দাস শোভা-যাত্রীদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে যে বর্ণনা ও কৈফিয়ৎ দিয়াছেন পরলোকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে তাহা তৃপ্তি দেয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ছাত্র দেবনাথবাবু সভায় বলিয়াছেন, পুলিশ তাঁহা-দিগকে মিছিলের গতি ফিরাইয়া নিতে ৫ মিনিট সময় দেয়। ঢুলির বন্দোবস্ত হইতেছিল—ইতিমধ্যে পুলিশ আক্রমণ করিয়া মিছিল ভাঙ্গিয়া দেয়। এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া তাঁহারা প্রতিমা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নীচে রাখিতে বাধ্য হন—ইহা শোভাযাত্রী ছাত্রদের তরফ হইতে তিনি বলিয়াছেন।

পুলিশের আদেশ যদি অন্যায় বে-আইনী তবে মিছিল লইয়া যাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ছিল। সে যাহাই হউক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নীচে প্রতিমা ফেলিয়া যাইতে ছাত্ররা কেন বাধ্য হইলেন তাহা বুঝিলাম। ধর্ম্মের ভয়ে অথবা প্রাণের ভয়ে তাঁহারা প্রতিমা ফেলিয়া গিয়াছিলেন। পুলিশ লাঠি চালাইয়াছিল, ছাত্ররা দেবী প্রতিমাকে রক্ষা করিতে লাঠির ঘায়ে ঘায়েল হইয়া-ছিলেন।—পুলিশ লাঠি চালাইলে আমাদের জিম্মায় যদি স্ত্রী মা ভগ্নি থাকেন, মার্কেটের নীচে তাঁহাদেরও ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইব কি? দেবী-প্রতিমা কি মা-ভগ্নির মতই পবিত্র নহে? যদি আমাদের চোখে তেমন পবিত্র না হয়, প্রতিমা যদি আমরাও মাটির পুতুলই ভাবি- কোন্ মুখে আশা করিব আমার দেবী-প্রতিমাকে আর কেহ শ্রদ্ধা করিবে —মর্য্যাদা দিবে? লাঠি বা সঙ্গীন মাথায় পিঠে না পড়িতেই, পাছে পড়ে এই ভয়ে, যাহারা প্রতিমা ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, বা লাঠির ঘা একটা খাইলেই প্রতিমা ফেলিয়া পালায় তাহাদের কর্ত্তব্য লাঠির পূজা করা—তাহাই ধ্যান করা—তাহারই শোভা-যাত্রা করা—দেবী-পূজা তাহাদের বিড়ম্বনা। আমরা দেবী-প্রতিমার মর্য্যাদা রক্ষায় কি করিতে পারিতাম তা পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত বলা শক্ত, কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা না করাটা যে অধর্ম্ম ও লজ্জার ইহা স্বীকার করিব। আর পুলিশের বর্ব্বরতা অপেক্ষাও নিজেদের ক্লীবত্বকে ধিক্কার দিব—কে না জানে যে, শুধু সভ্য-ক্লীবত্ব অপেক্ষা বুনো গোঁয়ার বর্ব্বরতাও শ্লাঘ্য।

* * *

আজ বাঙলা-সমস্যা জাতীয় সমস্যা রূপে দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই বাঙলায় জাতীয়তার সাধকদের কর্ত্তব্য, জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, কোন সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে সে দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা লইয়া সংঘবদ্ধ হওয়া। একদিকে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও অপর দিকে সরকারী ভেদনীতি—দুই অসুরকে ঠেকাইয়াই তাঁহাদের ভারতবর্ষের জাতীয়তাকে জয়যুক্ত করিতে হইবে।

* * *

চীনের লড়াইয়ে ভারতের সেনা পাঠানো লইয়া ভারতের রাজনীতিকরা মাথা ঘামাইতেছেন অর্থাৎ সরকারী কার্য্যের নিন্দা করিতেছেন। যে দেশের সরকার দেশের লোকের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও শত শত যুবককে বিনা বিচারে আটক রাখিতে পারেন, চীনে সৈন্য প্রেরণ করা না করা ব্যাপারে সে সরকার 'দেশী' লোকের কথায় 'কান দিবেন' না এ কথা সবাই জানেন—তবু প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কারণ, প্রতিবাদ করা ভিন্ন আর যে কিছু আমাদের দেশের নেতাদের করার নাই তাহা সবাই একপ্রকার জানিয়া নিয়াছেন।

* * *

বাঙলায় মন্ত্রী-মণ্ডল গঠিত হইয়াছে। ইহা স্থায়ী হইবে কিনা এখনো বলা চলে না। স্বরাজীরা মন্ত্রী মাত্রেরই বিরোধী। মুসলমানরা মন্ত্রীত্বের বিরোধী নহেন—কিন্তু ব্যক্তিত্ব সেখানে বড় হইয়া উঠিয়াছে। স্যর আবদার রহিম গজ-চক্র মন্ত্রী-মণ্ডলের বিরোধী, এবং মুসলমান মাত্রকেই সেই দলে টানিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সংবাদ-পত্রে যে সব পত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে স্যর আবদার দোস্তী করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ব্যক্তিগত লাভ লোকসান মুসলমানদের কাছে বড় হইয়া উঠায় তাঁহারা নিরপেক্ষদের দৃষ্টিতে ছোট হইয়া পড়িতেছেন নিশ্চিত। স্বরাজীদের মতে সকলে মত না দিলেও, তাঁহারা যে ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া একটা আদর্শ নিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন—ইহাতেই তাঁহারা দেশের লোকের কাছে বড় হইয়া উঠিতে পারিবেন।

* * *

রাজবন্দীদের মুক্তি-প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্যের ভোটে বাঙলা কাউন্সিলে পরিগৃহীত হইয়াছে। রিফর্ম্মের দৌলতে প্রস্তাব 'পাশ' করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি আমাদের হাতে নাই। মন্ত্রীরা নাকি popular —কারণ তাঁরা people এর representative। দেশী লোকের অভিমত ত তাঁহারা শুনিলেন—প্রস্তাব মাফিক কাজ না হইলে তাঁহারা মন্ত্রীত্ব ছাড়িয়া দিবেন কি?

হোম মেম্বর রাজবন্দীদের আটক রাখিবার স্বপক্ষে সরকারী মামুলি যুক্তি দিয়াছেন। তবে মিঃ মোবারলির বক্তৃতায় মনে হইল, সরকার পক্ষ একটু নরম হইয়াছেন—অর্থাৎ তাঁহারা যেন কনকয় রাজবন্দীকে ছাড়িবেন। জন-কয় রাজবন্দীকে ছাড়িয়া মন্ত্রীত্বকে popular করার চেষ্টা অসম্ভব নহে; কিন্তু সকল রাজবন্দীর মুক্তিই দেশ দাবী করে; সেই দাবী না মিটা পর্য্যন্ত দেশবাসী তুষ্ট হইবে না।

*

* *

হোম মেম্বর মিঃ মোবারলি খান দুই বেনামী পত্র পড়িয়া দেশে যে বিপ্লবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। এই ধরণের বেনামী পত্রে কেহই বিশ্বাস স্থাপন করেন না। যে ব্যক্তি এমন পত্র লিখিয়াছে, তাহাকে বিচারার্থ আদালতে হাজির করা হইল না কেন? যে পত্রের লেখকের নাম প্রকাশ করা চলে না, সে পত্র পড়াও চলে না। দেশীয় সদস্য প্রায় সক্কলই রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাবে ভোট দিয়াছেন। স্যর আবদার দলবল সহ নেহাৎ ঠেকিয়া ভোট দিয়াছেন; স্যর আবদারের কোন কার্য্যে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণই আর দেশবাসীর কাছে উপস্থিত নাই।

রাজবন্দীদের মুক্ত করিবার উপায় মিঃ শকলাতওয়ালা সেদিন বলিয়াছেন। হয় রাজবন্দীদের মুক্ত কর, নতুবা সহস্র সহস্র আমাদের কারাবদ্ধ কর—কার্য্যতঃ ইহা করিতে পারিলে, তবেই রাজবন্দীরা মুক্ত হইতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট কোন একটা ব্যাপারে তেমন সংঘবদ্ধ দৃঢ়তা দেখাইতে পারিলে হয় রাজবন্দীরা মুক্ত হইবে, নয় যাহারা সেই দাবী করে তাহারাও জেলে যাইবে।

সরকারের স্বৈরাচারের পরে দেশবাসীর কাছে এই একটি পথই উন্মুক্ত আছে। জনকয় রাজবন্দীর মুক্তিদানে দেশবাসী যেন নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া না যায়। যে বে-আইনী আইন মনুষ্যত্বের অবমাননা করে, মানুষের কর্ত্তব্য তেমন আইন আইনের পাতা হইতে চিরতরে মুছিয়া ফেলা।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক, ১এ, রামকিষণ দাসের লেন, নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ক্যাম্বা প্রেসিডেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বিদায়
শিল্পী—লর্ড লেটন

কালি-কলম

১ম বর্ষ] চৈত্র, ১৩৩৩ [১২শ সংখ্যা

ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

দেশের যে-জাগরণ কেবল একটিমাত্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ, তাহা কখন সত্যকার প্রাণের জাগরণ হইতে পারে না, তাহা কখন স্থায়ী হয় না। দেশ সত্য সত্যই জীবন্ত হয় যখন তাহার অন্তর-পুরুষ জাগে, আর জীবন তখন একটি ধারায় নয়, কিন্তু যত প্রকার কর্ম্মচেষ্টাকে ধরিয়া মানুষ আপন অন্তরের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পুরুষের শক্তি ও আনন্দ ব্যক্ত করিতে পারে, সে সকলেরই মধ্যে বিকশিত হইয়া চলে। সৃষ্টি আছে, আনন্দের জন্য; এই আনন্দের জন্যই পরম-পুরুষ জীবনের বিপুল লীলার মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার এই আনন্দ নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়া ধরিবারই আনন্দ। এই জন্যই কোন দুইটি ব্যক্তি এক রকমের নয়, কোন দুইটি দেশও এক রকমের নয়। ব্যষ্টি হউক গোষ্ঠী হউক, সাধারণ মানুষভাব ছাড়া প্রত্যেকের আছে নিজের নিজের পৃথক প্রকৃতি। শুধু মানবজাতি হিসাবে বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে দেশ চাহে না, দেশ তাহার নিজস্ব, অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক যে স্বভাব ও সামর্থ্য তাহারও সার্থকতা দাবী করে। এই বিশেষ সার্থকতা যদি সে না পায়, তবে দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং, দেশের কোন কর্ম্মপ্রচেষ্টা জীবন্ত কি না, তাহা দুই রকমে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রথমত, যদি সে চেষ্টা হয় পরের অনুকরণ, বিদেশ হইতে ধারকরা কৃত্রিম জিনিষ, তবে সাময়িক যতখানি সফলতাই তাহাতে হউক না কেন, বুঝিতে হইবে দেশ আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে, চলিয়াছে অনিবার্য্য মৃত্যুর দিকে; প্রাচীন ইউরোপে এই রকমে অনেক জাতি লোপ পাইয়া গিয়াছিল,

যখন তাহারা নিজের নিজের বিশেষ সত্তাটি বলি দিয়া, চাহিয়াছিল রোমকের শিক্ষা দীক্ষা, রোমকের শান্তি, রোমকের সমৃদ্ধি। পক্ষান্তরে, যখন একটা জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলে, যখন তাহার নব নব কর্ম্মচেষ্টা চায় নিজের অন্তর-পুরুষকেই ব্যক্ত করিতে—তখন বুঝিতে হইবে দেশ জাগিতেছে, বাঁচিয়া ও বাড়িয়া উঠিতেছে; —তখন তাহার রাষ্ট্রে, সমাজে, চিন্তার জগতে, বাহিরের প্রতিষ্ঠানে যতকিছু পরিবর্ত্তন বা বিপ্লবই ঘটুক না কেন, সে জাতির ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবার নাই। উনবিংশ শতকে ভারত ছিল অনুচীকির্ষু, আত্মহারা, কৃত্রিম; তখন সে চাহিয়াছিল কি রকমে ইউরোপকে হুবহু ভারতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা যায়; ভারত তাহার গীতার সে গভীর উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছিল—"পরের ধর্ম্ম সুন্দরভাবে অনুসরণ করা অপেক্ষা, নিজের ধর্ম্ম খারাপভাবে অনুসরণ করিয়া থাকাও ভাল; নিজের ধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও শ্রেয়, কিন্তু পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ।" কারণ, নিজের ধর্ম্মে মৃত্যুর ফলে হয় নূতন জন্ম, কিন্তু পরের ধর্ম্মে সাফল্য অর্থ আত্মহত্যায় সাফল্য। ইউরোপীয় হইয়া যাইবার চেষ্টা আমাদের যদি সফল হইত, তবে আমরা চিরদিনের মত আমাদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য, আমাদের বুদ্ধি শক্তি, আমাদের দেশের আছে যে নব নব রূপে আপনাকে সহজেই পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার ও নবজীবনে বার বার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাহা হারাইয়া বসিতাম। ইতিহাসে একাধিকবার এই ধরণের শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—আর একটি, আরও চূড়ান্ত শোচনীয় ঘটনা সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইত শুধু। দেশের সমস্ত কর্ম্মচেষ্টা যদি কেবল অনুকরণে, বিদেশীর পদাঙ্কানুসরণেই পর্য্যবসিত হইত, তবে এই ধরণের পরিণাম অবশ্যম্ভাবীই ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, দেশের প্রাণবায়ু যতটুকুই হউক বহিতেছিল—বাংলার ও পঞ্চনদের ধর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে, মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয়-আকাঙ্খার মধ্যে, বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার মধ্যে। কিন্তু এখানেও দেশের জীবন ফল্গু-ধারার মত তলে তলেই প্রবাহিত ছিল; ভারতের যে নিজস্ব প্রকৃতি, যে প্রাণশক্তি তাহা বিদেশী নামের ও রূপের ভার কাঁধে করিয়া ধুঁকিতেছিল—যে দিন হইতে এই দুই বিরোধী ভাবের মধ্যে দেশেরই ধর্ম্মটি স্পষ্টভাবে বড় হইয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই ভারতের মুক্তি সন্দেহের অতীত। গোঁড়া হিন্দুয়ানী এক দিকে অবশ্য ছিল তামসিক, নিশ্চল, জ্ঞানহীন, অক্ষম—কিন্তু আর এক দিক দিয়া দেখিলে দেখি, এই গোঁড়া হিন্দুয়ানীই দেশকে বাঁচাইয়া ছিল, দেশ যে ধ্বংসের পথে আরও তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলে নাই, পচিয়া গলিয়া একেবারেই শেষ হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ ঐ গোঁড়া হিন্দুয়ানী; ইহারই কল্যাণে, দেশের চিরঞ্জীবী অন্তরাত্মা আপনাকে উপলব্ধি করিবার, আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অবকাশ পাইয়াছিল। ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ, প্রথম বিজয়, ধর্ম্মে। অনেক রকম লক্ষণ বরাবরই দেখা যাইতেছিল, অনেক মহাপুরুষই আসিয়া বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যে দিন একজন

নিরক্ষর সন্ন্যাসীর কাছে, বিদেশের কোন রকম ভাব বা শিক্ষা যাঁহাকে এতটুকু স্পর্শ করিতে পারে নাই এমন এক জন স্বয়ং-সিদ্ধ পাগল ভগবৎ-প্রেমিকের পদমূলে কলিকাতা নগরীর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত-দীক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় যাহারা তাহারাই আসিয়া মাথা নত করিল, সেই দিনই যুদ্ধের ফল স্থির হইয়া গেল। গুরু যে পুরুষসিংহকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, এক দিন সে সমস্ত পৃথিবীকে দুই হাতে লইয়া যথা-ইচ্ছা খেলা করিবে, সেই বীর বিবেকানন্দের অভিযান জগতের কাছে এই কথার প্রথম চাক্ষুষ প্রমাণ লইয়া আসিল যে ভারত জাগিয়াছে কেবল প্রাণধারণ করিবার জন্য নয়,কিন্তু দিগ্বিজয় করিবার জন্য। তারপরে, দেশ যখন সম্পূর্ণ ভাবে জাগিল, তখন তাহার একটি ধারার লক্ষ্য ও সাধনা হইল ইংরাজের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভারতের যে অবস্থা ছিল তাহাকে কল্পনার অঞ্জন দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আবার আলিখিত করিয়া তোলা। কিন্তু ইহাকেও জড়তা বলা যায় না। আমাদের দর্শন পুষ্টির ও পরিবর্ত্তনের অনিচ্ছাকেই "তমঃ" নাম দিয়াছে, আর তমোগুণের আধিক্য ক্রম-অবনতির ধ্বংসের দিকে লইয়া চলে। তাই আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন আক্রমণ; একটা শক্তি যখন তাহার অধিকারের পরিধি বিস্তৃত করিতে বিরত হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে তাহার জীবনেরও বিরাম হইয়াছে। একই স্থানে যে দাঁড়াইয়া থাকে, কেবল আত্মরক্ষা করিয়া চলে, "সন্ধ্যা"র ভাষায়, নিজের "কোটে"র মধ্যে যে আশ্রয় গ্রহণ করে আর সেখান হইতে বাহির হইতে চায় না, তাহার পরাজয় নিশ্চিত—দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে পাইতে অনতিবিলম্বে সে জীবন্ত জিনিষের জগৎ হইতে নিশ্চিহ্নভাবে লোপ পাইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম চিরকালই ছিল সচল, বিজিগীষু; আক্রমণকারীকে সে আগাইয়া গিয়া আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ছাউনী তাহার দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহার ধন দৌলত লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে, তারপর তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিয়াছে, কিম্বা দেশের মধ্যে তাহার অবস্থান এমন একটা অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক জিনিষ করিয়া ধরিয়াছে যে পরিশেষে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দিতেও কোনও কষ্ট হয় নাই। অন্য দিকে, যখনই হিন্দুধর্ম্ম শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাকে কেবল বাঁচাইয়া ফিরিতে চাহিয়াছে, তখনই একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে ও সেই সময়ের মত তাহার শরীরে ক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিয়াছে।

ধর্ম্মের ক্ষেত্রে দেশের অন্তরাত্মা যখন একবার জাগিয়া উঠিল, তখন সকল রকম আধ্যাত্মিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সেই অন্তরাত্মার বিকাশ ও আবেশ, শুধু সময়ের ও সুযোগের অপেক্ষায় রহিল। বঙ্গভঙ্গের দরুণ দেশে যে দারুণ বিদেশী-বিদ্বেষ দেখা দিল তাহাই আনিয়া দিল এই সুযোগ। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ—এ সব বৃত্তি নিজেরা যে কিছু প্রশংসার্হ, তাহা নয়: তবে ভগবান তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই সকল জিনিষও কাজে ব্যবহার করেন, অমঙ্গল হইতে তিনি মঙ্গলের সৃষ্টি করেন। এই বৃত্তিগুলিই দেশের জড়তা, ঔদাসীন্য দূর করিল ও তৎপরিবর্ত্তে আনিয়া দিল উৎসাহ, বিপুল

আবেগ ; এই উৎসাহ ও আবেগকে ধরিয়াই দেশের অন্তর-পুরুষ ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের আয়োজন করিয়া চলিল। ইউরোপীয়দের প্রতি বিদ্বেষ, তাহাদের বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর প্রতি-হিংসা, তাহাদের সম্পর্কিত যাহা কিছু সমস্তের উপর ঘৃণা, দেশের মধ্যে যে ক্রুদ্ধ মনোভাব বহাইয়া দিল তাহার ফল হইল অব্যবহিত পূর্ব্ব যুগের ইংরাজী-ভারত লোপ পাইল, দেশ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল ; আর যে অনুপ্রেরণা ধর্ম্ম-জীবনে আমাদের আগে হইতেই দেখা দিয়াছিল, তাহাই এই উন্মুক্ত পথ দিয়া আমাদের রাজ-নীতিক জীবনে প্রবেশ করিল, দেশের নিজের অতীতের দিকে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টি গিয়া পড়িল, তাহার একটা সত্যকার নিজস্ব ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রাণ দুর্জ্জয় আবেগ উন্মুখ হইয়া উঠিল। ভারতের যে নিজস্ব প্রতিভা তাহা বাস্তবে এখনও আমাদের সমস্ত রাজনীতিক ক্ষেত্রকে অধিকার করিতে পারে নাই—তবে প্রাণে ভাবে সে বস্তু যে সজীব ও বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহাই দেশের সত্যকার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া ধরিবার জন্য সাহায্য করিতেছে ; বাকি যাহা কিছু তাহার শুধু সময়ের অপেক্ষা। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এখন নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ধর্ম্ম ও রাজনীতি, এই দুইটিই হইতেছে দেশের অন্তর-পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী প্রকাশের ধারা, দেশের প্রাণের পরিচয় মুখ্যত এই দুইটির মধ্যে ; ইহারাই যখন দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, তখন আর যাহা প্রয়োজন তাহা যথাসময়ে আমাদের আসিবেই। আমাদের আধ্যাত্মিক ও রাজনীতিক জীবনের প্রয়োজনই বর্ত্তমানে সকল প্রয়োজনের উপরে, ইহারাই এখন সত্যকার ও জীবন্ত বস্তু ; এই প্রয়োজনের অনুসারেই আমাদের সমাজ, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নূতনরূপে গড়িয়া উঠিবে, আমাদের সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে শিল্পে —ইউরোপের নয়, ভারতেরই একটা অভিনব নিজস্ব প্রতিভা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

এই ধরণের একটি প্রেরণা ইতিমধ্যেই বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও শিল্পে কাজ করিতে সুরু করিয়াছে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া ধরিবার প্রয়োজনের বশে দেশের অন্তর-পুরুষ বঙ্গ-সাহিত্যকে সহসা তাহার সত্যকার সনাতন নিজস্বের চেতনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিল ; এই আত্মোপলব্ধি ফুটিয়া উঠিল দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে। গীতি-কাব্য, গীতি-কবিত্ব, সহজ সরল মর্ম্মস্পর্শী কথা, গভীর তীব্র আবেগ, অসম্বৃত আত্মহারা উৎসাহ, মাধুর্য্যে সামর্থ্যে মিশ্রিত প্রেম ও ভক্তির উদাত্ত মূর্চ্ছনা, হৃদয়ের অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সবল মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্যে 'বাস্তবের ক্ষেত্রেই শরীরী হইয়া উঠিতেছে যে অতীন্দ্রিয় ভাব সমাধি, যে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মদৃষ্টি—ইহাই হইল বাঙ্গলার প্রাণ। আমাদের সাহিত্য যদি সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত হইয়া উঠিতে চায়, তবে এই প্রতিষ্ঠা হইতে তাহাকে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহাতে যত পরিবর্ত্তন যত নব নব বৈচিত্র্যই ফুটিয়া উঠুক না কেন, এই মূল রাগের সহিত সংযোগ কখন যেন সে হারাইয়া না বসে। এই বঙ্গদেশেই আবার দেশের অন্তর-পুরুষ শিল্প

কলায় আপনার সার্থকতা পাইতে চাহিতেছে। মোগলদের পরে দেশের একটা নিজস্ব শিল্প এই প্রথম গড়িয়া উঠিতেছে—তাহার প্রবর্ত্তক ও গুরু হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবশ্য এই শিল্প-সৃষ্টিতেও বিদেশী প্রভাবের ভেজাল কিছু দেখিতে পাই। তবে সে বিদেশ এসিয়ার বাহিরে নয়। গুরু এই প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গোড়া-পত্তন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পন্থায় যে শিষ্যেরা চলিয়াছেন তাঁহাদের সৃষ্টিতে একটা পরদেশী কি ভাব যেন লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই প্রভাবও খুব সাময়িক বলিয়াই মনে হয়। কারণ, ইতিমধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পারি দেশের অন্তর-পুরুষ এই প্রভাবটুকু হইতেও আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতেছে, একান্ত নিজস্ব রূপেরই মধ্যে আপনাকে বিকশিত করিয়া ধরিতেছে। এই ক্ষেত্রেও বাংলা প্রকাশ করি-তেছে বাংলারই বিশিষ্ট প্রকৃতি। ভারতের শিল্প-কলা চাহিয়াছে রূপের মধ্যে, সীমার মধ্যে অরূপের ও অসীমের কিছু প্রকাশ করা। গ্রীকেরা এত ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে নাই, তাহাদের লক্ষ্য ছিল অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য; তাই তাহারা পাইয়াছিল পূর্ণ সিদ্ধি, তাহাদের সাফল্যে কোন ত্রুটি ধরিবার নাই। স্থূলরূপের সৌন্দর্য্যানুভব আমাদের চেয়ে তাহাদের ছিল বেশী, তবে সূক্ষ্ম রেখার ও বর্ণের সৌন্দর্য্যানুভব তাহাদের অপেক্ষা আমাদেরই বেশী। আমাদের ভবিষ্যতের শিল্প বস্তুকে ধরিয়া বস্তুর অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে প্রকাশ করা যায় এই সমস্যা সমাধান ত করিবেই —কারণ, ভারতীয় শিল্পের ইহাই বৈশিষ্ট্য। তাহারই সাথে আবার অর্থ ভূয়িষ্ঠ রূপ ও বর্ণকে নির্দ্দোষ করিয়া ধরিবে, নূতন ভঙ্গীতে উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিবে। বাঙ্গালীর মত আর কোন ভারতবাসীরই এমন সজাগ রূপবোধ নাই। অন্যান্য ভারতবাসীর মত একটা বৈদান্তিক দৃষ্টি তাহারও জন্মসিদ্ধ; তদ্ব্যতীত বাঙ্গালীর আছে সৌকুমার্য্য, লালিত্য ও সামর্থ্যের দিকে একটা প্রবল আকর্ষণ। শিল্পের নূতন ধারা যখন বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত হইল তখন স্বভাবতই বাঙ্গালীর ঝোঁক ঠিক এই গুলির দিকেই গিয়া পড়িল। প্রাচীন ভারতের যে সামান্য শিল্পাবশেষ এখনও বর্ত্তিয়া আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গালী শিল্পের একটা অখণ্ড পূর্ণ আদর্শ পাইল না, তাই বাধ্য হইয়া তাহাকে জাপানের সহায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে—কারণ, জাপানী-শিল্প লালিত্য ও সৌকুমার্য্যের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু বস্তুর গভীরতম অন্তরাত্মাটি প্রকাশ করিবার রহস্য জাপান জানে না, জাপানের লক্ষ্য তাহা নয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা কেবল সৌকুমার্য্য, লালিত্য ও সামর্থ্যের সম্মেলন নয়; সেখানে আছে গানের মূর্চ্ছনার মত লোকাতীত প্রহে-লিকার দিকে একটা গতি, তাহারই সাথে আবার প্রসাদ গুণের, সুষীম রূপণের উপর প্রগাঢ় প্রীতি। তাই বাঙ্গালীর সাহিত্যের মত, তাহার শিল্পেও এই সব বৃত্তিগুলিই ফুটিয়া উঠিয়াছে—পরিষ্কার রেখাপাত ও রূপায়ণের মধ্যে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে একটা সৌন্দর্য্যাবেগ, একটা অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও অধ্যাত্মভাব। এখানেও দেখিতেছি দেশের স্বাধীন অন্তর-পুরুষ বিদেশীর বন্ধন ও শৃঙ্খল হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া ধরিতেছে।

এই যে বিপুল সৃজনী সঞ্জীবনী শক্তি, তাহার

প্রভাব হইতে আমাদের জীবনের কোন আয়তনই রক্ষা পাইবে না। কোন সন্দেহই নাই, আমাদের সমাজকে এমন নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, যে তাহা হয়ত একটা বিপ্লবেরই সামিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে বিপ্লব ভারতের সমাজকে ইউরোপীয় সমাজের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবে না—এ বিষয়ে সাধারণ সমাজ-সংস্কারকেরা অন্ধভাবে যে আশাই পোষণ করুন না, সে বিপ্লবের লক্ষ্য হইবে সমাজের মধ্যে দেশের অন্তরের স্বধর্ম্মকে আরও পূর্ণরূপে শুষ্ঠুরূপে মূর্ত্ত সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা নয়, রেষারেষি করিয়া পরস্পরের ধ্বংস-সাধন নয়; কিন্তু প্রীতি ভালবাসা, একই অভিন্ন জীবন-ধারায় সকল ব্যক্তিকে সংযুক্ত করিয়া ধরা—ইহাই হইল ভারতের সমষ্টিগত জীবনের প্রেরণা। অতীতে এই প্রেরণাই ফুটিয়া উঠিয়াছিল একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে, গ্রাম্য-সমিতির মধ্যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে মিলনের সূত্র ছিল রক্তের সম্বন্ধ, গ্রাম্য-সমিতিতে মিলনের সূত্র ছিল একটা সমবায় পদ্ধতি, চাতুর্ব্বর্ণ্যে মিলনের সূত্র ছিল জন্মাধিকার ও গোষ্ঠীগত মর্য্যাদাবোধ। ভবিষ্যতে এই মিলনের সূত্র আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আধ্যাত্মিকতাময় হইয়া উঠিবে—এই আশাও করিতে পারি। ব্যবসা-বাণিজ্যেও যদি আমরা ইউরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করি, যদি চাহি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বার্থের প্রতিযোগীতা, কেবল লাভের জন্য দল বাঁধা—কিম্বা আজকালকার যুগের সর্ব্বনাশা যে বিরাট মহাজনী কারবার অর্থাৎ কয়েকজনে বা কয়েকটি দলে মিলিয়া পৃথিবীর সকল বাণিজ্যের অধিপতি হওয়া, যাহার নাম ইংরাজীতে ট্রাষ্ট (Trust) বা সিণ্ডিকেট্ (Syndicate), তাহাই যদি আমাদের লক্ষ্য হয় তবে আমরা কখনও দেশের অর্থনীতিক জীবন নূতন করিয়া নিরাময় করিয়া গড়িতে পারিব না। এই সব ধরণের মিলন-সূত্র ভারতকে কখন এক করিয়া ধরিবে না। ভারত যে জীবনের সন্ধানে চলিয়াছে তাহার গভীরত্ব, তাহার মহত্ত্ব, তাহার বিপুলতা পৃথিবীর মানুষ আজও কল্পনা করিতে পারে না। সেই জীবনের রহস্য ভারত যখন পাইবে, তাহাকে যখন বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ করিবার কৌশলও অধিকার করিবে, তখনই ভারতের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনও সমর্থ ও সমৃদ্ধ হইয়া চলিবে।

স্বদেশী এযাবৎ বেশীর ভাগই ছিল ইউরোপের ছাঁচে আমাদিগকে ঢালিয়া গড়িবার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় যাহা কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা ধরিয়া চলিবার যে প্রবৃত্তি সেটিরও যেন আমরা বশীভূত না হইয়া পড়ি, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতীতে হিন্দুত্বের এরকম প্রকৃতি ছিল না, ভবিষ্যতেই যে এরকম হইবে, এমনও কোন কারণ নাই। সকল জীবনধারায় আছে তিনটি স্তর—প্রথমে, চিরস্থির সনাতন যে আত্মা (Spirit) দ্বিতীয়, অন্তরাত্মা (Soul), যাহা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে অথচ সকল পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্যে একই রহিয়াছে; আর তৃতীয় হইতেছে ভঙ্গুর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল দেহ। আত্মাকে আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারি,

বা হারাইয়া ফেলিতে পারি। অন্তরাত্মার সহিত বিশেষ সাবধানে আমাদের কারবার করা উচিত; জোর করিয়া যেন পরধর্ম্মের ছাঁচে তাহাকে না ঢালিতে চাই, তাহার স্বাধীন প্রসারে যেন কোন বাধা না দিয়া বসি; আর শরীরকে ব্যবহার করিতে হইবে কেবল যন্ত্ররূপে, তাহার নিজস্ব একটা মূল্য আছে এই বিশ্বাসে যেন তাহার উপর অতিমাত্রায় আকৃষ্ট না হইয়া পড়ি। অকারণ পরিবর্ত্তনের লোভে পড়িয়া আমরা প্রাচীনের কোন বাহ্য রূপকেই পরিত্যাগ করিব না; আবার দেশের অন্তর-পুরুষ যদি পুরাতন কিছুকে ফেলিয়া দিতে বলে, দেশের অমর অন্তরাত্মার সুষ্ঠুতর ও সভ্যতর প্রকাশ যাহাতে হয় এমন নূতন কিছু সে চায়, তবে তাহাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।

অনুবাদক—শ্রী নলিনীকান্ত গুপ্ত

সিন্ধুতীরে

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ক্ষুব্ধ, ফেনিল, উত্তালোর্ম্মিভঙ্গে সঘন-গর্জ্জৎ,
হে দূর অপার নীলপারাবার! শুন এ কবির কৈফ্যৎ,—
কেন আসি তব তীরে,
না রচি ছন্দে তব বন্দনা বার বার যাই ফিরে।

কেন অবিরাম উঠিছে গগনে গুরু গর্জ্জনগান,
কেন অশান্ত ও নীলবক্ষ চিরদোদুল্যমান,
কেন এ ব্যাকুল ক্রন্দন তব, কেন হেন বিক্ষোভ,
কেন তরঙ্গ-বাহু-বন্ধনে চাঁদেরে ধরিতে লোভ;—
নানা কবি আসি নানান্ কারণ ক'রে গেছে অনুমান;
গভীর ছন্দে শঙ্খমন্দ্রে অমর সে সব গান।

কিন্তু সিন্ধু মোর মনে জাগে, যত তোমা পানে চাই,
অকবির মত অগভীর যত ভাবনা যা-খুসি-তাই।
তাই মনে ভয় বাসি,
সে সব প্রলাপ গাঁথি না ছন্দে, ফিরে যাই ফিরে আসি।

কভু ভাবি,—কোথা ঐরাবত সে হাবুডুবু খায় ডুবে ?
অপূর্ব্ব নারী উর্ব্বশী হায় কোথা গেল আজ উবে ?
কে জানে লক্ষ্মী কেমন আছেন পৌঁছি' গোলকধাম।
চন্দ্রমরুর মরীচিকা-সুধা-বোতলের কত দাম!
কত ভরি ছিল কৌস্তুভখানি ; ইন্দ্রের পারিজাত
কি লোভে ধরার পালিতা মাদারে দিয়ে গেল নিজ জাত ?
সত্যযুগের সত্য সে সব,—কবির স্বপ্নে জাগে ;
শুধু, আজও চলে মন্থন,—এটা সত্য ব'লেই লাগে।

চলে মন্থন, চোখের উপরে আজও মন্থন চলে,—
ভীম নর্ত্তনে গুরু গর্জ্জনে কল্লোল-কোলাহলে!
চলে মন্থন, চলে মন্থন, দোলে তাণ্ডব-দোল,
ঘূর্ণামন্থে ভ্রান্ত সিন্ধু উত্তাল উতরোল।
হর হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ হুঙ্কারে ব্যোমকেশ,—
বঞ্চিত শিব বিশ্বের ধনে। মন্থন কোথা শেষ ?
চলে মন্থন, চলে মন্থন, জলে জলে জ্বলে জ্বালা,
হর হর হর গর গর গর উগারে গরল কালা।
কী অহর্নিশ উঠে কালবিষ, ত্রাহি ত্রাহি ওম্ ওম্।
গরল ধূম্রে নীলাচ্ছন্ন মহাঅর্ণব ব্যোম্।
চলে মন্থন, চলে মন্থন, টলে রে ব্রহ্মকোষ,
তা তা থৈ থৈ, মাভৈঃ মাভৈঃ ভৈরব-নির্ঘোষ।
ভরিয়া আকাশ-মহাগণ্ডূষে উজ্জ্বল নীল বিষ,
হাঁকে ধূর্জ্জটী,—'কে কোথায় চির-দুখ-নিশা বঞ্চিস্ ?
আয় আয় যত চির-বঞ্চিত, এক সাথে করি পান
অমৃত-সিন্ধু-মন্থনোত্থ দুর্ভাগ্যের দান!'

হা হা হা হাস্যে মহাঅম্বরে সম্বরি জটাজাল,
মহাগণ্ডুষে মহাকালকূট মুখে তোলে মহাকাল!
চলে মন্থন, চলে মন্থন,—মিলায় অট্টহাসি,
অনন্ত-চুম্বনে টানে হর অনন্ত বিষরাশি!
কোথা উর্ব্বশী, কোথা সুধাশশী, হায় রে দুঃস্বপন!
মরণঞ্জয় মরণ পিয়ে রে—আকণ্ঠ, আমরণ!
অনন্ত ব্যোম-কণ্ঠে জ্বলিছে নীলকূট নিশি দিন,
বিষাচ্ছন্ন-চেতন শম্ভু বিষচুম্বনলীন।
চলে বিষপান, চলে বিষদান, চলে চিরমন্থন,
অনন্ত-নাগ-বন্ধনে ঘোরে অনন্ত ক্রন্দন!
দেবতার সুধা দেবতা হরিয়া অদৃশ্য কোন্‌খানে;
বিশ্বনাথের কণ্ঠে বিশ্ব নীল হ'ল বিষপানে!
তবু মন্থন, চলে মন্থন, অযাচিত অকারণ;—
জীবসাথে শিব বিষ-নির্জ্জীব, কেবা করে নিবারণ?

তাই নিরুপায় চির হায় হায় হে সিন্ধু তব জলে;
অমৃতপ্রয়াসে যত উঠে বিষ তত মন্থন চলে!
তাই এ অর্ব্বাচীন কবি,—
দেখেছে, ভেবেছে, এসে ফিরে গেছে,
গাহেনি, আঁকেনি ছবি।

কবলুতি

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী মনে ধরল না। নামটাই আছে, আর আছে পাথর চাপা পড়েছে। ভাগ্যবানদের ওপর ঝাড়ু জবর জবর কবর! যারা কিংখাপ মোড়া থাকত—তারা বোলানো হয়।

চাকরির স্থান এ নয়। অথচ আমাকে কাজ করতে হবে। চললুম লাহোর। মিয়াঁমির বড় ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট,—আপিস অনেক,—নতুন পত্তনও চলছে।

বাঙ্গালী শ্রীগৌরাঙ্গের দেশের লোক। এই সে-দিন তিনি আমাদের দাস্য-ভাবে দীক্ষা দিয়ে সরে গেছেন,—মন্ত্রটা মক্স করবার ফিল্ড (field) মিলছিল না। এমন সময় এক গৌরাঙ্গের বদলে লাখ গৌরাঙ্গের আবির্ভাব! বীজের ভেন্ বস্‌লো শ্রীরামপুরে;—ঢালাই সুরু হ'ল কলকেতায়। সৌতির চেয়ার নিয়ে পেয়ারীচরণ সরকার ফাষ্ট্-কেলাস্ ফার্ষ্টবুক্ বানিয়ে দিলেন! যিনি খুলেছেন তিনিই—met a lame man! কিন্তু সেই পঙ্গুই গিরি লঙ্ঘন করতে শেখায়,—এমন ঝাঁঝালো বীজ! যা পড়ে আমরা—পঙ্গুরা, যেন চতুষ্পদ পেলুম,—দাস্য-ভাব সিদ্ধির জন্যে চতুর্দ্দিকে ছুটলুম।

এসে দেখি—সব আপিসেই বাঙ্গালী! এরা দেশ ছেড়েছে, ধর্ম্ম ছাড়েনি!

আপিসের মধ্যে কমিসেরিয়েট আপিস্‌ই প্রধান, অর্থাৎ —বাঙ্গালীবহুল। গৌরাঙ্গের পেটের ভার আর ভাঁড়ার তাঁদেরই হাতে।

দেব-সেবকদের ধর্ম্মভাবটা আপসেই আসে,—এঁদেরও এসেছিল। ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট মাত্রেই কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা এঁরাই করেন।

রাজধানীতে গ্রেট্ ইষ্টারন্ (Great Eastern) জন্মালেও এ-অঞ্চলে আমাদের একটি Small Northernও তখন ভূমিষ্ট হয় নি। বিদেশে নবাগত বাঙ্গালী এই কালীবাড়ীতেই আশ্রয় পেতেন, Sheep এরাও, student-shipএরাও! অধীনও পেয়েছিলেন।

এখন তো 'সত্যযুগ',—চাইলেই চপ আর চায়ের কপ! তখন চানাও মিলত না। ধর্ম্মের একটা গুণ—ভয় বাড়ায়। পুণ্যকর্ম্ম যত বাড়তে লাগল,—ধর্ম্মশালাও ততই ঠেল মারলে। এখন গেরুয়া না নিলেও চলে।

এখন তাই মনে হয়—আমরা "যদি জন্ম নিতাম",—কি বলেন আশুবাবু?"

আশুবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন—"পাঞ্জাবের জল হাওয়ায় তেমন দেখায়না বটে, বয়সটা কিন্তু কম হয়নি! এখনো এই ছেলেমানুষীগুলো ভালো লাগে!—লাহোরে এসে তো পৌঁছে গেছেন,—এখন উঠবেন কি?"

হরেন বাবু বললেন,—"অভ্যাস বড় পাজি জিনিস্ আশুবাবু,—চোর সাধু হয়েও স্বপ্নে পরের পুঁটলি সরায়! আর—জ্ঞানই যখন হ'ল না,—ছেলেমানুষ বইকি! হ্যাঁ—লাহোরে আবির্ভাবের প্রথমাঙ্কটা একটু চিদ্‌ঘন হলেও, স্বতীর্থদের না শুনলেও চলে বটে! তা আপনি তো গেরুয়া পরতেন ধোপার কষ্টে—আর জটিল ব্রহ্মচারীর জেদে,—ও বেশে আপনাকে তোফা মানাতো বলে!—

আমার দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রহ্মচারীর চেহারাখানা দেখেছেন তো? কিরাতী কায়া, হঠযোগীর দেহ—খাঁটি ইস্পাতি গড়ন। শুনেছি আটারো বছর বয়সেই পায় পায় হিমালয় পেরিয়ে তুরিয়ানন্দের তল্লাসে তিব্বতে যাচ্ছিলেন। মাইনার (minor) বলে মা মানা করেন। না শোনায় শেষ বাঘ লেলিয়ে দেন! তুমুল সংগ্রাম,—খড়্গে পড়ে' অজ্ঞান!—

"সেই অবস্থায় প্রত্যাদেশ পান—"লাহোরে কালীবাড়ী বসবে, সেইখানেই আমার পূজা করিস, অভীষ্ট লাভ হবে।"

"জ্ঞান হলে' দেখেন—মাথা ফেটে রক্তারক্তি, দাগটাও দাঁড়িয়েছে বেজায় 'বামালি', আবার বাঁ কানটার খানিকটে নেই! যাক্,—জটা-কামে এখন সে সব সেরে নেছেন—ঢাকা পড়ে গেছে।

"দিনে কোথায় কোন্ গর্ত্ত-গৃহে নাকি সমাধি নিতেন, —অন্তরঙ্গরাই জানতেন। তিন দিন পরে আমাকে বললেন—"এটা সাধুদের আস্তানা—গৃহীদের দীর্ঘ সঙ্গটা —অন্তরায়। তবে—

"মনে হ'ল গেরুয়া খানা ফেলে কি কুকাজই করেছি! আমিও তো চারশো টাকার মতো—। যাক্, বললুম—"একটা কাজ পেলে—"

"আর বলতে হ'ল না। সাধুরা অন্তর্য্যামী, বললেন—

"ওঃ,—ছোটো এ, বি, (•a, b,) আর ওয়ান্, টু, (1, 2) লিখতে পারো? আধ-ইঞ্চি হরপ ফাঁদতে পারলেই হবে!"

"আজ্ঞে তা পারি।"

"তবে আবার ভাবনাটা কি! আচ্ছা, থাকো দু' চার দিন।"

পরে উদাস ভাবে বললেন—"নীচু পরদা, আচ্ছা—যা-দৃশি ভাবনা যস্য!"

বুঝলুম,—আর যাঁরা আছেন তাঁরা উঁচু পরদার সাধক,—"পর-লোকের ওপরেই লক্ষ্য।"

আশুবাবু চোখ-মুখে বিরক্তি ভাবটা ছড়িয়ে বললেন—"দেখুন হরেনবাবু—ঠাট্টা বিদ্রুপ সব কথায় ভাল নয়! যে বিষয়ের কিছুই বোঝেন না—সে-সম্বন্ধে কথা কওয়া—অনধিকার চর্চ্চা! ওরূপ মত প্রকাশ করাটা—"

"মূর্খতা—ঠিক বলেছেন। নাঃ আর বলচি না। তাতে আবার শাস্ত্রই উটিকে বলেছেন—গুপ্ত-বিদ্যা! এখন বুঝতে পেরেছি,—অত অল্পে হাত গুটোনো ভাল হয় নি, ওতে—বুদ্ধি স্থির-প্রতিষ্ঠিত হয় না,—অধিকারও আসে না। মাপ করবেন আশুবাবু,—অজ্ঞানে ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিয়ে বসেছি। তবে আপনিও একটু ভুল করছেন—আমার এটা যে কবলুতি (confession) সে-কথাটা ভুলে যাচ্ছেন। মনে যা যা হয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে বাইরের ব্যাপারটা বললেই সব বলা হবে কি? আমার মনটাই যে মন্দ ছিল!"

আশুবাবু উপেক্ষাচ্ছলে বললেন—"বাত্ তো ঢের শোনা গেল—রাতও হয়েছে। আমি উঠছি।"

উঠলেন না কিন্তু।

বেলা আটটা হবে,—বেড়াতে বেরুচ্চি, এমন সময় এক তক্‌মাধারী তেওয়ারী এসে উপস্থিত! চেহারাতেই চম্‌কে দিলে! কেরে বাবা!

দেখি,—চাক্‌তির ওপর চেপে আছেন—"কমিশনার্স আপিস্ (Commissioners Office)! গ্রহ একদম্ গোচরে!

পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছিলুম। পীরের প্যায়দা বললে—"ঠ্যায়রিয়ে বাবু—আপ নয়া আয়েঁ?"

আর বাবু কেনো বাবা! গেলুম আর কি! বুকে রক্ত নেই,—মুখে বললুম—"হাঁ"।

"চলিয়ে, কম্‌সনার্ সাব বোলায়ে।"

তখন আমাতে আর আমি নেই। যমে ডেকেছে,—'না' বললে—হাতকড়ি দেবে।

ভাবলুম,—কালীবাড়ীতে আর কেলেঙ্কারি কেনো,—ওঁদের গেরুয়া তো আমার জেলের খেরুয়া ঘোচাতে পারবে না। দুর্গা বলে' সঙ্গে চললুম,—যেন কাঠের পুতুল! মাথা ঘুরছে, চোখ ঝাপসা দেখছে!

"মন—বালককাল থেকে প্রয়াগ পরিত্যাগ পর্য্যন্ত—পাতা উল্‌টে চললো: ভদ্র সন্তান,—অশিক্ষিতও নই,—সদরালার ছেলে,—জমিদারের জামাই,—শেষ এই ছিল!—

"এ সেই জবরদস্ত যাদবের কাজ,—মুড়কির মান রক্ষা! উঁ হুঁ,—হৃদেন্দ্র বাবু কখনই নন।

"অবস্থায় পড়ে কাজটা করেছি বটে, স্বভাব এড়াতে পারিনি—মজা মনে করেই করেছিলুম, কিন্তু এক দিনও তাঁকে ভুলিনি। তাঁর টাকা আমি দিতুমই—

"পা বেতালে পড়ছিল,—দু' তিনবার টক্কর খেলুম। মাকে মনে পড়ে লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল, চোখে জল বেরিয়ে এল। যাবার বেলায় মাথায় হাত দিয়ে বলে-ছিলেন—"হরেন, মন কষ্টের বাড়া কষ্ট নেই;—বড় ঘরে এসে সতীনের কষ্ট বড় পেয়েছি, বুকে আর কিছু নেই,—তুমি কারুকে মনোকষ্ট দিও না বাবা। বাপের আদর পাবে না,—তার আশা করে মনোকষ্ট পেওনা। ভগবানের কাছে সব পাবে,—তাঁর পায়েই রেখে চললুম!" দু' চোখ তাঁর ভেসে গেল।"

হরেন বাবু নিশ্বাস ফেলে—চোখ মুছলেন। একটু নীরব থেকে বললেন,—সব কথা মনে পড়ে সর্ব্বাঙ্গে আগুন লেগে গেল!—

কি করলুম! জোচ্চোরকে ভগবান কি দেবেন! যা তার পাওনা—তাই দিতেই ত' নিয়ে যাচ্ছেন।

"বেশ তাই দিন। মনোকষ্ট পাবার তো কেউ নেই,—বেদনা বোধ কেউ করবে না।—হ্যাঁ, একটু যে করবেন—বেণীঘাটের সেই লোকটি! আর—মা যদি করেন! উঃ বুকে কে যেন ছুরি মারলে! কেঁদে ফেললুম,—কেনো মনে করে দাওনি মা! তখন যে আমার আট বছর বয়েস!

"পড়তে পড়তে একটা কি ধরে সামলালুম। দেখি—লোহার গরাদে! না, এ যে ফটোক,—তবে ত' এসেই গেছি! আচ্ছা,—সব সত্যিকথা বলবো,—মা তুমি বল দাও; যা হয়, হোক্—তোমার আশীর্ব্বাদ বলে নেব'।

"এতক্ষণে সোজা হ'তে পারলুম। শুধু সত্য বলবার ইচ্ছাই আমাকে শক্তি দিলে। তখন আমি—চোর নই, জোচ্চোর নই,—সত্যবাদী।

"জেলে যাবার আগেই যেন মুক্তি এসে গেল!

*

* *

সাহেব ব্রেকফাষ্ট্ সেরে বারাণ্ডায় বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে—অবাক হয়ে চাইলেন,—যাকে বলে নিরীক্ষণ।

একে আমি ঢ্যাঙা মানুষ, তায় মুক্তি-স্পর্শে মাথা আকাশে ঠেকেছে—চাউনিও নির্ভীক! সোজা এক সেলাম পৌছে দিলুম! সেটা তাঁর মাথা ডিঙিয়ে গেল' বোধ হয়!

মুখে হাসি মাখিয়ে, ঠোকোর-সেলাম (nod) দিয়ে হিন্দিতে বললেন,

"বাবু টুম্ ইংরেজি লিখনে জান্টা?"

ইংরিজিতেই উত্তরটা দিলুম—"সার্ আমি ইংরিজি পড়তে, লিখতে এবং ইংরিজিতে কথা কইতেও জানি।"

শুনে একটু থমকে গেলেন। তারপর—নাম, ধাম, শেষ—বাপের নাম! শ্রাদ্ধের পুরোহিতের ওটা না জানলে সুবিধা হয় না।

বললুম,—লজ্জা বাধা দিলেও সত্য বলতে আমি বাধ্য,—আমি অমুক সব-জজের অযোগ্য পুত্র!

সাহেব বললেন—"শুনে বড় খুসি হলুম। কিন্তু তোমাকে বৃথা কষ্ট দিলুম বলে দুঃখিতও হচ্ছি। আমি যে কাজের জন্যে লোক খুঁজছি—তার মাইনে চল্লিশ টাকা মাত্র। ষাট্ টাকা পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা আমার আছে। আপাতকের মত তাতে যদি সম্মত হও, তোমার সত্বর যাতে ভালো হয় তার আমি চেষ্টা পাব। রাজি আছ কি?"

"লোকটা খুব রসিক তো! কয় কি! তামাশা করছে, না--মাথা খারাপ! বেটা খেলিয়ে হাজতে তুলতে চায়!"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন,—"তুমি বুঝি স্বাস্থ্যের জন্যে এসেছ? এটা খুব স্বাস্থ্যকর স্থান,—বসে থাকলে শরীর সোধরায় না—কিছু করাই ভালো। না চলে আমাকে বোলো,—মাস তিনেক পরে আশি পাবে।"

প্রহসন যে বেড়েই চলে! আবার বিলিতি যাদব জুটলো নাকি! সামঞ্জস্য বজায় রেখে কথা কওয়াই ভালো,—"আমার নির্ব্বাচন (choice) নেই, এখানে আপনি মালিক,—আমি নির্ভর করলুম।"

শুনে ভারী খুসি হলেন। ঘরে ঢুকে বাহাল-পত্র লিখে এনে—হাতে দিয়ে বললেন,—আজ থেকেই তুমি বাহাল হলে,—ঐ আপিস্ দেখা যাচ্ছে, কাল সাড়ে দশটায় এসো। দেখো—কারুর কথায় মত পরিবর্ত্তন করো না।"

সাহেব বাংলোয় ঢুকে পড়লেন। আমি হতভম্ব মেরে গেলুম। চাপরাসী বললে—"চলিয়ে পৌছা দে।"

"ওঃ, এইবার ঠিকানায় নিয়ে যাবে! তা তো পৌছা দেবেই। চলো বাবা!"

রাস্তায় সাহেবের অনেক গুণগান করলে। শুনলুম—দরকার হলে সব আপিসের চাপরাসীই সরায়ে আর কালী-বাড়ীতে নতুন বাঙ্গালী ধরতে যায়। সাহেবেরা বাঙ্গালীই

চায়। আপনাদের মত ওস্তাদ কেরাণী কোথায় মিলবে—দুনিয়ায় নেই!" ইত্যাদি।

কালীবাড়ীর রাস্তায় পড়ে তার কথায় বিশ্বাস এল;—দুর্গা বললুম। উঃ—পাপ কি পাজি জিনিস!

চাপরাসীকে দুটি টাকা দিয়ে বিদায় দিলুম।

এখন ভাবি—হায়রে সেকাল! তখন ধরে নে'গে চাকরি দিত! বড় এ, বি, লিখতে পারলেই তিরিশ,—আধ-ইঞ্চি ছোট হরপ্ বেরুলেই পঞ্চাশ,—সে পঞ্চাশ এখন কার দু'শোর ওঁপর!

* *

*

যাক্—হৃদেন্দ্র বাবুর টাকা পরিশোধের উপায় হ'ল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

বাসা বাঁধলুম, ঠাকুর চাকর রাখলুম। কিন্তু মাসে আশি টাকা পেয়েও-ছ'মাসে আশি টাকা জমে না!

বাসা ক্রমে বারিক্ (Barrack) দাঁড়িয়ে গেল!

জটিল ব্রহ্মচারী জটলা চালান দিয়ে, বাসাটিকে কালী-বাড়ীর (Guest house) অতিথ-শালা বানিয়ে দিলেন। না বলতে পারি না,—বিদেশ, বাঙ্গালী এলে যায় কোথায়!

সাধু ঠেল্ মারলে,—পরিব্রাজকে পাশ ফিরতে দেয় না। পয়সাও বাঁচে না—শান্তিও পাই না। অতিষ্ঠ করে ফেললে। বাসার নাম বেরিয়ে গেল—হরেন্দ্র-মঠ্।

দিন যায়,—উপায় পাই না। একশো টাকা হ'ল,—হাল্ বদলালো না। মহাপুরুষেরাই কর্ত্তা। কর্ম্মের মধ্যে আজগুবি গল্প, ক্রিয়ার মধ্যে মালপো মারা! এই কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া মিলে বাসাটি ব্যাকরণ বানিয়ে দিলে,—একদম নিরস। যিনি আসেন—থেকেই যান, আবার বাড়েনও—যেন টেক্সো!

হৃদেন্দ্র বাবুর কাছে রোজই ক্ষমা চাই।

আবার একটি সাধু এলেন। ভাবলুম বলি—"এখানে আর স্থান হবে না।" কিন্তু তাঁকে দেখে আর বলতে পারলুম না,—অতি শান্ত সরল মূর্ত্তি, প্রসন্ন ভাব। তিন দিন মাত্র রইলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—"একি করছেন! সত্বর পরিবার এনে ফেলুন, না হয় চাকুরি ছেড়ে চলে যান।"

এত দিন পরে সাধুর পায়ের ধূলো নিলুম।

ভাবলুম—"ঠিকই তো, করছি কি! কিন্তু মুড়কির মেজাজ্ মচ্কাবে না—সে আসবে না।

* *

*

নির্ব্বন্ধ (অবশ্য—প্রজাপতির ত' নয়ই। ভীমরুলের হয় কি না জানিনা) ঘোচাবে কে! শেষ পাটনা থেকে এক পঞ্চদশী পাঞ্জাবে আনলুম। একদম—বেদান্ত-সার!

চারশো টাকা পণে একাজ করি, এবং টাকাটা সেখান থেকেই হৃদেন্দ্র বাবুকে পাঠিয়ে দি। ওই দুই কারণেই উদ্বাহ,—সুতরাং বরাবরই দুর্ব্বহ!

সাধুরোধ আর ঋণশোধটা হ'ল বটে!

সাধুর স্রোতটা আবার কালীবাড়ীর মুখো হওয়ায় জটিল ব্রহ্মচারী বিরক্ত হয়ে বললেন—"ব্রহ্মচৌর্য্যটা বজায় রাখতে পারলে না,—ভালো হ'ত। মিছে তবে উত্তরা-খণ্ডে মরতে এলে কেন! দেখ—এরা কেমন কাজ গোচাচ্ছে।" ইত্যাদি

বললুম—"তেমন ভাগ্য নয়,—শৌর্য্যের অভাব।

আশুবাবুর ওপর তখন থেকেই আমার শ্রদ্ধা,—উনি কাজ না গুছিয়ে সংসার পাতেন নি। এখন—নির্ভয়, মুক্ত পুরুষ,—সেরেফ্ লীলা আস্বাদ করছেন! ওঁর কাছে কিছু শুনলে পরকালের কাজ হ'ত বিজন বাবু!

আশুবাবু কঠিন কটাক্ষে চেয়ে বললেন—"মনের ময়লা—"

—"ঠিক্ বলেছেন,—গেলো আর কই! সাধুসঙ্গ সইলো না যে।"

"আর তো সব জানাই আছে,—আমি উঠি"—এই বলে আশুবাবু উঠে দাঁড়ালেন, তার বেশি নড়লেন না।

—"হ্যাঁ, আমারো হয়েছে। বিজন বাবু অনেক পরে এসেছেন—আমাদের বকের-বেশেই,(I mean) মুক্তিতে, অর্থাৎ সাদা পোষাকেই পেয়েছেন।"

আশুবাবু রাগ মেরে mild করে বললেন—"কি পাগলের মত বকছেন? আপনার কথার ধরনই ওই—সেটা সবাই জানেন তাই—"

—"তা না তো বলব কেনো ত্রাদার!"

"চলুন পৌঁছে দিয়ে যাই। বউ ঠাকরুণকে বলব' খন,—হঠাৎ মাথা ঘুরে তু'ঘণ্টা অজ্ঞান হয়েছিলেন। ডাক্তার বলে দিলেন,—"খুব সাবধানে রাখা চাই। গোলমাল কি উত্তেজনা সইবে না,—বিপদের সম্ভাবনা আছে। যতটা সহ্য হয়—দুধ ঘি যেন দেওয়া হয়।—তা' হলেই সব মেঘ কেটে যাবে,—কেমন?"

শুনে হরেন বাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"ইস্,—এ-রস আশুবাবুর মধ্যে এতদিন নিঃশব্দে মাটি হচ্ছিল! কিন্তু—সে বড় কঠিন ঠাঁই, ওতে ফল হবেনা আশুবাবু। শুধু সম্ভাবনায় তাঁর মন উঠবেনা!"

আমি চুপ করেই শুনছিলুম, বললুম—"সে-কি কথা!"

হরেন বাবু বললেন—"আশ্চর্য্য হবেন না বিজন বাবু! পাটনেয়ে পার্টনার্—নাম দুলালী,—একদম্ সেয়্-আলির সহোদরা! বড় কড়া-পাক! প্রণয়টাও বরাবরই প্রলয়ের কাছাকাছি কিনা, তাই শব-সাধনার সূত্র ধরেই গুজারা চলছিল। একবার বাড়াবাড়ির মুখে তাড়াতাড়ি জীবন-বীমা,—অর্থাৎ (Life insecure) করে টাল্ সামলাই। সোলেনামার সর্ত্ত অবশ্য—"মোলেনামা" অর্থাৎ—আমি মলেই, পাঁচ হাজার তাঁর। তাই বলছিলুম—শুধু সম্ভাবনায় মন উঠবে না!

—"আচ্ছা আমরাই উঠি!"

হরেন বাবু একমুখ হাসি নিয়ে উঠে পড়লেন।

তখন আমি কি যে বলেছিলুম—মনে নেই।

জুতো পায়ে দিতে দিতে হরেন বাবু বললেন—"আপনাদের তো জানাশোনা অনেক,—মানুষের 'মা' বলে' আরম্ভ,—শেষও 'মা' বলে'—না? কেনো বলুন তো? না—আর কিছু?

চলে গেলেন,—মুখে সেই হাসি!

(ওভার্)

রূপান্তর

শ্রী প্রবোধকুমার সান্যাল

পথের জীবন আমার ভাল লাগে না—

নিষ্কর্মার ভাল লাগার কোনো অর্থ আছে কি?

নিজের মনেই দীর্ঘ নির্জ্জনতায় বিধাতা যে বিষের চারাটি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উচ্ছেদ এ ছন্ন-ছাড়া জীবনে বুঝি আর হইয়া উঠিল না!

তাই ভাবি।—ভাবি জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্যের নীল সিন্ধু আমার কবে কার অভিশাপে শুকাইয়া গেছে! শুষ্ক দীর্ণ তৃষাতুর বালুচর মরণের একটি মহা উদাসীন রিক্ত গাম্ভীর্য্য লইয়া অবিরাম সম্মুখে খাঁ খাঁ করে। পাখী সেখানে ডাকে না—ভোরের আকাশে রক্তাম্বরের কাঁপন সেখানে নাই, মাটির কানায় কানায় সৃষ্টির বেদনা সেখানে নিস্পন্দ হইয়া গেছে—সন্ধ্যার সমারোহ সেখানে বিবর্ণ!

আমি আছি—এ পরিচয়ের দাগটুকুও কে যেন জলে ধুইয়া দিয়াছে।

তবু আমি আছি—।

অথচ এই অস্তিত্বহীন আত্ম-পরিচয়ের ব্যথার কথা যখন ভাবি—নিজের মনে তখন হাসি চাপিতে পারি না! আমি আছি—ওই যেমন উৎসবের শেষে বেহালাটির শেষ

রাগিণীর রেশ বাতাসে মিশিয়া থাকে, ভাঙ্গা পাত্রটি আনন্দের গন্ধটুকু লইয়া এক কোণে গড়াগড়ি যায়,—অমনি আমি আছি। গাছের কঙ্কালটিতে পাখীর ভাঙ্গা বাসাটির মত, ধূলি-ধূসরিত পথের কিনারায় মাটির ঢেলার মত, শীতের অবসানে বায়ু-তাড়িত শুষ্ক পত্রের মত!

কিন্তু আমি আছি।

দাদার হোটেলে থাকি—খাই। দূর সম্পর্কের দাদা।

দাদা বলে, "এমন করে আর চলে না ভাই। জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েছে এইবার যা'হক একটা নিজের হিল্লে করে নে। হোটেলে আমার এখন লোকসান চলেছে।"

দাদার বউ কেবল তপিলের মুখ বাঁধেন।

দাদা আবার বলে, "আমাদের কোপ্নি পরতেও লজ্জা নেই, মজুরি করতেও বাধে না—"

"তাই ত!"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে আমি খাইতে বসি।

মুখ ভার করিয়া বৌদি বলে, "রেধে যোগাতে আর পারিনে বাপু—ঝি চাকরাণীর কাজ!"

আমি বলি, "তোমরা ত তাই!"

বৌদি গরগর করিতে করিতে বলে, "তোমার ও সব দেঁতো হাসি আমার ভাল লাগে না। বে থা করে নিজের সংসার বুঝে নাও গে—"

দাদা বলে, "মানুষ হবার চেষ্টা কর!"

মানুষ আমি নই—।

মানুষের অর্থও আমি কোনোদিন বুঝিবার চেষ্টা করি নাই।

ফুল না ফুটিতে মুকুলেই যার গন্ধ নিঃশেষ হইয়া গেছে—ফুটিবার প্রয়োজন তার কোন্খানে?

কিন্তু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা জাগে—গন্ধ তাহার ছিল কি?

মানুষ হইবার আকাঙ্খা আমার নাই। জীবনের সমস্ত রসটুকু ঢালিয়া দিয়াছি আমারই সেই বিষবৃক্ষের গোড়ায়। তার বিষাক্ত কুসুমে আমার যৌবনের মালাটি গাঁথা!

তারই কীটের দংশনে আমার জীবন-দেবতা অহরহ কাঁদে—।

ছিন্নকণ্ঠ কপোতের মত!

···রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ি। ঘরে থাকিতে পারি না। সেঁতসেঁতে নির্জ্জন ঘরটির আব্ছা অন্ধকার, আশপাশের নালা-নর্দ্দমার দুর্গন্ধ,—তাদের সমস্ত কলুষ লইয়া আমায় যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। মাটির তলা হইতে দূষিত বাষ্প উঠিয়া আমার মগজকে উন্মত্ত করিয়া তোলে। মনে হয় ভগবান এখানে ভূত হয়, মানুষ এখানে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য হারাইয়া শয়তানে পরিণত হয়।

বাহিরে গিয়া দেখি, বিকারগ্রস্ত ধরিত্রীর প্রলাপ নিরন্তর আপনাকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ক্ষুৎপিপাসাতুর মানুষগুলি অবসাদখিন্ন জীর্ণ দেহ কয়টিকে লইয়া নিস্ফল কাতরতায় গড়াইয়া চলিয়াছে। জীবনে যেন তাহাদের কি বলিবার ছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না, ভাষায় কুলাইল না, ভাব তাহাদের ফুটিবার অবকাশ পাইল না। নীরব বেদনার বিষদুষ্ট বাষ্পে তাহারা দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতেছে।

ভাবিতে ভাবিতে পথ পার হইয়া যাই।

যন্ত্রজগতের বীভৎস আর্ত্তনাদ কানে আসে। মনে হয়, এও যেন পৃথিবীর একটি মহামরণের রূপান্তর! যন্ত্রের নিষ্পেষণে সারা পৃথিবী আজ প্রাণ দিতেছে। বিশ্বজোড়া এই মৃত্যু-লীলা দেখিতে দেখিতে চোখে যেন ধাঁধা লাগে!

মিথ্যা জড়তার পায়ে মানুষের এই আত্ম-বলিদান—ইহার কি শেষ নাই?

আবার পথ চলি। পিপাসায় যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসে।

জীবন আমার এম্নিই। এ ধরণীর হাসি খেলা কোনোদিন আমার চোখে পড়ে নাই। সৃষ্টির এই একান্তে বসিয়া যখন অসহায় পৃথিবীটির দিকে চাই—মনে হয় ইহার গলায় কে যেন ফাঁসী লাগাইয়া আকাশের এই শূন্যপথে ঝুলাইয়া দিয়াছে! এ পৃথিবী ত ঘোরে: [illegible] পৃথিবী আর্ত্তবেদনায় এই আলো-অন্ধকারে ছটফট করিয়া

মরে। তাহার কান্নাও কানে শুনিতে পাই না! তৃণে তৃণে, মাটির গোড়ায় গোড়ায় তাহার সে নিপীড়িত হৃদয়খানি ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে।

বন্ধু বলে, "তোর ও বাউলের বেশ ছাড়্।"

"ছেড়ে কি পরব?"

বন্ধু একটুখানি নীরব থাকিয়া বলে, "তা বলে ময়লা জামা-কাপড়গুলোয় সাবান লাগাতেও ত পারিস্?"

আবার হাসি আসে।—"মনের ময়লা ছাড়াবো কি করে?"

বন্ধু বলে; "জীবনটা অতখানি স্ত্রাকামি নয়—"

বলিয়া চলিয়া যায়। বেয়াকুবের মত তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকি।

হঠাৎ পথের মাঝে সেই ছেলেবেলাকার আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা—। উকীল-পাড়ার মোড়ে।

বন্ধুটি আমার সম্প্রতি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে। কাহার কাছে খবর শুনিয়াছিলাম—পসার তাহার জমিতেছে ভাল!

একটা বড় আফিস-বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া বন্ধু মোটরে উঠিতেছিল।

"কিরে?—তুই এখানে?"

বড়লোক বন্ধু যে এমন হঠাৎ চিনিতে পারিবে তাহা ভাবি নাই!

বলিলাম—"এম্‌নি! তারপর—খবর সব ভালো?"

"হুঁ, ভালো, কিন্তু তুই এমন ভাবে—এ কি চেহারা হয়েছে তোর?—মাথার চুল কাটিস্ না কেন?"

"পয়সা জোটে না।"

বন্ধু চট্ করিয়া একটা ইংরেজি বলিয়া ফেলিল,—'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়!'

কিন্তু তাহার মোটরে উঠা আর হইল না। শুধু তাই নয়—আমার এই জীর্ণ মলিন পরিচ্ছদকে বোধ করি লজ্জা দিবার জন্যই একেবারে সরিয়া আসিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়া বলিল, "চল্—একটু ঘুরে আসি।"

আলোকপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকের এমন নির্লজ্জ বন্ধু-প্রণয় দেখিয়া আমি বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে চিন্তিত হইলাম।

চলিতে চলিতে বন্ধু বলিল, "এদিকে এসেছিলি কেন?"

"ওদিকে ত আর রস নেই!"

বন্ধু আমার হাতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া দেয়। বলে, "ধরা—"

তারপর নিজে আর একটা ধরাইয়া বলে, "বিয়ে করেচিস্?"

"না—করব ভাবচি।"

"খবরদার! অমন কাজ করিস্‌নি।"

আবার বলে, "তারপর? বাড়ীর খবর কি? মা বাবা—?"

বলি,—"ফেলে পালিয়েছে।"

বন্ধু হাসিতে হাসিতে বলে, "হেঁয়ালি ছাড়্।"—একটা ইংরেজি কথাও বলে।

"বলেছে রোজগার কর্ত্তে পারলে দেশে ফিরো—নৈলে নয়।"—আমি বলি।

কিন্তু বন্ধুর কাছে নিজের অবস্থার কথা বলিতে আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। অপমান বলিয়া নয়! জীবনের পথে অনেক বন্ধুইত জুটিয়াছিল, কিন্তু—

ব্যারিষ্টার হঠাৎ বলিল, "নিশ্বেস ফেল্‌লি যে?"

হাসিয়া ফেলিলাম,—'এমন নিশ্বেস ত দিনরাতই পড়ে।'

সিগারেটে একটা টান্ দিয়া বন্ধু বলিল, "ভাবছিলাম একটা কথা! একটা কাজ দিতে পারি—করবি?—ওকি রে—চলে যাস্ কেন?"

চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বেশ কঠিন কণ্ঠেই বলিলাম, "কাজ আমার না থাকলেও সময়ের দাম আছে।"

বন্ধু হাসিতে হাসিতে সরিয়া আসিয়া বলিল, "চির-

কালই তোর এক রকম গেল ? শোন্ বলি—রাগিস্ নে। কাজ একটা কিছু তোর চাই ত ?—না কি বলিস্ ?"

"কাজ চাই সে আমিও জানি—আর সে কথাটা আমি নিজেও ভাবতে পারি।"

বন্ধু আবার হাসিয়া আমার পিঠ চাপড়ায়। বলে, "তোর রাগ ভিন্ন আর কথা নেই! পাঁচ বছর বাদে দেখা হল—কোথায় একটু গল্পসল্প করব তা নয়—কেবল রেগে কাঁই!"

আমার নিশ্বাস তখনও সরল হয় নাই। চুপ করিয়া রহিলাম।

বন্ধু আবার বলে, "তা বলে সত্যিই এখন গল্প কর্ত্তে বসব না। আর একদিন সময় মত কথাবার্ত্তা কইব। কিন্তু তোকে দেখে আমার ভারি ভালো লাগছে যে অজিত ?"

"ধন্যবাদ! আচ্ছা আসি এইবার।"

বন্ধু হাত ধরিয়া ফেলিল, "আমিও যাবো দাঁড়া—" বলিয়া জলন্ত সিগারেটের শেষটুকু রাস্তায় ফেলিয়া জুতা দিয়া মাড়াইয়া চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে বলিল, "রাগিস্নে শোন্। চাকরি আর কোথাও নয়—আমারই কাছে। তোকে না দেখতে পেলে আজই খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতাম।"

"ভালই হত! অন্য কারু আহার জুটত!"

বন্ধু আমার মাথায় একটা ঠোনা দিল, তারপর আমার গলা বেড়িয়া তাহার ডান হাতটি চাপিয়া বলিল, "দুই বন্ধুতে এক জায়গায় থাকব—ভাল হবে না ?"

ইহার হাত হইতে পলাইতে পারিলে আমি তখন বাঁচি। বলিলাম, "দেখা যাবে!"

ব্যারিষ্টার তাড়াতাড়ি তাহার আফিসের ঠিকানাটি লিখিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিল। বলিল, "নিশ্চয় যাবি কিন্তু—নৈলে—"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে মোটরে উঠিয়া বসিল।

হাতের আস্ত সিগারেটটা ছুঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিলাম। আবার পথ চলি।

কিন্তু মনের অস্বস্তিটা সারাদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়া যাতনা দিতেছিল। তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

হঠাৎ হাতের সেই লেখা ঠিকানাটি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জঞ্জালে ফেলিয়া দিলাম। মনে হয় আমার এ অস্বস্তির কারণ ওই আশার ছিদ্রপথটি!

রৌদ্রতপ্ত পথের উপর দিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে থাকি। লোকে ভাবে কত কাজের লোক!

কিন্তু মানুষকে আমি দেখিতে শিখিয়াছি। তাহাদের এ অনাহুত সহানুভূতি বেকার মানুষের জীবনে যে কতখানি মর্ম্মান্তিক হইয়া দাঁড়ায় তাহা আমার চেয়ে এত আর কে বেশী বুঝিয়াছে ? দরিদ্রের জীবনকে আশার কুহকে মাতাইয়া কত লোককে ছিনিমিনি খেলিতে দেখিয়াছি। নিজের কথাই জানি। দরিদ্র এবং শিক্ষিত হইলে যে বিপদে পড়িতে হয় তাহা জানিতাম না। আশার মরীচিকায় ভুলিয়া দ্বার হইতে দ্বারান্তরে একটি চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিয়াছি। এম্‌নি বছরের পর বছর!

আজ ইহারই পুনরুক্তিতে সমস্ত মন আমার একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল, বন্ধু, সর্ব্বস্বহারা দারিদ্র্যের কান্না ত তুমি দেখ নাই। দরিদ্রকে আহার না দাও, সে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহার সে পিপাসাতুর হৃদয়টিতে অমন করিয়া আশার ছুরিটি আর বসাইও না।

কিন্তু আশায় যেমন আর ভুলি না, তেম্‌নি আশার মূলোচ্ছেদও ত করিতে পারি।

আজ তাহারই জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম।

ঘুরিতে ঘুরিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। কলকোলাহল-ময়ী সহরটি তখন জীবন-মরণ খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

কোথায় চলিয়াছি জানিনা।

কিন্তু সারাদিন ঘুরিয়া যেখানে আসিয়া পৌছিলাম—

সেটি আমারই বাড়ীর দরজায়। ভালই হইল! বন্ধুর ঠিকানাটি ত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি!

যাক্—বৃথা আশাকে নিজের অজ্ঞাতে আমি যে আমল দিই নাই—এজন্য বেশ গর্ব্ব বোধ করিলাম!

কিন্তু এ আত্ম-প্রবঞ্চনা আমার নিজেরই ভাল লাগিল না।

পরদিন আবার বাহির হইলাম।

আন্দাজে আন্দাজে ঠিকই গিয়াছি। একেবারে আফিস ঘরে গিয়া উপস্থিত।

বন্ধু তখন বাহিরে গেছে। কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিমল আছে—বিমল?"

"কে তু—আপনি?"

"আমি যেই হই।—আছে সে?"

লোকটি একবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বসুন ওইখানে। সায়েব একটু ব্যস্ত আছেন।"

চটিয়া উঠিলাম, "ব্যস্ত সকলেই। আমারও সময় ফেল্‌না নয়। তাকে একবার ডেকে দিন্ আমার কাছে—যান্।"

লোকটি বোধ করি ভড়কাইয়া গিয়াছিল। মুখখানা কালো করিয়া বাহিরে গেল।

একটু পরেই বিমল ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে কেরাণীটি।

"আরে কখন এলি? তোর কথাই ভাবছিলাম। বস্—বস্—দাঁড়িয়ে কেন?—ললিত ওঁকে এতক্ষণ বসতে বলনি?"

ললিত আড়ষ্ট হইয়া বলিল, "আজ্ঞে—কিন্তু—"

ললিতের হইয়া আমিই বলিলাম, "উনি বলেছিলেন—আমিই বসিনি।"

বিমল হাঁক দিল, "বেয়ারা?—দু'টো টিফিন্, চা, সিগারেট লাও—"

আফিসের লোকগুলি তাহার হাঁক ডাকে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কাজে লাগিয়া গেলাম। আমার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি বিমল হাসিতে হাসিতে সারিয়া লইতে লাগিল। আমার মত আপনার লোক তাহার যেন আর কেউ নাই। সে নিজেই বলে, "তুই খুব পয়া অজিত! দিন্ দিন্ আমার মক্কেল বাড়ছে।"

এতখানি আত্মীয়তা আমি হজম করিতে পারি না।

পয়সা আনিয়া দাদা ও বৌদির মুখ-থাবাড়ি দিলাম।

আফিসে কাজ আমার অল্পই। কাজের মধ্যে কেবল বিমলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি।

প্রায়ই তার বাড়ী যাই। বৌ-এর সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছে। নাম তার বাব্‌লি।

একান্ত অসঙ্কোচেই একদিন সে বলে, "এত ঘন ঘন যাতায়াত যে?"

হিসাব দেখিতে দেখিতে আমি মুখ তুলিয়া বলি, "ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি।"

বাব্‌লি মাথার আঁচল একটখানি টানিয়া দেয়, তারপর আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে, "অত ভাল নয়।"

তারপর দরজার আড়ালে গিয়া বলে, "চাকর-মনিব সম্পর্ক—এত কেন?"

আমি অবাক্ হইয়া যাই।

সে আবার বলে, "ওঠা-বসা হাসি-গল্প একসঙ্গে—এত আস্পর্দ্ধা কি জন্যে?"

"সেটা বিমলকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাওয়া যায়।"—আমি বলি।

কিন্তু নিজের কৈফিয়ৎ নিজের কাছেই বেয়াড়া শুনায়।

বাব্‌লি আরও রূঢ় স্বরে বলে, "আমার সঙ্গে কথা কইবার অধিকারই বা আপনাকে কে দিয়েছে? লজ্জা করে না আপনার?"

এ মিথ্যা তিরস্কারের কারণ আমি সহসা খুঁজিয়া পাই না। যেন দিশেহারা হইয়া যাই। সমস্ত কাজকর্ম্ম, মন পর্য্যন্ত একেবারে বিস্বাদ হইয়া ওঠে।

সে আবার বলে, "এমন ঘনিষ্ট হয়ে ওঠবার কোনো

দরকার নেই আপনার। অবস্থা অনুযায়ী মানুষের আচার ব্যবহার ঠিক রাখা উচিত—সোফার ওপর বসতে আপনাকে কে বলেছে ? যান্—টুলটা নিয়ে ওই দিকে বসুন গে—"

রাগে সে যেন ফুলিতে থাকে। আমি টের পাই।

তারপর ভুরু কুঁচকাইয়া সে যেন আগুনের ফুলকির মত একটুখানি হাসে। হাসিয়া বলে, "কাঙালকে ঘোড়া রোগ! নিশ্চয় কোনো মতলব আছে!"

আমি আর থাকিতে পারি না। বলিয়া বসি, "ওটা আপনার ভুল। আমি কাঙাল হতে পারি কিন্তু কোনো মতলব নিয়ে আসিনি।"

কিন্তু আর কোনো উত্তর আসে না। মুখ বাড়াইয়া দেখি বাব্‌লি তার আগেই চলিয়া গেছে।

নারী আমি অনেকগুলি দেখিয়াছি কিন্তু বাব্‌লিকে কোনোদিন চোখে পড়ে নাই।

চলার পথে তাই আজ একবার থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।

আলাপ করিবার প্রথম পরিচ্ছেদেই এমন অসঙ্কোচ অপমান আর কোনোদিন নির্ব্বিবাদে সহ্য করি নাই।

তবু মনে হয়—জীবনে আমার প্রথম প্রভাত সুরু হইয়া গেল।

কাঁটার বনে গোলাপ দেখিয়াছি। আজ মনে হয় বাব্‌লির দেওয়া সমস্ত লাঞ্ছনা আমার মনের ভিতরে একটা শ্রদ্ধার ফুল ফুটাইয়া দিল।

আমার প্রাপ্য লইবার দিন আসিয়াছে।

স্বীকার করিতে লজ্জা নাই—বাব্‌লিকে আমি নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছি।

কিন্তু ভুলিবার চেষ্টা করিতে থাকি।

অভিমানাতুর হৃদয়টি আমার লজ্জায় মাথা নত করিয়া থাকে।

ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখি—মরণাহত বেলাভূমে আমার সে নিপীড়িত পিপাসিত আত্মাটি আছাড়িয়া কাঁদে। মাথা সে তোলে না। বলে, দাও দাও, তৃষ্ণার জল দাও। জীবনের দীর্ঘ পথটি কেবলই মরুবেলার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আজ যদি তৃষ্ণা লাগে, জল কি দিবে না তুমি ?

প্রশ্ন জাগে!—মনে মনেই হাসি।

হাসি নিজেরই কথায়। জীবনে বেদনা আছে জানি, কিন্তু তৃষ্ণার খবর ত পাই নাই। দুঃখের পাত্রে বেদনার অশ্রুজল—সে সুধা আমিই পান করিয়াছি, কিন্তু আমার ক্ষ্যাপা আত্মা আজ প্রভুদ্রোহী হইয়া ওঠে কোন্ পিপাসায় ?

উচ্চ ভূমির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দেখি, অনন্ত ধরণীর শিয়রে মিশিয়াছে অনাদি আকাশ! রূপ আর অরূপের এই চুম্বনে তারাগুলি পর্য্যন্ত রোমাঞ্চ হইয়া ওঠে। অন্ধকার আজ আলোকের তৃষ্ণায় থর্‌থর্ করে।

নিজের নিশ্বাসে নিজেই চমকিয়া উঠি।

আবার বসন্ত আসে।

আমার সে তৃষ্ণার দেশে জরাশীর্ণ গাছে একটি পাতা গজায়।

ভাঙা বাসাটির উদ্দেশ্যে পাখীকে মুখে করিয়া কুটি লইয়া যাইতে দেখি।

তৃষাদগ্ধ মাঠে একটি তৃণ জাগিয়া ওঠে।

শীতার্ত্ত বিরহীর ললাট-রেখা মসৃণ হইয়া আসে।

নব-জীবনের সাড়া পাই।

কদিন কাজে যাই না। না যাওয়ার কারণ আমি নিজেই বুঝিতে পারি না।

কিন্তু বিমল সে দিন আমার সমস্ত সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে কাটাইয়া একেবারে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল।

নিজের দুর্ব্বলতার কথা ভাবিয়া একটুখানি হাসিলাম।

অনাহারে গিয়াছি সুতরাং বিমল তৎক্ষণাৎ ষোড়শ উপচারে উদ্যোগ করিয়া দিল।

দুই বন্ধুতে আহারে বসিয়াছি।

বাব্‌লি বলে, "অন্যায় যদি করে থাকি মাপ করুন। কিছু মনে করবেন না।"

তাহার কথাগুলি আমার মনের অতলে গিয়া কেমন মায়ার সৃষ্টি করে।

বিমল আমার হইয়া জবাব দেয়, "তোমার কথা মনে করবার সময় নেই আমাদের।"

বাব্‌লি আবার বলে, "আজ যে একেবারে ভোল্ বদ্‌লালেন। মাথাটি একেবারে কদম-ফুল, ধোপ্‌দস্ত্ জামা কাপড়, তারপর......বেশ! বেশ সুশ্রী হয়ে উঠেছেন কিন্তু!"

বিমল হাসিতে থাকে। আমি বলি, "আপনার আপত্তি আছে নাকি?"

বাস্তবিক এই স্ত্রীলোকটির সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিবার শক্তি আমার চলিয়া গেছে। প্রতি কথাটি ওজন করিয়া বলিতে হয়।

সে বলে, "আছেই ত! আফিসে যদি লোকে আতর মেখে আসে তাকে কি বলে লোকে?"

"এটা আফিসও নয় আর ও আতরও মাখেনি—।" বিমল বলে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাব্‌লি বলে, "উনি কিন্তু স্বাভাবিক রূপের ওপর একপোঁচ বুলিয়ে আসতেও ছাড়েন নি।"

এবার বলিবার সুযোগ পাই। উত্তেজনার মুখে বিমল যে পাশে আছে তাহা বিস্মৃত হই। বলি, "কিন্তু আপনি হয়ত খবর রাখেন না, গায়ে-মুখে একপোঁচ রং বুলোতে মেয়েরাই জানে—ওটা মেয়েদেরই আবিষ্কার!"

সাপ এবার উপযুক্ত শিকড়ের ঘায়ে কুণ্ডলী পাকায়। কিন্তু অবশিষ্ট বিষ তাহার যেটুকু ছিল তাহাই এবার উদ্গার করে, "মেয়েরা রং মেখে পুরুষদের ভুলোয়—এই ত? কিন্তু পুরুষেরা যখন নিজেকে সুন্দর করে তোলে, তার বুঝি মানে হয় না?"

"হয় স্থান বিশেষে!"—আমি বলি।

বাব্‌লি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে, "ঠিক ঠিক. স্থান বিশেষে! আর সুযোগ বিশেষেও অজিতবাবু।"

আবার হাসি। হাসিতে হাসিতে সে সরিয়া যায়।

বিমল আফিসের কথা পাড়ে।

একটু পরে বাব্‌লি আবার যখন ঘুরিয়া আসে, আমাদের আহার তখন শেষ হইয়া গেছে।

সে বলে, "আজও কি আপনার ক্ষিধে ছিল না?"

"না, কিন্তু আপনি হাতে করে দিয়েছেন দেখেই বসলুম।"

বিমল তখন বাহিরে গেছে। আজ তাহার সহিত চূড়ান্ত করিয়া কথা বলিতে আমার ইচ্ছা যায়।

বাব্‌লি বলে, "এত ভক্তি কেন?"

আমি বলি, "মন্দ কি?"

বাব্‌লি হাসে, "পিঠে কুলো বাঁধা নাকি?"

বলি, "হ্যাঁ, মার খেলে লাগে না!"

"আমার হাতের মার বলে?"—আবার সে হাসে।

আমি বলি, "হয়ত তাই।"

"ক'দিন আসা হয়নি কেন?"

"রাগ হয়েছিল।"

"রাগ ভাঙালো কে?"

আমি হাসি।

"অত হাসি ভাল নয়। হাস্‌লে বুঝি ভালো দেখায়?"

বলিয়া নিজেই সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দূরে সরিয়া যায়।

শত বসন্তের উচ্ছ্বাসে বাড়ীটা যেন দোল খাইতে থাকে।

বাব্‌লি আবার ঘুরিয়া আসে।

"দাঁড়িয়ে কেন?"

হাসিয়া তাহার কাছে সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন

বলি, "এম্‌নি—।"

তাহার মুখে আর হাসি নাই। বলে, "অন্দর মহলে দাঁড়াতে লজ্জা হয় না?"

—"অন্দর ভেতর চিন্‌তে পারিনি।"

সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, "আপনাকে কি অপমান কর্ত্তে ডাকা হয়েছে? আপনার নির্লজ্জতার সীমা দেখতে পান না কি? যান্—বেরিয়ে যান্। মেয়ে ছেলেকে সম্মান কর্ত্তে শিখে আসুন গে—"

কি বলিব ভাবিয়া পাই না। বলি, "সব-মেয়ের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে কি?"

রাগে বাব্‌লি যেন একেবারে লাফাইয়া ওঠে, "যত আছে আপনারই! কিন্তু ফেনিয়ে ঘুরিয়ে আপনার মন যা চায় তার খোরাক এখানে নেই অজিত বাবু। যা ভেবেছেন আপনি তা নয়। ভদ্র ঘরে আপনার যাতায়াত ছিল না তাই হয়ত একটা অদ্ভুত কিছু ধারণা নিয়ে আপনি অন্দর মহলে যাতায়াত সুরু করেছেন—কিন্তু দারোয়ান আমার ঘুমিয়ে নেই—আপনার চুরি সে ধরে ফেলবেই। যান, এক্ষুনি আপনি বেরিয়ে যান্—এ বাড়ীতে ভবিষ্যতে পা দিলে হয়ত—"

আর সে বলিতে পারে না। বিমলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া ঢোকে।

বিমল আসিয়া বলে, "কি রে—তুই এখানে?"

আমি রাগে বলিয়া ফেলি, "হ্যাঁ এখানে! কি হয়েছে তার? আমি ত' চোর নই।"

ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকি। বিমল খানিকক্ষণ হত-চকিত হইয়া থাকে, তারপর তাড়াতাড়ি আমায় একেবারে তাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলে, "বাব্‌লি, জল নিয়ে এস শিগ্‌গির—পাগল আমাদের আবার ক্ষেপেছে।"

চলিতে চলিতে শুনি বাব্‌লি ও-ঘর হইতে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলে, "যাচ্ছি যাও—বরফ আনতে পাঠিয়েছি।"

জীবনের সমস্ত কলরব ধীরে ধীরে থামিয়া আসে।

আকাশ আমার বর্ণহীন! কিন্তু আজ দেখি তাহার গায়ে নীলের ছাপ লাগিয়া গেছে। তাহার বার্ত্তা আমার নিদ্রিত কুঁড়িটিকে জাগাইতে চায়—সমস্ত হৃদয় আমার মক্ষিকার গুঞ্জরণে মাতিয়া ওঠে।

মনে হয় ব্যথা যে কেবল ব্যথাই নয়, তাহার প্রকাশ যে অনাবিল আনন্দে, একথা অস্বীকার করিবার শক্তি কি কারো আছে?

মানব হৃদয়ের দুইটি কূল ছাপাইয়া যখন বেদনার স্রোত বহিয়া যায়, পায়ে পায়ে আপনার বাঁধন ভাঙ্গিয়া চলে তখন দুঃখের অনুভূতি ত থাকে না! সমস্ত ব্যথিত চিত্ত যে তখন আনন্দের অনুপম বেদনায় দোল খাইতে থাকে।

আমি ত জানি—বাব্‌লির আঘাত আমার কাছে কতখানি মূল্যবান!

তাই ত বলি কাঁটার বনে যেমন গোলাপ। আঘাতের সমস্ত জ্বালাটুকু আপনার সৌরভের স্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়।

যে অদৃশ্য মায়াশিল্পী আমার অন্ধকার গুহায় ঘুমাইয়াছিল আজ সে তার সুন্দরের ইন্দ্রজাল দিকে দিকে প্রসারিত করিতে চায়।

আমার ভগবান অন্তরের অতল তল হইতে কাঁদিয়া ওঠে। তাহার সমস্ত আহারটুকু আমি যে আমার জীবনে বিষদুষ্ট করিয়া দিয়াছি তাহার জন্য সে অভিযোগ করে।

আমার ব্যথার বালুচরে তাহার কান্নার স্রোত বহিয়া যায়।

যে মরিয়া গেছে তাহার কথা ভুলিয়াই ছিলাম। কিন্তু আজ তাহার জাগরণের সাড়া পাইয়া অবাক হইয়া তাকাই।

কিন্তু তাকাইতে পারি না। তাহার সে করুণ চির-বিরহীর মূর্ত্তি আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে চায়। সমস্ত ব্যথিত চিত্ত আমার কান্নার মাধুর্য্যে ভরিয়া ওঠে

আমি আর থাকিতে পারি না।

আমার চিরদিনকার নিপীড়িত অন্তরাত্মা একদিকে যেমন বেদনার আবেগে কাঁদিতে থাকে, তেম্‌নি বাহিরের আনন্দকেও আর কোনও বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারি না।

মন আমার শ্রদ্ধায় আনন্দে মাধুর্য্যে প্রেমে কাঁপিতে থাকে।

বিমল বলে, "আফিসে আজ আর তোমার কাজ নেই —আমার ঘরে গিয়ে হিসেবটা করে ফেলগে।"

দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া যাই।

বিমল বলে, "গাড়ী ভাড়া নিয়ে যারে—হেঁটে যাস্‌নে—"

কিন্তু আমি তখন রাস্তায়!

বিমল ত জানে না—তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে রাস্তায় হাঁটিয়া চলায় কত সুখ! একমনে পায়ে পায়ে চলিয়া যাহারা পথের জীবন কাটায়—আমি ত জানি, জীবনকে দেখিবার সুযোগ তাহাদের কতখানি মিলে!

বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি, দুই তিন জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত তাঁহাদেরই একপাশে গিয়া তাকের উপর হইতে দু' একখানা খাতা বাহির করি।

"কে হে তুমি?"

"এঁদের এখানে কাজ করি আমি।"

"ও—কি কাজ?"

"এই—লেখাপড়াব হিসেব পত্তর এই সব।"

আবার গল্প চলে।

"আমায় তামাক একছিলিম খাওয়াতে পারো হে—তামাক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ পারি বৈ কি—"

বাহির হইয়া যাই। দু'মিনিটের মধ্যেই ট্যাঁকের পয়সায় তামাক আনিয়া সাজিতে বসি। কিন্তু ফিরিয়া দেখি তামাক খাইবার সমস্ত সরঞ্জামই একপাশে মজুত। একটি বৃদ্ধ বোধ করি তাহা লক্ষ্য করে।

"দেখতে পাওনি বুঝি আগে?"

আমি হাসি।

তামাক সেবনান্তে বৃদ্ধ কয়টি উঠিয়া গেলে আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। সব গেছে, কিন্তু মানবধর্ম্ম যায় নাই। সুতরাং কী মূর্ত্তিতে বাব্‌লি যে এখনি উল্কার মত আসিয়া আমার এই আবহাওয়াটি চুরমার করিয়া দিবে তাহা ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠি।

কিন্তু জানলার বাহিরে তাকাইয়া দেখি, দীপ্ত মধ্যাহ্নের এতটুকু নীলাকাশ যেন কেবল একটি চোখের দৃষ্টি লইয়া হাসিতে থাকে, নিমগাছের ডালে বসিয়া কাক ডাকে, হাওয়া লাগিয়া মাথার চুল উড়ায়।

কতক্ষণ বসিয়া থাকি কেহ আসে না। সমস্ত হাতের কাজ পড়িয়া থাকে।

বসিয়া বসিয়া চোখে জল আসে।

বেয়ারাকে ডাকিয়া বলি, "বড় খাতাখানা কোথায় রে?"

খাতার খোঁজ বেয়ারা কোনোদিন রাখে না। বোকার মত সে বলে, "হাঁ বাবু ওপরে।"

"তোর বৌমা কোথায়?"

"ওপরে—"

"একলা ঘরে বসে আছেন বুঝি?"

"হাঁ—"

খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলি, "একটু দরকার ছিল আমার, যাক্‌গে—কিন্তু—"

"খবর দেবো?"

"ন্‌-নাঃ। তুই যা।"

বেয়ারা চলিয়া যায়। আমি বাহির হইয়া আসি।

রাস্তায় পা দিতেই শব্দ হয়, "চললেন্?"

চম্‌কিয়া উঠি। এ কণ্ঠস্বর ত অপরিচিত নয়! উপরের জাম্‌লায় বাব্‌লি দাঁড়াইয়া।

"কাজ হয়ে গেল বুঝি?—দাঁড়াবেন একটু?"

হাঁটু দুইটি আমার থর্ থর্ করিয়া কাঁপে।

এক মিনিটের মধ্যেই বাব্‌লি উপর হইতে নামিয়া আসে। ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলে, "মাপ করবেন আমায় অজিতবাবু?"

চোখে তাহার জল!

দৃষ্টি আমার মিথ্যা নয়। সত্যই বাব্‌লির চোখে জল!

তাহার এ চোখের জল আমার কাছে এমন পবিত্র বোধ হয় যে আর সেখানে দাঁড়াইতে ইচ্ছা হয় না।

"শুনুন—শুনে যান—"

কিন্তু শোনা আমার হয় না, আমি চলিয়া যাই।

মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াই। পৃথিবী আমার চোখে সুন্দর লাগে।

অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি, সৃষ্টির কপোলে বিধাতার এক একটি চুম্বন আলোকের মূর্তি লইয়া ঝক্‌ঝক্ করে।

জীবনে আমি ভাল বাসিতে পাইয়াছি। নারী আমায় পথ দেখাইয়া আলোকের রাজ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে।

ধরণীর বন্ধনরজ্জু ফুলের মাল্য হইয়া আমার চোখে দোলে।

মনে হয় আমিই ত কবি—নিজেকে এতদিন ত আমি চিনিতে পারি নাই। আজ আমার ভিতর হইতে এক চিরবিরহীর মহাকাব্য উদ্বেলিত সমুদ্রের মত কূল-কিনারা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আমি সুন্দর! সুন্দরের পূজা করিতে চিরদিনই পুরুষ নারীর প্রেমের মন্দিরে প্রবেশের পথ করিয়া লয়।

বাব্‌লিকে আমি ভালবাসি। তাহার ঐ চোখের জলের মূল্য ও মর্য্যাদা আমি বুঝি। কিন্তু তাহার তিরস্কারকেও ত নিন্দা করিতে পারি না!

আনন্দের আবেগে পথ চলি। পথের যে মানুষগুলি আত্মপ্রকাশ করিতে না পাইয়া মৌন বেদনায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলে, তাহাদের মুখে ভাষা দিতে ইচ্ছা যায়। আমার অন্তর কোণে নবনির্ম্মিত মন্দিরে তাহাদের লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

ঘরে থাকি না—থাকিতে পারি না। আমার সমস্ত মলিনতার ভিতর হইতে যে মানব-দেবতা জাগিয়াছে—তাহাকে লইয়া পৃথিবীর উৎসব-সভায় বিচরণ করিয়া ফিরি।

বিমল আমায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রান হইয়া গেছে।

সেদিন তার একটি চিঠি পাইলাম। ফেনাইয়া ফেনাইয়া আমার না যাওয়ার কারণ জানিতে চাহিয়াছে। তারপর নানা অনুরোধ,—দোষ করিয়া থাকিলে যেন মাপ করি—এই সব!

শেষে একটুখানি রসিকতার লোভ ছাড়িতে পারে নাই। লিখিয়াছে, "বাব্‌লি বোধ হয় তোমার প্রেমে পড়িয়াছে। কাল সারা রাত তাহার কান্নার জ্বালায় আমি অস্থির! তোমার নাম করিয়া বলে, 'অজিতবাবু বড় দুঃখী—তাঁর কথা মনে হলে আমার কান্না পায়'—এম্‌নি সব কত কথা। চিঠি পাবামাত্র তুমি তার কান্না থামাইতে আসিবে—"

হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি উত্তর লিখিলাম,—

"বন্ধু, আমার চেয়ে সুখী জগতে আপাততঃ কেউ নেই। আমি জীবনের সন্ধান পেয়েছি। তোমার কাজ থেকে আমার অব্যাহতি দাও।"

সুদূর-বিধুর কবি

শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত

সুদূর-বিধুর কবি !—
আকাশে অলস আঁখি দুটি তুলি' হেরিছ কিসের ছবি !
আন্‌মনা কেন চেয়ে থাক তুমি হিঙুল-মেঘের পানে !
মৌন নীলিমার ঈসারায় কোন্ কামনা জাগিছে প্রাণে !
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন্ কাজরীর গানে !
দাদুরী-কাঁদানো শাঙন-দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি' !

স্বপন-সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে তুমি রেখেছ দিওয়ানা করে' !
জনম ভরিয়া সে কোন্ হেঁয়ালি হলো না তোমার সাধা,—
পায় পায় নাচে জিঞ্জির হায়,—পথে পথে ধায় ধাঁধা !
—নিমেষে পাসরি' এই বসুধার নিয়তিমানার বাধা
সারাটি জীবন খেয়ালের খোশে পেয়ালা রাখিলে ভরে' !

ভুঁয়ের চাঁপাটি চুমি'
শিশুর মতন,—শিরীষের বুকে নীরবে পড়িছ ঘুমি' !
ঝাউয়ের কাননে মিঠা মাঠে মাঠে মটর-ক্ষেতের শেষে
তোতার মতন চকিতে কখন তুমি যে আসিছ ভেসে' !
—ভাটিয়াল সুর সাঁঝের আঁধারে দরিয়ার পারে মেশে,—
বালুর ফরাশে ঢালু নদীটির জলে ধোঁয়া ওঠে ধুমি' !

বিজন তারার সাঁঝে
তোমার প্রিয়ের গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে !
পড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখীর নষ্ট নীড় !
হেথায় বেদনা মা-হারা শিশুর, শুধু বিধবার ভিড় !
কোন্ যেন এক সুদূর আকাশ, গোধূলিলোকের তীর
কাজের বেলায় ডাকিছে তোমারে, ডাকে অকাজের মাঝে !

মাটির রাজা

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

চতুর্দ্দশী—।

অন্ধকার যেন নিঃশব্দচরণে হামাগুড়ি দিয়া বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে...

ঘরের ভিতর আলো লইতে আসিয়া শান্তি বলিল, "সেদিনের মত আর-একটা বৌদি, সেই তেমনি—।"

কেরোসিন-কাঠের সরু একটি ফালি আনিয়া শান্তি তাহার বৌদির কাছে নামাইয়া দিল।

টুনু বলিল, "কিসে লিখি? আল্‌কাতরা?"

"বা—। জানো না বুঝি?"

আলকাতরার ছোট টিনটি যে বড় ঘরের সিঁড়ির নীচে চোর-কুঠরির একপাশে নামানো থাকে সে কথা কে না জানে!

ভানু বলিল, "আমি জানি।"

সে তখন লালরঙের একটি 'দোলাই' গায়ে দিয়া জলন্ত উনানের কাছে বসিয়া মায়ের রান্না দেখিতেছিল।

টুনু হাসিয়া বলিল, "কই আন্ দেখি,—দেখি কেমন বাহাদুর।"

ভানু উঠিতে যাইতেছিল।

কিন্তু টিনটি তখন দুই হাতে ধরিয়া শান্তি এ ঘরে লইয়া আসিয়াছে।

শরের একটা মোটা কাঠি দিয়া বড় বড় অক্ষরে সেই কাঠের উপর টুনু লিখিল, 'পথ-ভোলার কবর'।—"হয়েছে এবার?"

শান্তি হাসিতে হাসিতে কাঠটি লইয়া গিয়া কান্তিকে বলিল, "আমি পুঁতব।"

ভুলোকে তখন মাটির নীচে শোয়াইয়া তাহার উপর মাটি চাপা দেওয়া হইয়াছে।

লোহার কোদালটা হাতে লইয়া অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কান্তি তখন হাঁপাইতেছিল।

বলিল, "দে, আলোটা নামা এইখানে।"

আলোটা নামাইয়া শান্তি বলিল, "এটা কিন্তু আমি পুঁতব মেজদা!"

কান্তি বলে, "না, না, তুই পারবি না—দে আমায় দে।"

শান্তি বলে, "না, আমি—"

এই লইয়া দু'জনে ঝগড়া।

শান্তি শেষে হার মানিয়া দূরে দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিল।

বলিল, "শেয়ালে যদি তুলে না নিয়ে যায় ত আমি কী···পুরনো-পুকুরের সেই দাঁতভাঙা বড়ো শেয়ালটা। দেখে নিস্ তবে।"

কিন্তু কোন্ শেয়ালটা কে জানে—

·· সকালে দেখা গেল, ভুলোর কবর খুঁড়িয়া শেয়াল-গুলা সত্য সত্যই তাহার মৃতদেহটা বাহির করিয়াছে, এবং টানিতে টানিতে সরষে-ক্ষেতের পাশে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। রাত্রি তখন বোধকরি বেশি ছিল না, সবটা তাহারা খাইতে পারে নাই, মুখ হইতে গলা-অবধি মাংসটা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাড় বাহির করিয়াছে, আর পিছনের দুইটা পায়ের কঙ্কাল···

বিশ্রী পচা গন্ধ উঠিতেছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা ভার।

শান্তি তবু নাকে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।—"কেমন? বলেছিলাম কি না!"

তাহার পর কান্তি নিজেই কুকুরটার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে আলু-পেঁয়াজের ক্ষেতগুলো পার করিয়া একটুখানি দূরে সরাইয়া দিয়া আসিল।

বীরভূমের উন্মুক্ত পরিষ্কার প্রান্তর, তাহার উপর মাঠের ধান সব কাটা হইয়া গেছে, শব-সন্ধানী শকুনের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইবার মত বাধা-বিপত্তি কোথাও কিছু নাই।

স্নান করিবার সময় দেখা গেল, তিনটা বড় বড় শকুনি আসিয়া নামিয়াছে—আরও দুইটা তখন জাম-গাছের মাথায়। কিন্তু এই পাঁচটি আগন্তুকের কাছে ভুলো আর কতটুকু!

তাও আবার গাঁয়ের কয়েকটা হ্যাংলাপানা ক্ষুধার্ত্ত কুকুর খালি ছুটিয়া ছুটিয়া আসে। পেটের জ্বালায় আসে বটে, কিন্তু অতদূর আগাইতে পারে না। বড় বড ডানার ঝাপটে ধূলা উড়াইয়া বিকট শব্দ করিয়া এক-একটা শকুনি তাহাদের তাড়া করে,—কুকুরগুলা দাঁত বাহির করিয়া ছুটিয়া পালায়। দূরে গিয়া নিজেদের মধ্যেই খাওয়া-খাওয়ি করে।

শকুনিগুলার আনন্দ তখন আর ধরে না! মাথা নাড়ে, আর গলার দুইদিকে ডোরাকাটা রঙিন্ গল-কম্বলের ঝোলা-চামড়া এদিক্-ওদিক্ দুলিতে থাকে…

ভুলোর নাড়িভুড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খায়।

কতক্ষণই বা লাগে!

প্রহরখানেকের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।

রক্তাক্ত কঙ্কালের কয়েকটা টুক্‌রা মাত্র শুকনো মাঠের উপর হট্‌হট্ করিতে লাগিল। মাথার খুলিটা টানিয়া টানিয়া কোথায় ফেলিয়াছিল কে জানে। পাঁজরা আর মেরুদণ্ড ছাড়া ভুলোর বলিতে আর কিছুই সেখানে অবশিষ্ট রহিল না।

মা পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "দেখলে বৌমা, ভুলোর কেমন গতি হলো? বুড়োবয়েসে পাপ করলে যে অনেক! বামুন-ঘরের কুকুর, মুচিঘরে হলো আস্তানা। কত অখাদ্যি খেলে, কত—"

দরজার চৌকাঠের কাছে কান্তি বসিয়া ছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বলিল, "খেলে! খেলে—আপনার পেটের জ্বালায় খেলে। তোমরা খেতে দিলে না তাই খেলে। যতদিন কাঁই কাঁই ঝাঁই ঝাঁই করলে—ততদিন, তার পরেই বাস্!"

"কত আর দেব বাবা? একটি ত' নয়! কুকুর আছে বেড়াল আছে ভেড়া আছে বাঁদর আছে সাপ আছে……

টুনু জিজ্ঞাসা করিল, "বাতাসা কি আর একটিও নেই, মা ঘরে?"

মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

টুনু বলিল, "ভাদু বায়না ধরেছে—"

শুক্‌নো মুড়ি সে খাইতে পারিবে না, বাতাসা কি গুড়, যাহোক্ একটা-কিছু তাহার চাই।

মা বলিলেন, "না মা, বাতাসা ত' নেই।"

শান্তি কাছে বসিয়া ভাদুকে তখনও বুঝাইতেছিল, "চুপ কর্ ভাদু—চুপ কর্! বাবা এই এম্‌নি বড়-বড রসগোল্লা আনবে তোর জন্যে,—চুপ কর্, কাঁদে না।"

ভাদু তবু থামে না।

মা চুপি-চুপি বলিলেন, "পয়সাও নেই যে আনিয়ে দিই।"

গতমাসে পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া শ্যামল লিখিয়াছিল,—'যে রকম ঘরে পড়েছ মা তোমরা, কষ্ট একটুখানি সইতে হবে বই-কি…।' আর রায়-জি আনিয়াছিলেন দেড টাকা। কোথায় কাহাকে একটি কবচ দিয়া ওই টাকা-দেড়টি তিনি রোজগার করিয়াছিলেন। সাড়ে-ছয়টি টাকায় মাস গিয়াছে।

মা ভাবিতেছিলেন, কষ্টের আর বাকি কিছু আছে কি না—

মায়ের মনের কথা টুনু বুঝিয়াছিল। বলিল, "আচ্ছা, দুষ্টু লোক যা-হোক্! আজই আমি চিঠি লিখি। নিজে ত' বেশ আছেন।"

শান্তি বলিতেছিল, "আবার কাঁদে? ক্ষুদিরামের গল্প বলব—চুপ কর্!"

টুনু বলিল, "কিসের গল্প শান্তি? বল্ ভাই বল্—শুনি।"

শান্তি তাহার চোখ দুইটা বড় করিয়া খুব খানিকটা ভারিক্কি স্বরে বলিল, "ক্ষুদিরাম। তুমি দেখনি তাকে,—তুমি জান না।"

গল্প শুনিবার জন্য ভাদু চুপ করিয়াছিল।

মা বলিলেন, "সেও মা ঠিক্ ওই ভুলোর মত হলো,

তুমি তখন বাপের ঘরে। ক্ষুদিরাম গয়লা,—এম্‌নি পাঁকাটির মত পাৎলা খিড়্‌খিড়ে একটি লোক,—অসুখে ভুগে ভুগে চামড়াটুকুই সার হয়েছিল বেচারির। তোমার শ্বশুরকে ত জানো! কোথায় কোন্ গাঁয়ের রাস্তা থেকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলো। বলে, কত কুকুর বেড়াল ত' খাচ্ছে তোমার ঘরে, আহা, যত্ন কর, মানুষটা যদি বাঁচে ত' বাঁচুক্!—বল্ না শান্তি, তারপর কি হলো বল্!"

বলিবার জন্য শান্তি ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, টপ্ করিয়া আরম্ভ করিল, "বনে তখন মেলা সিঁয়া-কুল—লাল-লাল পাকা-পাকা……"

টুনু বলিল, "ওই দেখ মা, সিঁয়া-কুল আরম্ভ করলে। ও কি পারে? তুমি বল মা!"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "নয় মা? সিঁয়া-কুল খেয়ে মরে নি?"

মা ঘাড় নাড়িয়া হাসিলেন। "হ্যাঁ বৌমা, তাই।"

তাহার পর কতক বা মা বলিলেন, কতক বা শান্তি বলিল।

গল্পটা এই—

সেবা-যত্ন করায় তাহার সে মড়া-চেহারা ঘুচিল। হাড়ের উপর একটুখানি মাংস লাগিল।

ক্ষুদিরাম বলিল, "আমি ত অম্‌নি খাব না বাবা, আমায় যা-হোক্ কিছু কাজ দাও।"

রায়-জি তাহাকে গরু কয়টি চরাইতে বলিলেন।

তাহাই হইল।

পরদিন হইতে গাইগরুগুলি ক্ষুদিরাম রোজ বনের ভিতর চরাইয়া আনে আর থাকে।

সকাল বেলা সে তাহার গামছার খুঁটে মুড়ি বাঁধিয়া গরু লইয়া যাইত।

ক'দিন মুড়ি সে কিছুতেই লইতে চায় না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুড়ি কেন নাও না ক্ষুদিরাম?"

"আজকাল কুল খাই ঠাকরুণ, মুড়ির আর তত গরজ নাই।"

বনের আশে-পাশে তখন বন-কুলের ছড়াছড়ি। নিজেও খায়—গামছায় বাঁধিয়া পাকা-পাকা কুল ঘরেও লইয়া আসে।

রায়-জি এ খবর জানিতেন না; যেদিন জানিলেন, ক্ষুদিরামকে খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "টক কুলগুলো খেয়ে মরবে যে ক্ষুদিরাম!"

কিন্তু অত বলা সত্ত্বেও কুলের লোভ সে ছাড়িতে পারিল না।

কুল খায় আর রোজ রাত্রে জ্বর আসে।

সকালে আবার ঝাড়াঝুড়ি দিয়া ওঠে, বনে যায়, ফিরিয়া আসে, ভাতও খায়, টকও খায়,—সবই চলে।

দেখিতে দেখিতে ক্ষুদিরামের একদিন হাত-পা মুখ-চোখ সব ফুলিয়া উঠিল।

জ্বর হয়। রোদে গিয়া পড়িয়া থাকে। জ্বর ছাড়ে আর খাইতে বসে।

বলে, "পুরনো জ্বর, কিছুই হবে না ঠাকরুণ!"

হঠাৎ সেদিন রাত্রি হইতে ক্ষুদিরামের বাড়াবাড়ি। সকালে মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। খালি খালি জল খায় আর বমি করে।

মা বলিলেন, "যত জ্বর তত জল আর তত বমি, আর—। সে যদি তোমার শ্বশুরের শুশ্রূষা একবার দেখতে বৌমা,—দু' হাত দিয়ে সেই সব পরিষ্কার করলে। যেন চোদ্দপুরুষের খুড়ো।"

ক্ষুদিরাম একটিবার মাত্র কথা কহিয়াছিল,—বেলা তখন দু' পহর।

বলিয়াছিল, "বাবা, আমায় বাইরে ফেলে দাও! ঘরে আমি মরব না বাবা,—দোহাই বাবা তোমার পায়ে ধরি—।"

হাত বাড়াইয়া রায়-জির পা দু'টা সে ধরিতে গিয়াছিল।

ওই যে পেঁয়াজ-বাড়ির ও-পাশে, ওইখানে কয়েকটা কাঠ দিয়া বন হইতে শালপাতা আনিয়া ক্ষুদিরামের জন্য রায়-জি সে এক চমৎকার কুঁড়ে তৈরী করিয়া দিলেন।

ক্ষুদিরাম সেইখানেই থাকে।

সে-রাতটা পার হইল।

রায়-জি কুঁড়ের দরজায় কাঠের ধুনি জাগাইলেন। সারারাত সেইখানেই।

দিব্যি ফটফটে জ্যোৎস্না রাত। বনের ভিতরটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যায়।

পরদিন ক্ষুদিরামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল।

হাঁ করিয়া পড়িয়া থাকে আর মুখের পথে নিঃশ্বাস টানে।

গাঁয়ের মেয়েগুলা পুকুরে জল লইতে আসে আর একবার করিয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া যায়।—"আহা ক্ষুদিরাম, মরছো? মরো।"

বৈকালে গাঁয়েরই একটা আধ-বয়েসী দুষ্টু মেয়ে পুকুর হইতে কল্‌সী-কাঁকে জল লইয়া ফিরিতেছিল। ক্ষুদিরামকে দেখিবার জন্য কুঁড়ের দরজায় থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।—হাঁ করিয়া নিশ্বাস লইতেছে দেখিয়া মেয়েটা ভাবিল, বুঝিবা ক্ষুদিরাম একটুখানি জল খাইতে চায়।

'আহা, মরণকালে জল দিলে বহুৎ পুণ্যি হয় বাছা—!' ঘড়াটা দু'হাতে তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া মেয়েটা বোধ করি পুণ্য অর্জ্জন করিবার জন্যই হড়্ হড়্ করিয়া তাহার নাকে-মুখে খানিকটা জল ঢালিয়া দিল।

দম বন্ধ হইতে আর কতক্ষণ!—বাস্!

মিনিট-খানেকের মধ্যেই খাপ্‌চি খাইয়া খতম্!

টুনু বলিল, "কে মা, কে সে মেয়েটা?"

কান্তি বলিয়া উঠিল, "ওই দাসী-শালী, দাসী হারামজাদী, চোর শালী,—চুরি করে' সেদিন ধরা পড়েছিল।"

কিন্তু মরিবার সময় রায়-জি ঘরে ছিলেন না। গরু-বাছুরের জন্য বনের ধারে চারটি ঘাস কাটিতে গিয়াছিলেন।

ফিরিয়া আসিয়াই বলেন, "ওকে পোড়াব। ওর সৎকার করে' দিই।"

কিন্তু গ্রামের লোক বিপক্ষে দাঁড়াইল।

বলে, "কি না কি জাত, ও মড়া পোড়ালে জাত যাবে।"

রায়-জি বলেন, "তবে আর শ্মশানে কাজ নেই,—ওইখানেই পোড়াই। জাত যায় ত' যাবে আমারই যাবে।"

গাঁয়ের লোক ত' রাগিয়া আগুন!

মা বলিলেন, "আমরাই শেষে পায়ে-হাতে ধরে বারণ করলাম বাছা,—বলি, না গো, তবে আর পুড়িয়ে কাজ নেই। গাঁয়ে যখন বাস করেই আছি,—আপদ আছে, বিপদ আছে, গাঁয়ের লোককে বাদ দিয়ে—"

রায়-জি রাগিয়া শেষে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।—"মর তবে! ঘরের দোরে পচুক্ ও; পচে গন্ধ উঠুক্! তোমরাও দেখ আর ওই হতভাগা গাঁয়ের লোক······"

মড়া কিন্তু পচিল না, গন্ধও উঠিল না,—টাট্‌কা টাট্‌কা তাহার সৎকার হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বনের ভিতর হইতে দলে দলে শেয়াল আসিয়া জড় হইল। তাহারা যে কেমন করিয়া টের পাইল কে জানে।

মা বলিলেন, "জ্যোৎস্না রাত,—আমরা ওই দোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সব।"

শেয়ালগুলা ক্ষুদিরামকে টানিয়া কুঁড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনিল।

শান্তি বলিল, "আর সেই দুটো আধ-বাগা এসেছিল,' নয় মা? সেই বাছুরের মতন—"

মা বলিলেন, "সে যে কতরকমের জানোয়ার মা, তার কি আর অন্ত আছে! ভুলোর মত ওকেও সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্‌লে বাছা!"

শান্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ক্ষুদিরামের মুণ্ডুটা আমি এখনও তোমায় দেখাতে পারি বৌদি! এই এম্‌নি দাঁত বের করে' আছে। বুঝ্‌লে?"

বৌদির তখন ভয়ে আর কথা বাহির হইতেছিল না।

শান্তি বলিল, "বাবার ম্যাজিকের বাক্সে আছে, দেখাতে পারি আমি। দাঁড়াও, বাবা এলে দেখাব।"

টুনু বলিল, "আর দেখিয়ে কাজ নেই। হ্যাঁমা, সত্যি ?"

মা বলিলেন, "জানোই ত' মা তোমার শ্বশুরকে! বল্‌লে, চিহ্ন একটা রাখি বেচারার। বলে' মাথাটা কোত্থেকে কুড়িয়ে এনে রেখে দিলে বাছা!"

গল্প শুনিতে শুনিতে ভানু কখন্ মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

"শুক্‌নো মুড়ির বাটিটা ঘর ঢুকিয়ে রাখো বৌমা, এক্ষুণি আবার বেড়ালে মুখ দেবে।"

ক্রমশ—

চয়নিকা

দান

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাণো জানিয়া চেয়োনা আমারে
আধেক আঁখির কোণে
অলস অন্য মনে॥
আপনারে আমি দিতে আসি যেই
জেনো, জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই
ফেলে দেই পুরাতনে॥

আপনারে দেয় ঝরণা, আপন
দান-সুখে উচ্ছলি।
লহরে লহরে হয় যে নূতন
অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবী কুঞ্জ বার বার করি
বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি,
বার বার তার দান মঞ্জরী
নবীন প্রতি ক্ষণে॥

তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায়
চির নূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায়
জাগে চির সুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি নাহি পাবে শেষ,
আমার দিনের সকল নিমেষ
ভরা অশেষের ধনে॥

মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩৩

আপন কথা

পদ্ম দাসী

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পলতোলা থাম—তারি ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতালার উত্তর-পূব কোণের ছোট ঘরটা, এক কোণে জ্বলছে মিট্‌-মিটে একটা তেলের সেজ, ঘরের তিনটে জানলাই হিমের

জুড়ে লাল-খেরুয়ার মোটা পর্দ্দা দিয়ে সম্পূর্ণ জোড়া, ঘর-জোড়া উঁচু একখানা খাট, তারি উপরে সবুজ রংএর মোটা দিশি মশারি, ঘরে ঢোকবার দরজাটা এতবড় যে তার উপর দিকটাতে বাতির আলো পৌছতে পারে নি! এই দরজার এক পাশে একটা লোহার সিন্দুক, আর তারি ঠিক সাম্‌নে কোথা থেকে একটা কাঠের খোঁটা হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে হাত তিনেক উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এই খোঁটা,—ঘরের মধ্যে যার দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ ছিল না—সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—দেড় হাত প্রমাণ একটা ছেলে! খোঁটার মাথার কাছে এতটুকু 'কুলুঙ্গির মতো একটা চৌকো গর্ত্ত, তারি মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছিনে কুলুঙ্গিটার! আলোর কাছে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্ম দাসী মস্ত একটা রূপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসেছে—তুলছে আর ঢালছে সে তপ্ত দুধ,—দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠ্‌ছে নাম্‌ছে, নাম্‌ছে উঠ্‌ছে, চারিদিক স্নন্‌সান কেবলি দুধের ধারা পড়ার শব্দ শুনছি, আর দাসীর কালো হাতের ওঠাপড়ার দিকে চেয়ে একটা কথা ভাবছি—উঁচু খাটে উঠতে পারা যাবে কি না?

পর্দ্দার ওপারে অনেক দূরে আস্তাবলের ফটকের কাছে নন্দ ফরাসের ঘর, সেখানে নোটো খোঁড়া বেহালাতে গৎ ধরেছে—এক্ দুই্ তিন্ চার্ এ-হে-ক্, দুহি, তিহিন্, চার! এক দুই তিন চার জানিয়ে দিলে রাত কত হয়েছে তা—অমনি তাড়াতাড়ি খানিক আধ ঠাণ্ডা দুধ কোনো রকমে আমাকে গিলিয়ে খাটের উপরে তিনটে বালিসের মাঝখানটায় কাত করে ফেলে মনে মনে একটা ঘুম পাড়ানো ছড়া আউড়ে চল্লো আমার দাসী, আর তারি তালে তালে অন্ধকারে তার কালো হাতের রহে রহে ছোঁয়া ঘুমের তলায় আস্তে আস্তে আমাকে নামিয়ে দিতে থাকলো। একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল আমার দাসী, সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াতো, কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতো সে—দেখতে পেতেম না তাকে, শুধু ছোঁয়া পেতেম থেকে থেকে! কোনো কোনো দিন অনেক রাতে সে জেগে বসে চাল-ভাজা কট্ কট্ চিবোতো আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াতো—শুধু শব্দে জানতেম এটা, আমি জেগে আছি জানলে দাসী চুপি চুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল নাড়ু অন্ধকারে আমার মুখে গুঁজে দিতো, নিত্য খোরাকের উপরি পাওনা ছিল এই নাড়ু। খাটে উঠ্‌বো কেমন করে এই ভয় হয়েছিল, কাযেই বোধ হচ্ছে উঁচু পালঙ্কে শোয়া সেই আমার প্রথম জানিনে তার আগে কোথায় কোন ঘরে আমাকে নিয়ে শুইয়ে দিতো কেমন বিছানায় কে! চারিদিকে সবুজ মশারির আবছায়া ঘেরা মস্ত বিছানাটা ভারি নতুন ঠেকেছিল সেদিন—একটা যেন কোন্ দেশে এসেছি যেখানে বালিসগুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাহাড় পর্ব্বত, মশারিটা যেন সবুজ কুয়াশা ঢাকা আকাশ—যার ওপারে—এখানে আর মনে করতে হতোনা দেখতে পেতেম,—চিৎপুর রাস্তা থেকে যে সরু গলিটা আমাদের ফটকে এসে ঢুকেছে সেটা একেবারে জনশূন্য, দু' নম্বর বাড়ির গায়ে তখনকার মিউনিসিপালিটির দেওয়া একটা মিটমিটে তেলের বাতি জ্বলছে আর সেই আলো-আঁধারে পুরোনো শিব মন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে কন্ধকাটা একটা দুই হাত মেলিয়ে শিকার খুঁজতে খুঁজতে চলেছে! কন্ধকাটার বাসাটাও সেই সঙ্গে দেখা দিতো—একটা মাটির নল বেয়ে দু' নং বাড়ির ময়লা জল পড়ে পড়ে খানিকটা দেওয়ালে সোঁতা আর কালো—ঠিক তারি কাছে আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকর—দিনেও যার মধ্যে অন্ধকার জমা হয়ে থাকে! সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল এই কন্ধকাটা—যার পেট্‌টা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করতো আর ঢোক্ গিলতো, যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার-দাঁড়ার মতো হাত দুটো যার পরিষ্কার দেখতে পেতো শিকার! আর একটা ভয় আসতো সময়ে সময়ে—কিন্তু আসতো সে অকাতর ঘুমের মধ্যে, সে নামতো বিরাট একটা আগুনের ভাঁটার মতো বাড়ির ছাত ফুঁড়ে আস্তে আস্তে আমার বুকের উপরে—যেন আমাকে

চেপে মারবে এই ভাব—নামছে তো নামছেই গোলাটা, আমার দিকে এগিয়ে আসার তার বিরাম নেই, প্রায় বুকের কাছাকাছি এসে গোলাটা আস্তে আস্তে আকাশে উঠে যেতো, আমি হাঁফ ছেড়ে চমকে উঠে দেখতেম সকাল হয়েছে, আর কপাল গরম হয়ে আমার জ্বর এসে গেছে! দশ বারো বছর পর্য্যন্ত এই উপগ্রহটা প্রতিবার জ্বরের অগ্রদূত হয়ে ছাত ফুঁড়ে এসে আমায় ভয় দেখিয়ে যেতো। উপগ্রহকে ঠেকাবার উপায় ছিল না, কিন্তু উপদেবতা সেই কন্ধ-কাটার হাত থেকে বাঁচবার বুদ্ধিটা ছিল আমার তখন—লাল শালুর লেপ তারি উপরে মোড়া থাকতো পাতলা ওয়াড়—আমি তারি মধ্যে এক এক দিন লুকিয়ে পড়তেম এমন, যে দাসী সকালে বিছানায় আমায় না দেখে কোন কোন দিন—ছেলে কোথায় গেল বলে সোরগোল বাধিয়ে দিতো, অবশেষে পদ্ম দাসীর পদ্মহস্তের গোটাকতক চাপড় খেয়ে—যাদুকরের থলি থেকে গোলার মতো ছিট্‌কে বার হতেম আমি সকালের আলোয়! জীবনের প্রথম কয় বছর—লেপের ওয়াড়খানা গুটিপোকার খোলস ছাড়ার মতো করে ছেড়ে বার হওয়া আর রাতে আবার গিয়ে লুকোনো লেপের মধ্যে, আর তারি সঙ্গে জড়িয়ে বাটি ঝিনুক খাট সিন্দুক তেলের সেজ পদ্ম দাসী এমনি গোটা কতক জিনিষ, আর শীতের রাতের অন্ধকারে কতকগুলো ভূতের চেহারা দিনের বেলাতেও একরকম অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো কতকগুলো চমকে দেওয়া শব্দ—চলার শব্দ, দরজা পড়ার শব্দ, চাবির গোছার ঝিন্ ঝিন্ মাত্র আছে—আমার কাছে, আর কিছু নেই কেউ নেই!

১৮৭১ খৃঃ অব্দের জন্মাষ্টমির দিনের বেলা ১২টা ১১ মিনিট থেকে আরম্ভ করে খানিকটা বয়েস পর্য্যন্ত রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের পুঁজি—এক দাসী, একখানি ঘরে একটি খাট্, এক দুধের বাটি,—এমনি গোটাকতক সামান্য জিনিষের মধ্যে বন্ধ রয়েছে, শোয়া আর খাওয়া—এ ছাড়া আর কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগও নেই আমার; অকস্মাৎ একদিন ঘটনার সামনে পড়ে গেলেম, একলা—ঘটনার প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সেটা। তখন সকাল দেড় প্রহর হবে, তিন তলার বড় সিঁড়ির উপরের ধাপের কিনারা যেখানটায় খাঁচার গরাদের মতো মোটা মোটা সোজা শিক দিয়ে বন্ধ করা, সেই থানটাতে দাঁড়িয়ে দেখছি—কাঠের সিঁড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধাপগুলো একটা চৌকানা যেন কুয়োকে ঘিরে ঘিরে নেমে গেছে কোন্ পাতালে তার ঠিক নেই, এই ঘূর্ণির মাঝে একটা বড় চাতাল, পশ্চিম দিকের একটা খোলা ঘর দিয়ে চাতালের উপরটায় পড়েছে চওড়া সাদা আলোর একটি মাত্র টান্! ঠিক এই জায়গাতে আমার কালো দাসী আর রসো বলে আর একটা মোটা-সোটা চাকরাণী কথা কইছে শুনছি, আমি তো তাদের কথা বুঝিনে, কথার মানেও বুঝিনে, কেবল স্বরের ঝোঁক আর হাত পা নাড়া দেখে জানছি দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বেধেছে। খাঁচার পাখীর মতো গরাদের মধ্যে থেকে বাইরে চেয়ে দেখছি কি হয়—হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ছিট্‌কে দেওয়ালের উপরে পড়লো, আবার তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে কোমর বাঁধতে থাকলো। তখন তার কালো কপাল বেয়ে সিঁদূরের মতো রক্ত পড়ছে, চুলগুলো উস্কো, চেহারা রাগে ভীষণ হয়ে উঠেছে—যেন কালো পাথরের ভৈরবী একটা মূর্ত্তি! আমি চীৎকার করে উঠলেম—মারলে আমার দাসীকে মারলে! লোক-জন ছুটে এল, ডাক্তার এল, একটা সাদা কাপড়ের জলপটী দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেল। কিন্তু আমার মনে জেগে রইলো সিঁদূরের মতো সকালের দেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই! সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে, তারপর দিন থেকে দেখি দাসী কাছে নেই, কিন্তু ভাবনা রয়েছে তার মনে—দেশ থেকে খেল্‌না নিয়ে ফিরে আসবে দাসী—সিঁড়ির দরজার ধারে বসে বীরভূমের গালার তৈরি একটা কাছিম নিয়ে খেলি আর রোজই ভাবি দাসী আসবে। কোন্ গাঁয়ের কোন্ ঘর ছেড়ে এসেছিল অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্ম দাসী! শুনেছি সে ভীষণ কালো ছিল, পদ্ম নামটা তাকে একটুও মানাতো না—সে তার বেমানান নাম নিয়েই এসেছিল এবং এই বাড়িতে বাস করেও গেল—গল্প বলেছে—ঝগড়া করেছে—কাষ

করেছে এবং আমাকে মানুষ করার বখসিস্—সোণার বিছে হার আর রক্তের টিপ পোরেও চলে গেছে বহুদিন, পৃথিবীর কোনোখানে এক আমার মনে ছাড়া আজ তার কিছুই ধরা নেই, হয়তো বা তাই আপনার কথা বলতে গিয়ে প্রথম সেই নিতান্ত যে পর সব প্রথম তাকেই দেখতে পাচ্ছি—পঞ্চাশ বছরের ওধারে সে বসে বসে দুধ ঢালছে আর তুলছে রূপোর ঝিনুকে আমার জন্যে।

—বঙ্গবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩৩

পেনসনের পর

শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞেরা—অর্থাৎ লেখক, বক্তারা, একবাক্যে শেষ কথাটা বলে দিয়েছেন যে, এরা চাকুরে জাতি! চাকরীই যদি পেশা হল, ভালো চাকরী খোঁজাই স্বাভাবিক। সরকারী চাকরীই সেরা—তাতে পেন্‌সন্ আছে, ভাগ্যে থাকলে খেতাবও মেলে।

আজকার এই সম্মিলনী-সভায় অনেক ভদ্রসন্তানই থাকতে পারেন,—যদি অপরাধ না হয়তো তাঁদের অনুমতি নিয়ে বলি,—যাঁরা সরকারী চাকরী করেন,——পেন্‌সনের আশা রাখেন। কিন্তু পেন্‌সন্ কথাটা তাঁদের আজো শোনা জিনিষ; কাগজে-কলমে জানলেও, সেটাব আস্বাদ তাঁরা পাননি। আমি কিছু কিছু পেয়েছি, তাই বোধ করি সে সম্বন্ধে বলবার একটু দাবীও আছে।

আমাদের দেশে চাকুরেরাই বোধ হয় বেশী লিখেছেন, ডেপুটিরাও চাকুরে,—অবশ্য বড় চাকুরে! সম্ভবতঃ সেই আশাতেই সম্মিলনীর * প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়, আমাদের কাছ থেকে গবেষণাপূর্ণ মৌলিক কাজের কথা প্রভৃতি চেয়েছেন। তা তিনি নিশ্চয়ই পারেন, তবে আমার কাছে নয়। পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পরের অভিজ্ঞতাটা গবেষণা-প্রসূত বা মৌলিক না হলেও, অনেকের কাছে নতুন আর কাজের কথা বলে গৃহীত হতে পারে। অবশ্য এটা আমাব অনুমান। আমি সেই সম্বন্ধেই একটু বলছি। বিষয়বুদ্ধি কোনদিনই না থাকায় বিষয় খুঁজে পাইনি, অপবাধ ক্ষমা করবেন।

জীবমাত্রেই মুক্তি খোঁজে, বন্ধন কেউ চায় না, সেটা এড়াতেই চায়। আমিও জীবের মধ্যে একটি, তাই "জীবমাত্রেই" বলেছি, "মানুষমাত্রেই" বলিনি। পেন্‌সন্ নেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছিলাম, দিন গুণছিলাম। আপিসেব প্যাড্‌খানা পঞ্জিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেহটি পুষ্পে ভবাট।

যেদিন থার্ড্ বেল্ দিলে, তিনটে বাজতেই "আব কারোর চাকব নই" বলে, কাগজপত্র গুটিয়ে, বাসায় চলে এলুম। অনন্তশয্যা পাতাই ছিল, এসেই সটান্ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লুম! সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের তরঙ্গ ঢেউ খেলে বেড়াতে লাগলো, গায়ে আর ধরছে না। পা'দুটো সামনে, আব হাত দুটো মাথা ডিঙ্গিয়ে সজোরে সোজা করে দিয়ে, উপর দিকে চেয়ে বললুম—"উঃ এতটা দিন কাটিয়ে দিয়েছি! পঁ-চি-শ বছর! আজ তুমি এলে! সত্যি এলে!!" বল্‌তে বল্‌তে এমন লম্বা হয়ে পড়লুম, খাটের বাইরে পা গিয়ে পড়লো, হাত দুটো মাথা পেরিয়ে যেন দু'-হাত তফাতে।

* প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

আজো বুঝতে পারিনে সত্য কি মিথ্যা। মনে আছে চোখে জল গড়িয়েছিল! আনন্দের বেগ যে এটুকু শরীরে ধরছিল না! নিজেই অবাক হয়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে হবে না কেন, বন্ধনমুক্তি যে। বদ্ধ অবস্থায় কি করে বুঝব আমি কত বড়। নীলাচলে মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল রং দেখে, শ্রীকৃষ্ণ ভেবে আনন্দে "এই যে এই যে" বলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জেলেরা তোলবার পর অনেকেই দেখেছিলেন—তাঁর দেহ দেড়া হয়ে গেছে; আনন্দে অঙ্গ শিথিল হয়ে হাতপায়ের খিল খুলে গেছে।

যাক্, মুক্তির আশার আনন্দেরই এতটা প্রভাব। প্রকাশের বেদনা উপস্থিত, কার কাছে বলি, বাসায় কেউ নেই। চাকরটাকেই বললুম। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল, বাবু ভাঙ্ খেয়েছেন।

বাসা তুলে বাড়ী গেলাম। দেহমনে কোথাও আর ভার নেই, স্বাধীন জীব। এইবার একমনে ভগবানের নাম করা, গ্রামের স্কুল আর লাইব্রেরিটে দেখা, আর গুড়ুক খাওয়া। স্বাস্থ্যটা জোর রাখবার জন্যে ছোট একটি বাগান করা,—বাস্।

দিন দশেক বেশ গেল; কোট্, জুতো, মোজা বজায় রইল। তারপর—"বসে বসে কি করবে, বাজারটা করলেও তো সংসারের উপকার হয়!" সত্যিই তো। কোট, জুতো, মোজা খস্‌লো। পল্লীগ্রামের বাজারে চার আনার বাজার করতে মোজাজুতো পরে আর কে যায়। গামছা কাঁধে উঠলো, যে কাজের যে বেশ।

ক্রমে,—এটা আনোনি ওটা আনোনি, এটা এত কম্ কেন, ওটা অত মাগ্‌গি কেন, ঘুশোচিংড়ি সবাই পেলে আর তুমি পাও না ইত্যাদি।

আগে আমি হুকুম করতুম, এখন আমি হুকুম শুনি,—সারাদিন। বারবাড়ীতেই দিন কাটাই—ভগবানের নাম করা চাই তো। বউমারা সোনা, মাণিক, গোপাল, যাদু লেলিয়ে দিয়ে যান, বলে যান,—পুকুরে না যায়, পড়ে না যায়, মাণিককে কোলে করে পা নাড়লেই ঘুমুবে, ভারি শান্ত ছেলে। কেউ নাক টানে, কেউ কান টানে, কেউ যা করে তা সভায় বলবার নয়। কাঁদলে আমার দোষ! এই নিত্য। সব ছেলেই শান্ত! গোপাল লাফিয়ে পড়ে দাড়িটে কাটলে, কপাল পোড়ে আমার! বউমা বলেন,—বুড়ো মিন্‌সে বসে বসে ফেলে দিলে গা! কাজকর্ম নেই, ছেলেগুলোকে দেখতে শুনতেও পারেন না, ইত্যাদি। কর্ত্তা ছিলুম—এখন আমি একাধারে ঝি চাকর দুই-ই। অবশ্য তারা যা বলে আর করে, তা নাকি আমার ভালর জন্যেই।

ভগবানের নাম করবার কথা মুখে আনলে সদুপদেশ পাই, "ছেলেরা কি ভগবান নয়, ওদের নিয়ে থাকলেই ভগবানকে নিয়ে থাকা হয়।" ঠিক্! বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে কড়া সাধন-ভজন করে থাকব, তাই ভাগ্যে এতগুলি ভগবান জুটেছেন।

সব গঙ্গাস্নানে কি নিমন্ত্রণে যান, বাড়ী চৌকি দিতে হয়, বৎসগুলি সামলাতে হয়। এই শেষেরটিই সাংঘাতিক, যেহেতু সবাই শান্ত। তারা আমার প্রাণান্তের পাক্ চড়িয়ে দিলে।

আর তো পারিনে। এক বছরেই বেশ বুড়িয়ে দিলে। চুল পাক্‌লো, মেরুদণ্ড বাঁক্‌লো। এখন যা জলখাবার পাই, তা ওই পঙ্গপাল তারাই খায়, আমি দেখি। ক্রমে সয়ে গেল। একদিন দেখতে পেয়ে বল্লেন—"কি আনন্দ বল দিকি!" বললুম—"অত্যন্ত।"

সকাতরে ভগবানকে বলি—"বন্ধন-মুক্তির সাধ মিটেছে প্রভু। ত্বয়া হৃষীকেশ, আর নিযুক্তোঽস্মি নয়, দয়া করে বিযুক্তোঽস্মি!"

একটু ফাঁক পেলে—কোন দোকানে কি ঘাটে বসে বাঘ মারি, অর্থাৎ আপিসের আর সাহেবের গল্প করি। আপিস ছিল মুঠোর মধ্যে, আর সাহেব ছিলেন হাতের পুতুল। যা ছকে রেখে এসেছি, এখন অন্ধে কাজ চালাতে পারে; তবু এই একের অভাবে তিন তিনজন রাখতে হয়েছে, ইত্যাদি। সেই সময়টুকুই কাটে ভালো।

পরম স্নেহের আর মোহের "প্রবিউল"গুলি ক্রমে অসামাল করে তুললে! বুড়ো বয়সে পালাবার সখ এনে দিলে। মনে পড়লো বাল্যবন্ধু ভগবতীবাবুও পেন্‌সন্

নিয়েছেন, দেওঘরে আছেন ; তিনি কেমন আছেন দেখা যাক্। ভাগ্যবান লোক, ভালই থাকবেন।

অবস্থা পাকাই দাঁড়িয়েছিল, খসতে বিলম্ব হল না। এখন আমার পা বাড়ালেই অমৃতযোগ !

দেখে বন্ধু ভারি খুসী, বললেন—"বাঁচালে ভাই, দুটো কথা কয়ে বাঁচ্‌ব।" জিজ্ঞাসা করলুম—"আগে বল তো আছো কেমন !"

"বড়ি মজিমে হ্যায় ভায়া।"

শুনে বড় আনন্দ হ'ল, বললুম—"আমিও পেন্‌সন নিয়েছি, তোমার রুটিন্‌টে জানতে এলুম, অবশিষ্ট জীবনটা সেই আদর্শমত কাটাবার চেষ্টা করব।"

"ও ভেবনা, কোনো চেষ্টা করতে হবেনা হে, আপ্‌সে এসে যাবে। আমাকে কি কিছু করতে হয়েছে—না করতে কেউ দিচ্ছে।"

বললুম—"সব সংসার তো একরকম নয় দাদা, না সব অদৃষ্ট ?"

"সব এক ভাই—সব এক। পেন্‌সন্ নেবার পর সব এক, বৈচিত্র্যের বেয়াদবী নেই, দেখতেই পাবে।"

স্নানাহারের পর আমাকে বিশ্রাম করতে বলে ভগবতী-বাবু ভিতরে গেলেন।

বেলা তিনটের পর এসে বললেন—"কই ঘুমোও নি তো ?"

"দিনে বড় একটা ঘুমোই নে, একটু গড়িয়ে নিই বটে। বই কি খবরের কাগজ থাকলে তাই নিয়েই থাকি।"

"ও বদ-অভ্যাসটা থেকে মা সরস্বতী কৃপা করে আমাকে রেহাই দিয়েছেন—যথালাভ। বাংলা হরফ্‌গুলো ভুলে না যাই, তাই পাঁজি একখানা থাকে। ফি বছর কিনতে হয় না,—সবই নূতন পঞ্জিকা, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন-গুলো দেখি,—ভারি interesting হে ! কিন্তু ঝঞ্ঝাটও বড়, বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখতে হয়,—ছেলেমেয়েদের হাতে না পড়ে।"

বললাম—"তুমিও তো শোওনি দেখছি।"

"আমি ? হেঃ—পেন্‌সন্ নিয়েছি যে ! দেখছো না, তোফা মানস সরোবরে রয়েছি, বুকেপিঠে রাজহংস রাজ-হংসীরা কেলি করে, চোখ বুজতে ভয় হয়—কখন্ কোনটা চোখ খুব্‌লে নেবে !"

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো, বললুম—"পড়েন না, ঘুমোন না তবে আহারের পর এ চার পাঁচ ঘণ্টা করেন কি ?"

"করেন কি ?—করেন কর্ম্মভোগ। গ্রহ কি সূত্র ধরে কখন যে দেহে প্রবেশ করে, তা বলা যায় না ভাইয়া। কৈশোরে শিল্পের দিকে বেশ একটু ঝোঁক ঝাম্‌রেছিল। বেগুণী রংয়ের রেশম এনে, চাদরে পাড় তুলে ব্যবহার করতুম। দেখে বাহবা পড়ে গেল। মামা আমাকে নিয়ে জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটলেন। পণ্ডিত বল্‌লেন—'এ যে কাশ্মীরের শাল-শিল্পী বিখ্যাত কুদ্‌রৎ খাঁ ! বাংলায় এসে জন্মেছে। কালে এ জামিয়ার বানাবে।' মামা প্রতিভার কদর জানতেন,—ইস্কুলটা ছাড়িয়ে দিলেন। তাঁরই আশীর্ব্বাদে এখন নিদ্রা ত্যাগ করে জামিয়ার বানাচ্ছি। কাটতিও তেমনি !"

আমি অবাক্ হয়ে শুনতে লাগলুম আর ভাবতে লাগলুম—জগতে এসে দিনগুলো বৃথাই কাটিয়েছি, দেখছি সকলেই কিছু না কিছু জানেন। বললুম—

"বিজ্ঞাপন দেখিনি তো, নেবার লোক পান কোথা ?"

"নেবার লোক ! অভাব কি ? বছরে তিন চারটে বাঁধা খদ্দের আসেই, প্রত্যেকের অন্ততঃ এক ডজন করে চাই। পারলে তিন ডজন করে দিন্-না—অধিকন্তু ন দোষায়, কেউ 'চাইনে' বলবে না। অত পেরে উঠিনে, সেজন্য সৎপরামর্শ সামলাতে রাতের ঘুমটাও যায় যায় হয়েছে।"

বল্‌লুম—"না দাদা, ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজ এ বয়সে রাত্রে আর কোরো না। পয়সা আছে বটে—"

বন্ধু বাধা দিয়ে বল্‌লেন—"পয়সা ?"

বল্‌লুম—"না হয় টাকাই হল।"

বন্ধু কথা না কয়ে চট্ বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন।

একটা গাঁঠরি এনে সামনে ধরে দিয়ে বললেন—"খুলে দেখ না।"

খুলতেই কতকগুলো ছোট, বড়, মাঝারি, প্রমাণ, তরোবেতরো কাঁথা বেরিয়ে পড়লো!

বললেন—"নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখো—নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখো। ওতে এখনো আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্পর্শ করেনি। প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হ'তে এখনো দেরি আছে।"

দেখে-শুনে আমিতো স্তম্ভিত!

"চুপ করে রইলে যে?"

"না, ভাবছি আমাদের শুভানুধ্যায়ী শাস্ত্রকারেরা অনেকে ভুলেই বলে গেছেন—বাঁচতে চাও তো পঞ্চাশ পেরোলেই বনে যাও।"

"কি বললে,—বন? বন তুমি কাকে বলো?—বাঘ-ভাল্লুক থাকলেই তো বন। তার সঙ্গে চিতে, নেকড়ে, বিচ্ছু—আর কি চাও? এখানে অভাব অনুভব করলে নাকি?"

ও কথা মাথা পেতে মেনে নিয়ে বললুম—"গৃহস্থালীর ছুঁচের কাজটা সকল দেশেই মেয়েরা—"

বন্ধু বলে উঠলেন—"অম্বল, ভায়া অম্বল! আহারান্তে অমনিতেই বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকে, তার উপর আবার হাতে ছুঁচ! বলো কি!"

অপ্রতিভের মত বললুম,—"তা তো জানতুম না, এখন কেমন আছেন?"

বললেন—"কাশীর গারাভৈরবী-দিদি বড় স্নেহ করেন, ওস্তাদও তেমনি, তাঁর ব্যবস্থাতেই বেঁচে আছেন। সিদ্ধা কিনা চূড়া-বাঁধা চুলে সোনার তারে গাঁথা স্ফটিকের মালা জড়ানো, হাতে জার্ম্মান্ সিলভারের high-polish ত্রিশূল, দেহ চন্দনের ক্ষেত। যেমন সৌম্যা, তেমনি ধৌম্যা। তাঁর টোট্‌কাই চলছে:—আহারান্তে ঘড়ি ধরে তিন ঘণ্টা গড়ানো, না হয় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য তিন ঘণ্টা তাস খেলা; তাতেও যদি না হঠে, সেকেন্দরী সিক্কার পাকা তিন পো মালাই। শেষেরটিই ব্রহ্মাস্ত্র, পড়েছে কি সব বালাই সাফ্। সেইটিই চলছে।—হ্যাঁ, গৃহস্থালী বলছিলে না! আমার এটা ঠিক গৃহস্থালী নয় ভায়া—নিজের গড়া 'গোলেবকালী'। এই যেমন বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি। প্রতিভাবানদের দস্তুরই ওই,—বানানো পথ বাদ দিয়ে চল।"

আমিও অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবছিলুম, শেষটা Penguin Island-এ পৌঁছে গেলুম নাকি, ইনিই মহাপুরুষ St. Mael নয় তো! তাড়াতাড়ি কাঁথার পুঁটুলিটা বন্ধুর হাতে দিয়ে বললুম—"করেছ কিন্তু সুন্দর, শিল্পকলা একেই বলে, বাঃ।"

বললেন—"হ্যাঁ আসল চাটিম্-কলা,—কুদ্রৎ খাঁ যে!" বলেই হাসিমুখে পুঁটলিটা নিয়ে প্রস্থান। ভাবলুম রেহাই। তা কিন্তু হল না।

পুঁটলি রেখেই পুনঃপ্রবেশ,—"হ্যাঁ, যে কথা বলতে এসেছিলুম; আমাদের বন্ধু অমর এখানে এসেছে। আজ দেখি লোহালকড়ের দোকানে দ্বিতীয় প্রহরের রোদটা মাথায় করে ছুটোছুটি করছে। আহা, তার তো পেনসন নয়, এ আরাম পাবে কোথায়; কলকাতায় Hardware-এর দোকান। তাকে বললুম—"এত বেলায় এই রোদে করছ কি, অসুখে পড়বে যে। বিশেষ দরকারী কিছু নাকি? ছাতাটা ফেললে কোথায়?" অমর হেসে বললে—"যাতে দু'পয়সা আছে তাই দরকারী; এই দেখনা ঘণ্টা দেড়েক ঘুরে দেড়শো টাকা ঘুরিয়ে আনলুম। ভেবনা, আমরা রোদে-জলেই মানুষ, ছাতা নেওয়ার বদ অভ্যাস নেই। অসুখ বলছ! অ-রোজগারের চেয়ে অ.ন্ন বসে থাকার চেয়ে অসুখ আছে নাকি?" এই বলে হি হি করে হেসে 'ক্যা ভাইয়া, বলেই একটা লোহার দোকানে ঢুকে পড়লো।

"ওর জন্য বড় দুখ্ খু হয় ভাই, পেন্‌সন্ পেলে আজ,—আহা—ভাগ্য! বুঝ্ ছতো,—কি বল? তবে পয়সার প্রেম ওকে যৌবনের বল যুগিয়ে জোয়ান করে রেখেছে। আর আমি বেটা 'চিন্তামণি হয়ে রইলুম হে!"

"সে আবার কি,—ভগবতী থেকে চিন্তামণি হলে কবে?"

"ভগবতী তো বটেই, এটা ছেলেদের কাছে প্রমোশন-পাওয়া খেতাব!"

"বুঝতে পারলুম না তো।"

খুব সোজা,—ঠেকে একটু কঠিন বটে। এই পেন্‌সন নেবার পরের কথা গো, তখন দেশেই ছিলুম। গরুটা সাত মাস গাভিন, কি করে বেরিয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা হয়, ফেরে না। চঞ্চল হতে হল। হলে আর হবে কি, বাতে কাত করে রেখেছে। যাহোক, সুক্ষণে কি কুক্ষণে, কড়াই শুঁটির কচুরী হতে দেরী হওয়ায়, বাবাজীরা আটকে গিয়েছিলেন, তখনো বাড়ী ছিলেন। বল্লেন—"ভাবছেন কেন, আমরা দেখছি।" শুনে কতটা সাহস আর আনন্দ পেলুম, বুঝতেই পারছ। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম। বাতের বেদনা ভুলে গেলুম, আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এলো। পুত্রহীনদের জন্যে পরম আপশোষ অনুভব করতে লাগ্‌লুম। আহা, তারা কি দুর্ভাগা! মজ্জায় মজ্জায় মনে হল—পুত্র plus পেন্‌সন্ equal to Paradise। বললুম—

'তাহলে আর দেরি করিস্‌নে বাবা, কালা-গরু সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া শক্ত হবে। হিঁদুর দেশ, কোন্ বেটা বেড়ো মেরে খেঁড়ো গাইটে সাবাড় করে দেবে; বেরিয়ে পড়ো যাদুরা।'

তাদের গর্ভধারিণী আড়ানা-বাহারে বলে উঠলেন,—"বাছাদের কি খেতেও দেবে না,—এখনো পাঁচখানাও যে পেটে পড়েনি। তোমার তাড়ায় বর্সোন পর্যন্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে দিচ্ছে।"

অর্থাৎ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেশ আর কচুরী, দুয়ের সেবাই চলছে। যাক্, চুল ফিরিয়ে, পাঞ্জাবী পরে, পম্পস্থ মেরে গরু-খোঁজা বেশ সেরে, চট্ করে বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়লো।

বাতের তেলের বিদ্‌খুটে গন্ধ সারাদিন ভোগ করার পর, সহসা সুমধুর সৌরভে ঘরটা ভরে যাওয়ায়, নিশ্বেস টেনে —আঃ! কি আরামই পেলুম! ছেলেরা বোধ হয় রুমাল টেনে মুখ মুছতে মুছতে গেল। গিন্নীকে ডেকে বল্লুম,

—"কচুরীগুলো সবই ফেলে গেল নাকি? রেখে দাও, এসে খাবে'খন।"

বললেন,—"গোণাগুণ্‌তি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমত্ত বয়েস," ইত্যাদি বহুৎ।

বল্লুম—"যাক্, বোধ হয় ভালই হয়ে থাকবে।"

বল্লেন—"মন্দ হলে ওরা মুখে করত কিনা!"

"রাম কহো, ওরা সে ছেলেই নয়!"—পুত্রগর্কেই বোধ হয় আবার বাতের বেদনা ভুলে গেলুম। চিন্তায় চুর হয়ে কেবল কালা-গরুই ভাবছি—সাতটা বাজলো, আটটায় ঘা দিলে, এই আসে। গরু এল না, নটার আওয়াজ এলো! কান দুটো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। সে কী প্রতীক্ষা!

তদুপরি ব্রাহ্মণী তর্জ্জন সহ বল্লেন (যেহেতু পেন্‌সন আর তর্জ্জন কবিতায় শ্রেষ্ঠ মিল না হলেও উভয়ে পরম আত্মীয়)—"ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে গেল, এখন তারা ফিরলে বাঁচি। কেবল গরু, গরু, আর গরু, আর সোনার চাঁদ ছেলেরা হল ওঁর গরুর চেয়ে কম।"

"কি বলছ গো! এমন কথা আমি কখনো ভুলেও যে ভাবিনি। আর যা বলো বলো, এত বড় মিথ্যা অপবাদটা আমাকে দিওনা গিন্নি।"

একখানা মোটর এসে সশব্দে থামলো। এত রাতে আবার কে! বোধ হয় রতিম মিঞা বিজয়ার নমস্কার করতে এসেছে, মোটরে আর কে আস্‌বে! সে আমাদের সইস্ ছিল, এখন তার সময় ভাল। আজ দু'বছর আসছে, শুধু হাতে আসবার লোক সে নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে, ধামা চেঙ্গারি লুকিয়ে রাখ্‌তে ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশঃ—

"পাঁচ টাকা দশ আনা Taxi-ভাড়াটা চট্ করে দিন তো। বেটাকে দু'টাকা দেবে, না আরো কিছু! দিন্, আর দেরি কর্‌বেন না, বজ্জাৎ বেটা লাভের দু'গণ্ডা টেনে নেবে, দিন্।"

ভাঙ্গানো ছিল না, ছ'টাকাই হাতে দিতে হল।

"শ্যামলীকে কোথায় পেলি ?"

"সে অনেক কথা—বলচি," বলেই বেরিয়ে গেল।

যাক্, গাভিন গরুটা যে পাওয়া গেছে সেইটেই পরম শান্তি, দুর্ভাবনা গেল। উপরি লাভ 'পাইভরের' পরিমল। অকৃত্রিম মহামাষ তেলটা খানিকক্ষণ মগজ মথন করবে না।

পাশের ঘর থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ জুড়িয়ে দিতে লাগলো! স্বকৃত ব'লে সে কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি! সংসারের সুখই এই! সবই ভাগ্যসাপেক্ষ! দেখনা, এরা আদিতে কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে, 'গৌড়জন যাহে'—বুঝেছ তো—

গুণ্ গুণ্ রবে, কেমন সুখেতে সব
মধু পান করে!

নয় কি! আবার—God forbid, অন্তেও কেউ থাকবে না; অবশ্য আমার প্রাণান্তের পর!

একেই বলে—ভগবৎলীলার শিলাবৃষ্টি। আদিতে জল, অন্তে জল, মধ্যে মাথা সামলাও!

যাক্, আনন্দোচ্ছ্বাস কিনা, সামলাতে পারিনে।

মোদ্দাটা শুনলুম—বাবাকে চট্ করে' নিশ্চিন্ত করবার জন্য বাবাজীরা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হন। হোটেল, বায়স্কোপ, 'কিন্নরী' সেরে ইডেন ঘুরে হয়রাণ হয়ে ফিরেছেন। বলছেন—গড়ের মাঠে যে গরু মেলেনা, সে গরুই নয়। এক গন্ধবণিক বন্ধু ব'লে দিয়েছেন,—"মহামাষ তেলের গন্ধেই গরু পালিয়েছে, তোমরা সাবধান। একটা ক্যানেল্সা ওয়াটার কিনে নিয়ে যাও।" দেড় টাকা দিয়ে কিনতেই হল। সে গরু আর ফিরছে না। বাবার দোষেই তো এইটি হল! ও তেল আর মাখতে দিচ্ছিনে, বাথ্গেট্ থেকে দু'বোতল নিয়ে তবে ফিরেছি! মাথায় মাখাই তাঁর দরকার, সোজা কথাগুলিও আর ওঁর মাথায় আসছে না। রোজ এক টাকার দুধ কিনলেই হয়,—তা বুঝবেন না!

বামাস্বর শোনা গেল,—"আগে তো এমন ছিল না, কাছারী যাওয়া ঘুচিয়ে এসেই বুদ্ধিশুদ্ধি বিগড়ে গেল। এক হাবাতে বাত জুটিয়ে দিনরাত বসে আছেন, বেরুতে বললেই বেদনা বাড়ে। দুধ কেনবার কথা পড়লেই বলে বসে আছে—টাকা আসবে কোথা থেকে?"

বাবাজী বলে উঠ্লেন—"সে তুমি ভেবনা মা,—যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি।"

শুনলে ভায়া! গরু গেল, গরু-খোঁজার মোটর ভাড়া গেল, উপরন্তু সাত সেলামী! এখন "চিন্তামণি" বানিয়ে রেখেছে! যা চাইবে যোগাতেই হবে। নান্য পন্থা—বেঁচে থাক্তে—বিদ্যতেঽয়নায়! কি বল?

বলব আর কি, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, একটু হাল্কা বোধও করলুম।

বন্ধু আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে করে নিয়ে গেলেন সেটা আমাকে বেদনাই দিলে।

তাঁর রুটিনের বপট্ শুনে শিউরে উঠেছিলুম।

এখন উপায়?

ভাবলুম—পেন্সনারের পিঁজ্রাপোলে যাওয়াই ভাল! কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

ওঁ শান্তিঃ!

—সবুজ পত্র, মাঘ, ১৩৩৩

"ভগবতী তো বটেই, এটা ছেলেদের কাছে প্রমোশন-পাওয়া খেতাব!"

"বুঝতে পারলুম না তো।"

খুব সোজা,—ঠেকে একটু কঠিন বটে। এই পেন্‌সন নেবার পরের কথা গো, তখন দেশেই ছিলুম। গরুটা সাত মাস গাভিন, কি করে বেরিয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা হয়, ফেরে না। চঞ্চল হতে হল। হলে আর হবে কি, বাতে কাত করে রেখেছে। যাহোক, সুক্ষণে কি কুক্ষণে, কড়াই সুঁটির কচুরী হতে দেরী হওয়ায়, বাবাজীরা আট্‌কে গিয়েছিলেন, তখনো বাড়ী ছিলেন। বল্‌লেন—"ভাবছেন কেন, আমরা দেখছি।" শুনে কতটা সাহস আর আনন্দ পেলুম, বুঝতেই পারছ। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম। বাতের বেদনা ভুলে গেলুম, আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এলো। পুত্রহীনদের জন্যে পরম আপশোষ অনুভব করতে লাগ্‌লুম। আহা, তারা কি দুর্ভাগা! মজ্জায় মজ্জায় মনে হল—পুত্র plus পেন্‌সন্ equal to Paradise। বললুম—

'তাহলে আর দেরি করিসনে বাবা, কালা-গরু সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া শক্ত হবে। হিঁদুর দেশ, কোন্ বেটা বেড়ো মেরে খেঁড়ো গাইটে সাবাড় করে দেবে; বেরিয়ে পড়ো যাদুরা।'

তাদের গর্ভধারিণী আড়ানা-বাহারে বলে উঠলেন,—"বাছাদের কি খেতেও দেবে না,—এখনো পাঁচখানাও যে পেটে পড়েনি। তোমার তাড়ায় বসেনি পর্য্যন্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে দিচ্ছে।"

অর্থাৎ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেশ আর কচুরী, দুয়ের সেবাই চলছে। যা'ক, চুল ফিরিয়ে, পাঞ্জাবী পরে, পম্পস্যু মেরে গরু-খোঁজা বেশ সেরে, চট্ করে বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়লো।

বাতের তেলের বিদ্‌খুটে গন্ধ সারাদিন ভোগ করার পর, সহসা সুমধুর সৌরভে ঘরটা ভরে যাওয়ায়, নিশ্বেস টেনে —আঃ! কি আরামই পেলুম! ছেলেরা বোধ হয় রুমাল টেনে মুখ মুছতে মুছতে গেল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে বল্‌লুম, —"কচুরীগুলো সবই ফেলে গেল নাকি? রেখে দাও, এসে খাবে'খন।"

বল্‌লেন,—"গোণাগুণ্‌তি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমত্ত বয়েস," ইত্যাদি বহুৎ।

বললুম—"যাক্, বোধ হয় ভালই হয়ে থাকবে।"

বল্‌লেন—"মন্দ হলে ওরা মুখে করত কিনা!"

"রাম কহো, ওরা সে ছেলেই নয়!"—পুত্রগর্ব্বেই বোধ হয় আবার বাতের বেদনা ভুলে গেলুম। চিন্তায় চুর হয়ে কেবল কালা-গরুই ভাবছি—সাতটা বাজলো, আটটায় ঘা দিলে, এই আসে। গরু এল না, নটার আওয়াজ এলো! কান দুটো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। সে কা প্রতীক্ষা!

তদুপরি ব্রাহ্মণী তর্জ্জন সহ বল্‌লেন (যেহেতু পেন্‌সন আর তর্জ্জন কবিতায় শ্রেষ্ঠ মিল না হলেও উভয়ে পরম আত্মীয়)—"ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে গেল, এখন তারা ফিরলে বাঁচি। কেবল গরু, গরু, আর গরু, আর সোনার চাঁদ ছেলেরা হল ওঁর গরুর চেয়ে কম।"

"কি বলছ গো! এমন কথা আমি কখনো ভুলেও যে ভাবিনি। আর যা বলো বলো, এত বড় মিথ্যা অপবাদটা আমাকে দিওনা গিন্নি।"

একখানা মোটর এসে সশব্দে থামলো। এত রাতে আবার কে! বোধ হয় রহিম মিঞা বিজয়ার নমস্কার করতে এসেছে, মোটরে আর কে আসবে! সে আমাদের সইস্ ছিল, এখন তার সময় ভাল। আজ দু'বছর আসছে, শুধু হাতে আসবার লোক সে নয়।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে, ধামা চেঙ্গারি লুকিয়ে রাখ্‌তে ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশ:—

"পাঁচ টাকা দশ আনা Taxi-ভাড়াটা চট্ করে দিন তো। বেটাকে ছ' টাকা দেবে, না আরো কিছু! দিন্, আর দেরি কর্‌বেন না, বজ্জাৎ বেটা লাভের ছ'গণ্ডা টেনে নেবে, দিন্।"

ভাঙ্গানো ছিল না, ছ'টাকাই হাতে দিতে হল।

"শ্যামলীকে কোথায় পেলি ?"

"সে অনেক কথা—বলচি," বলেই বেরিয়ে গেল।

যাক্, গাভিন গরুটা যে পাওয়া গেছে সেইটেই পরম শান্তি, দুর্ভাবনা গেল। উপরি লাভ 'পাইভরের' পরিমল। অকৃত্রিম মহামাষ তেলটা খানিকক্ষণ মগজ মথন করবে না।

পাশের ঘর থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শ্রবণ জুড়িয়ে দিতে লাগলো! স্বকৃত ব'লে সে কি একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি! সংসারের সুখই এই! সবই ভাগ্যসাপেক্ষ। দেখনা, এরা আদিতে কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে, 'গৌড়জন যাহে'—বুঝেছ তো—

গুণ্ গুণ্ রবে, কেমন সুখেতে সব
মধু পান করে!

নয় কি। আবার—God forbid, অন্তেও কেউ থাকবে না, অবশ্য আমার প্রাণান্তের পর!

একেই বলে—ভগবৎলীলার শিলাবৃষ্টি। আদিতে জল, অন্তে জল, মধ্যে মাথা সামলাও!

যাক্, আনন্দোচ্ছ্বাস কিনা, সামলাতে পারিনে।

মোদ্দাটা শুনলুম—বাবাকে চট্ ক'রে নিশ্চিন্ত করবার জন্য বাবাজীরা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হন। হোটেল, বায়স্কোপ, 'কিন্নরী' সেরে ইডেন ঘুরে হয়রাণ হয়ে ফিরেছেন। বলছেন—গড়ের মাঠে যে গরু মেলেনা, সে গরুই নয়। এক গন্ধবণিক বন্ধু ব'লে দিয়েছেন,—"মহামাষ তেলের গন্ধেই গরু পালিয়েছে, তোমরা সাবধান। একটা ক্যানেঙ্গা ওয়াটার কিনে নিয়ে যাও।" দেড় টাকা দিয়ে কিনতেই হল। সে গরু আর ফিরছে না। বাবার দোষেই তো এইটি হল! ও তেল আর মাখতে দিচ্ছিনে, বাথ্‌গেট্‌ থেকে দু'বোতল নিয়ে তবে ফিরেছি! মাথায় মাথাই তাঁর দরকার, সোজা কথাগুলিও আর ওঁর মাথায় আসছে না। রোজ এক টাকার দুধ কিনলেই হয়,—তা বুঝবেন না!

বামাস্বর শোনা গেল,—"আগে তো এমন ছিল না, কাছারী যাওয়া ঘুচিয়ে এসেই বুদ্ধিশুদ্ধি বিগড়ে গেল। এক হাবাতে বাত জুটিয়ে দিনরাত বসে আছেন, বেরুতে বললেই বেদনা বাড়ে। দুধ কেনবার কথা পড়লেই বলে বসে আছে—টাকা আসবে কোথা থেকে?"

বাবাজী বলে উঠ্‌লেন—"সে তুমি ভেবনা মা,—যে খায় চিনি, তাকে যোগান চিন্তামণি।"

শুনলে ভায়া! গরু গেল, গরু-খোঁজার মোটর ভাড়া গেল, উপরন্তু সাত সেলামী! এখন "চিন্তামণি" বানিয়ে রেখেছে! যা চাইবে যোগাতেই হবে। নান্য পন্থা—বেঁচে থাকৃতে—বিদ্যতেঽয়নায়! কি বল?

বলব আর কি, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, একটু হাল্‌কা বোধও করলুম।

বন্ধু আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে করে নিয়ে গেলেন সেটা আমাকে বেদনাই দিলে।

তাঁর রুটিনের রপট্ শুনে শিউরে উঠেছিলুম।

এখন উপায়?

ভাবলুম—পেন্‌সনারের পিঁজ্‌রাপোলে যাওয়াই ভাল! কাশী রওনা হয়ে পড়লুম।

ওঁ শান্তিঃ!

—সবুজ পত্র, মাঘ, ১৩৩৩

বাণী

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একটা উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে যুবকটি নেমে আসচে। তার দু'হাত দিয়ে বুকের ওপর একরাশ ফল ধরা। পরণে গাছের ছাল,—কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত জড়ান।

পাদমূলে এক বৃদ্ধ, প্রসন্ন সহাস্য মুখ, দীর্ঘ চুল, দীর্ঘ দাড়ি— সাদা ধপ-ধপে, জ্যোতির্ম্ময়! বোধ করি যুবকের আগমন প্রতীক্ষাই করছিলেন।

যুবক কাছে আসতে বল্লেন, চিনতে পারো?

অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল যুবক তাঁর দিকে;—যেন জীবনে এ বৃদ্ধ আর দেখে নি।

তিনি আবার বল্লেন, কি গো চিনতে পারো না?

নাঃ, বলে যুবক ব্যস্ততার সঙ্গে চলে গেল।

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ হেসে বল্লেন, স্মৃতির মূল্যের চেয়ে বিস্মৃতির দাম একটুও কম নয় ত!

২

একটা ছোট পার্ব্বত্য নদী পেরিয়ে যুবক হঠাৎ দেখতে পেলে—বৃদ্ধ তার দিকে স্নেহ-শান্ত চোখ দুটি মেলে দাঁড়িয়ে আছেন।

এবার সে-ই প্রথম কথা কইলে, তুমি কে?

আমি—আমি? বৃদ্ধ ভাবতে লাগলেন।

আত্ম-পরিচয় দেবার কি আছে তাঁর? সেই কথা ভেবেই বিহ্বল হ'য়ে রইলেন তিনি!

কোথায় থাক তুমি?

কোথায়? বৃদ্ধ ভাব্‌লেন, কোথায়? আকাশে? না বাতাসে? না পৃথিবীতে?—এবারেও উত্তর জোগাল না।

যুবক একটু রাগ করে' বল্লে, কাণে কম শোন বুঝি?

বৃদ্ধের মুখ ক্ষমার হাসিতে ভরে' গেল;—চোখ দু'টো তারই উচ্ছ্বাসে প্রায় বুজে যায় আর কি!

অত দেরী করার আমার সময় নেই—বলে, যুবক অগ্রসর হ'তে যায়-যায়, এমন সময় গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ বল্লেন, কোথায় যাবে তুমি?

সে ফিরে বল্লে,—যাবে? এসো না কেন!

আমি ধীরে ধীরে যাবো—তুমি এগোও।

একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে যুবক বল্লে, কি করে' চিন্‌তে পারবে?

তোমার পায়ের চিহ্ন দেখে।

যুবক মনে মনে লজ্জিত হ'লো—ওঃ তাইত, এ কথা না জিজ্ঞেস্ করেও ত' আমিও ঠিক করে' নিতে পারতুম।

৩

যুবক ত্বরিত পদে এসে চেঁচিয়ে বল্লে, ওগো, ওগো, শুনচো দেখো——ও গো—

ক্ষীণ রমণী-কণ্ঠে উত্তর এলো,—এই যে, বলনা; শুনচি, কি হয়েচে কি?

উচ্চ হাস্য করে' যুবক বল্লে, ভারি মজা—বলে' আবার হাস্‌তে লাগ্‌লো।

একটা প্রকাণ্ড বটগাছের তলায়—ঘাসের গদির ওপর মেয়েটি বসে ছিল, তার কোলে ননীর পুতুলের মত একটি ছেলে—মার দুধভারে আধ-ফাটা ডালিমের মত একটা মাই খাচ্চে—আর একটা মাই, পুষ্ট দুটো পা দিয়ে দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করচে।

মেয়েটিও যুবকের আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিয়ে—কারণ না জেনেও—এক চোট খুব হেসে নিলে।

কি হয়েচে বলতো?

ওঃ, এক মহা-বুড়ো!—বলে, চিন্‌তে পারো? কি বলবো? উত্তর না দিয়ে চলে গেলাম। ফের নদী পেরিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে হাসচে। এবার আমিও ছাড়বার পাত্তর নই। বল্লুম, কেহে তুমি? কিছু বলে না ভাই,—বুড়ো ভোম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কোথায় থাক তুমি? কোন উত্তর নেই! শেষ-কালে আমায় বল্লে, কোথা যাচ্ছ?—বল্লুম, যাবে ত এসো—এখখুনি আসবে কিন্তু,

বলে দিচ্চি—ভারি মজার—এমন কখ্‌খনো দেখিস্‌নি তুই।

ওমা! ঐ যে তিনি—ঐ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে—আমাদের কথা শুনে শুনে হাস্‌চেন।

কইরে—কই!

৪

বৃদ্ধ মানবের আদিম আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন।

পায়ের তলার ঘাস-ফুলগুলো পর্য্যন্ত যেন বিলসিত হয়ে উঠ্‌লো। ডুবন্ত সূর্য্যের হেম-কিরণে পৃথিবী হঠাৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। বাঁশের উঁচু শিখর, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, তারই মাটির উপর লুটিয়ে পড়তে চায়! বেণুবনে বাতাস আনন্দগীত সুরু করে দিলে।

বৃদ্ধ বল্‌লেন, শোন তোমরা নর-নারী—তোমরা অমৃতের সন্ততি! আনন্দ তোমাদের উদ্ভবের হেতু, তোমরা প্রেমের ব্যাহৃতি! কর্ম্মে তোমাদের ধৃতি, ত্যাগ তোমাদের পরামুক্তি! ধরণী তোমাদের লীলাক্ষেত্র,—মহাব্যোমবিস্তৃত জানে তোমাদের প্রগতি!

এই কথা শুনে পুরুষ ছুটো ফল তাঁর হাতে তুলে দিলে! নারী তার সন্তানটিকে তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে—অশ্রুধারে বুক ভেজাতে লাগ্‌লো। বৃদ্ধ শিশুর ললাটে চুম্বন দান করে' তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তারপর নির্ব্বাক গাম্ভীর্য্যে বৃদ্ধ যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথে—চিরদিনের জন্য লোকচক্ষুর অগোচর হ'য়ে গেলেন।

৫

গভীর রাত্রে পৃথিবী চাঁদকে বল্‌লে, শুনেছিস্‌?

কৈ, না?

এদের চিনিস্‌?

রোজ ত দেখি। এরা কে?

এরা অমৃতের সন্ততি।

এখেনে কে আন্‌লে?

আনন্দ।

সে কে?

প্রেমের প্রকাশ।

এদের কি ধর্ম্ম?

কর্ম্ম।

এদের মুক্তি কোথায়?

ত্যাগে।

এদের বিস্তার?

পৃথিবী থেকে মহাব্যোমে!

চাঁদ সেই কথাই আজও ভাবচে।

পৃথিবীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে—গুপ্ত-বিবর থেকে কাল ফণা উদ্যত করে'—কে যেন গর্জ্জন করে' হলাহল বমন করে' বল্‌লে,—

এরা অভিশাপ-ব্যাহত। দৈন্যে এদের উদ্ভব। কর্ম্ম এদের শাসক। ত্যাগ এদের কপটতা। মৃত্যুতে এদের মুক্তি।

ধরিত্রী অধোবদন হ'য়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। লতায়-পাতায় তারই চিহ্ন—আজো খুঁজে পাই। *

---

* অধুনালুপ্ত 'সংহতি' হইতে।

মৃত্যু-জয়ী

হাফেজ্

তোমায় ভালবাসি বন্ধু—

এ ভালবাসার বিনাশ নেই।

অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে যাকে ধরে' রেখেছি, সযত্নে সঙ্গোপনে যাকে লালন করেছি,—তার আর পালাবার পথ কোথায়?

আমার এই দেহের প্রতিটি রক্তকণা তোমায় চায়—তোমার স্পর্শ চায়, তোমার আলিঙ্গন চায়।—অগ্নিবর্ণ তোমার রূপের রশ্মিতে অন্তরের জ্যোতির্ম্মঞ্চ আমার সমুজ্জ্বল হয়ে উঠুক্!

তোমারই আগমন প্রতীক্ষায় প্রাণ যে আমার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে আছে প্রিয়তম,—মত্ততা বল আর যাই বল,—তুমি এসো!

সর্ব্বনাশা এই ভালবাসার মৃত্যু আছে নাকি?

ভালবাসার তীব্র বহ্নি হয়ত আমার মাতৃস্তন্যে ছিল,—জীবনের প্রথম উষায় হয়ত তাই পান করেছি বন্ধু! আশা নেই,—এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হবার আশা বুঝি আর নেই।

হতে পারে,—নির্ব্বাপিত হবে হয়ত জীবনের সেই শেষ-সন্ধ্যায়।

কিন্তু অনাদিকাল থেকে তোমার জন্যে এই যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা আমার,—এরও কি শেষ নেই বন্ধু?

বিরহের এ বিষ-যন্ত্রণার কি চিকিৎসা হয় না নাকি?

চিকিৎসায় যত বেশি যত্নবান হই যন্ত্রণা যেন তত বেশি বাড়ে।

এ শহরে আমিই বুঝি প্রথম।

বিরহ-যন্ত্রণায় যে সকরুণ আর্ত্তনাদ সর্ব্বপ্রথম গগন স্পর্শ করেছিল সে কার কণ্ঠনিঃসৃত জানো?

...আমার।

আমারই এই ব্যথিত বঞ্চিত হৃদয় মন্থন করে প্রিয়ার উদ্দেশে সকাতর একটি বাণী ফুটেছিল।—"এসো প্রিয় আমার, এসো বন্ধু এসো।"

আজও সে আহ্বানের প্রতিধ্বনি জাগে—।

জাগে—প্রতি রজনীর নিদ্রাহারা নীরব নিশীথে, বায়ু-হিল্লোলে কেঁপে কেঁপে ধূমল আকাশের খিলানে খিলানে ঘুরে বেড়ায়।

আমি কেঁদেছি।—জিন্দা-নদীর তীরে বসে কেঁদেছি আমি তোমার উদ্দেশে। জিন্দার প্রবহমান স্রোতে আমার লবণাক্ত অশ্রুজল মিশে আছে,—ইরাক্ প্রদেশের কৃষিক্ষেত্র উর্ব্বর হবে।

দেখেছি প্রিয়তম, জিন্দার তীরে বসে তোমায় আমি দেখেছি।

অশ্রুসিক্ত আমার এই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তোমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি আমি যেন চুরি করে' দেখেছি বলে' মনে হয়।

—চাঁদের মত মুখ গো সখী, চাঁদের মতন মুখ, আর মেঘের বরণ চুল!

এসো বন্ধু এসো···

এসো নিষ্ঠুর এসো!

হয়ত আসবে না···হয়ত এলে না।

জীবন আমার বৃথা কাটলো বন্ধু!

তবু চাই—চাই—আমি চাই।

মরণের পরও যদি এসো প্রিয়তম,—হাফেজের সমাধি-মৃত্তিকায় তোমার চরণ-চিহ্ন যদি পড়ে কোনোদিন, তোমার ওই অতীব নিষ্ঠুর দুটি চরণ চুম্বনের আশায় সমাধি-গর্ভ হতে হাফেজের মৃত আত্মা মাথা তুলে উঠবে।

অবিনশ্বর প্রেম যে আমার মৃত্যুঞ্জয়ী!

বিজিত জাতির শিক্ষা

গুস্তাভ লৈ বঁ

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি উপনিবেশে গিয়ে তত্রত্য ইতর জাতিদের এত ক্ষতি করেছে যে ফ্রান্সের ক্ষতি তার কাছে নগণ্য। এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম ফল—যারা যারা ফরাসী শিক্ষা পেয়েছে, তারা তাদের জাতির এবং আমাদের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মঃ পল গিয়ঁা ইণ্ডোচায়না শাসন কালে, বিদেশী জাতির শিক্ষা-সম্বন্ধে যে সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছেন, সেই সব কথা কিছু কিছু তুলে দেওয়া হল। মঃ গিয়ঁার কথাই আমি পাঠকবর্গের সামনে ধরলুম।—

"উপনিবেশ সমূহে ইউরোপীয় শিক্ষা ও শিক্ষা-সাধনার প্রচারে কি ফল হয়েছে, তা দেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে সমস্ত ইউরোপীয় জাতি—ফরাসীরা পর্য্যন্ত বিদেশী জাতির শিক্ষা-সমস্যা সমাধান করতে একেবারেই পারে নি।

"এক জাতির শিক্ষা ও শিক্ষা-সাধনা অপর জাতির পক্ষে অবোধ্য ও গ্রহণ করবার অযোগ্য। যেমন একজন বালকের সামনে একজন প্রৌঢ়ের আদর্শ ধরলে সে তার কিছুই বুঝতে পারে না, সেই রকম একটা বালক-জাতি

অপর একটা প্রৌঢ়-জাতির শিক্ষা-সাধনা একেবারেই গ্রহণ করতে পারে না। বালক তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর থেকে নিজে যে আদর্শটিকে গড়ে নিয়েছে তার সামনে সেই রকম বা তার চেয়ে একটু উঁচু আদর্শ ধরলে সে যেমন তা গ্রহণ করতে পারে, একটা বালক-জাতিকে তার নিজের আদর্শ মত বা তার চাইতে একটু উঁচু একটা শিক্ষা-সাধনা দিলে, সে সেটা বুঝতে পারে এবং তাতে তার উপকারও হয়। কিন্তু উঁচু হলেও যেমন আদর্শটা বালকের ধাতের, বা তার নিজের গড়া আদর্শের মত হওয়া চাই, সেইরূপ একটু উঁচু শিক্ষা দিলেও শিক্ষাটা বিজিত জাতির ধাতের, তার নিজের দেশের শিক্ষা-সাধনার অনুযায়ী হওয়া চাই।

"কিন্তু আমরা মনে করি যে সব জাতিই সমান—তার মধ্যে বালক প্রৌঢ়ও নেই, পর ও আপনও নেই। এই ভুল ধারণা বশে আমরা অপর জাতির শিক্ষার নাম করে' তাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, সংস্কার, রীতি, নীতি এমন কি আত্মাটাকে পর্য্যন্ত ভেঙে গড়তে চেষ্টা করেছি—এক কথায় তাদের গ্রাস করতে গেছি। আমরা শিক্ষার দ্বারা তাদের জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার দ্বারা গঠিত এবং স্থান কাল ও ইতিহাস দ্বারা পরিপুষ্ট, জাতীয় আদর্শ ও জাতীয় জীবনটাকে ভাঙতে গিয়ে কিছু ত ভাল করতে পারিই নি বরং যারপর নাই তাদের ও আমাদের মন্দ করেছি। পৃথিবীময় যে সমস্ত ইউরোপীয় জাতির উপনিবেশ সমূহে এমন ভীষণ ভাবে সর্ব্ব প্রকার বিপ্লববাদ দেখা দিয়েছে, বিদেশী জাতির উপর ইউরোপীয় শিক্ষা-সাধনা চাপান তার একটা কারণ। বিপরীত একটা সভ্যতার অতর্কিত আঘাতে বিজিত জাতিদের সুপ্ত আত্মা হঠাৎ বীভৎস ভাবে জেগে উঠেছে—তোমাদের ও তাদের ধ্বংস করবার জন্যে। আমাদের শিক্ষা পেয়ে তারা আমাদের ও তাদের উভয় সমাজেরই ভীষণ শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রমাণ যে কোন দেশের একদিনের একখানা খবরের কাগজ খুললেই পাওয়া-যাবে।—জাতিগত ভ্রমের এর চাইতে আর কি শোচনীয় পরিণাম হতে পারে?

"আমাদের একটা মস্ত ভুল ধারণা এই যে শিক্ষা-সাধনাটা সাধারণ শিক্ষার ভেতর দিয়ে প্রদান করা যায়। কিন্তু সাধারণ শিক্ষাটা বুদ্ধির স্মৃতিশক্তির সাহায্যেই আমরা গ্রহণ করে থাকি। এতে যে চরিত্রের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না, তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা-সাধনাটা—যেটাই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ—বুদ্ধি ও স্মৃতি দিয়ে তা গ্রহণ করবার কাজ নয়। সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে, অপরের চরিত্রের ও কার্য্য-কলাপের দৃষ্টান্ত দেখে দেখে তবে লোকে গ্রহণ করতে পারে। দেখে-করেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়।

"সাধারণ শিক্ষা দিয়ে অপর একটা জাতির চরিত্র গড়া বা বদলান ছাদ থেকে ইমারৎ গড়াবার কল্পনার মত ভিত্তি-হীন। শূন্যে একখানা ইটও ধরে না—পরন্তু ইট মাথায় পড়ে' মাথা ভাঙে। তার উপর দ্বিগুণ দোষ হয় তখন যখন আবার সেই সাধারণ শিক্ষাটা একটা বৈদেশিক ভাষার ভিতর দিয়ে দেওয়া হয়।

"প্রত্যেক ভাষায় প্রত্যেক শব্দের পেছনে একটা দল-ভাব, অনুভূতি, সংস্কার ও দর্শন আছে—অপর ভাষায় যেটার যেটার প্রতিশব্দ মেলা ভার। বিভিন্ন দেশে এমন কি একই দেশে বিভিন্ন সময়ে একই কথার বিভিন্ন এমন কি বিপরীত অর্থ হয়। ধরুন সৌন্দর্য্য—এ কথাটা একজন ভীল, একজন রেড ইণ্ডিয়ান, একজন হিন্দু, একজন ইউরোপীয়ান ও একজন চীনেম্যান কি একভাবে বোঝে? একজন মধ্য যুগের ফরাসী ঐ কথাটার মানে যা বুঝত, আজকালকার একজন ফরাসী কি তাই বোঝে? ধর্ম্ম বা ন্যায়—এই কথাটা বল্লে কি একজন মুসলমান, একজন খৃষ্টান ও একজন হিন্দু বা বৌদ্ধর মনে একই ভাবের উদয় হয়?

"যখন একটা জাত অপর একটা জাতের ভাষা শিক্ষা করে—সে দায়ে পড়েই হ'ক আর ইচ্ছা সুখেই হ'ক—সে উক্ত ভাষার কথাগুলো নিতে পারে বটে, কিন্তু ভাবগুলো নিতে পারে না বলে আপন জন্মজন্মান্তরের ভাব দিয়েই কথাগুলোর মানে বদলে নেয়।

"ভাষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতির মনের এবং মস্তিষ্কের একটা ক্রমপরিবর্ত্তন হয়েছে। মস্তিষ্কের ঘুরানো ঘুরানো রেখা ও খাঁজ গুলো কোটি কোটি বৎসরের ক্রমবিকাশের ফল। তাই একটা জাতের মস্তিষ্ক যেমন আর একটা জাতের মাথার খুলির ভেতর তৈরী ক'রে দেওয়া যায় না, সেই রকম একটা জাতের শিক্ষা-সাধনা আর একটা জাতে গ্রহণ করতে পারে না। তাই একটা ভাষা অপর একটা জাতির ভাব প্রকাশের বা শিক্ষার মিডিয়ম হ'তে পারে না। একটা জাতি অপর একটা জাতির ভাষা, সাধনা বা অন্য যা-কিছু নেবার সময় তার নিজের মতন করে পরিবর্ত্তিত করে, তবে হজম করে। গেলেরা লাতিন ভাষা নিয়ে বর্ত্তমান ফরাসীতে দাঁড় করিয়েছে, মার্ত্তিনিক ও গোধুলুপের কাফ্রিরা ফরাসী ভাষাকে নিয়ে এক দুর্ব্বোধ্য 'ক্রেঁয়ল' বা সঙ্কর ভাষার সৃষ্টি করেছে।

"উপরের কথা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে একটা বৈদেশিক ভাষায় একটা বৈদেশিক শিক্ষা-সাধনা অপর একটা জাতির ঘাড়ে চাপালে কি ফল হয়! এই ফলটা আমরা প্রত্যক্ষভাবে ইণ্ডো-চায়নায়, আফ্রিকায়, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র দেখলুম।

"একটা উলঙ্গ কাফ্রি যদি আর একটা উলঙ্গ কাফ্রিকে কামড়ে দেয়, তার স্বাভাবিক সাজা হচ্ছে ঐ বাদী কাফ্রিটাকে দিয়ে প্রতিবাদী কাফ্রিটাকে আর একবার কামড়ে দিতে বলা। তাদের দেশের সর্দ্দাররা এই ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে। যদি নেহাৎ খৃষ্টানী সভ্যতা দেখাতে হয় ত প্রতিবাদীকে ঘা কতক বেত মেরে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। একজন হিন্দু বা আনামিতের যদি জমি নিয়ে কোনো নালিস হয় ত চিরকাল তাদের মোড়ল বা জমিদার ১৫ মিনিটের মধ্যে প্রায় বিনা ব্যয়ে একটা মীমাংসা করে' দিয়ে এসেছে। এখন যদি ঐ হিন্দু বা আনামিতকে সাত ভলুম "কোদ্‌নো পোলেঁয়"-খুলে ১৭ নম্বর মামলা করতে হয়, অথবা উলঙ্গ কামড়-খাওয়া কাফ্রিকে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করতে বলা হয় ত তাতে হিন্দু বা কাফ্রি কারো মনস্তুষ্টি ত হয়ই না, পরন্তু কোন ক্রমে এই মামলা করা ধাতটা তাদের চরিত্রে ঢুকলে তাদের ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ হয় মাত্র।

"আমরা ইতিহাস লেখবার সময় বেশ স্বীকার করি একটা জাত অপর একটা জাতের সভ্যতা নেবার সময় অব্যর্থভাবে সেটাকে পরিবর্ত্তন করে' ফেলে। 'আনামিতদের' ইতিহাসেও আমরা দেখেছি যে হিন্দু (বৌদ্ধ) সভ্যতা নিয়ে 'আনামিতরা' তাকে এতদূর পরিবর্ত্তিত করেছে যে তাকে আর হিন্দু ব'লে চেনবারই জো নেই। কিন্তু আমাদের বেলাই আমরা মনে করি আমাদের ইচ্ছা মাত্র আনামিতরা তাদের হাজার হাজার বৎসরের মাথাটাকে ফেলে দিয়ে একদিনে ফরাসী সাহেব হয়ে আমাদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা বা জাতীয়তার আদর্শ বুঝতে পারবে।

"কথাটা অনেক বেড়ে যায়; নইলে অতি সহজেই আমাদের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শটা আনামে ও পণ্ডিচারীতে গিয়ে কি আকার ধারণ করেছে তা দেখান যায়। আমাদের সভ্যতা ও 'আনামিতের' বা হিন্দুর মস্তিষ্ক—দুটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ জিনিষ। একটা অপরটার উপর চাপালে সর্ব্বপ্রকার ব্যভিচার এবং মানসিক ও সামাজিক ব্যাধির উৎপত্তি হবে।—পাহাড়ের দেশের কমলা গাছ নদীর চরে এনে পুঁতলে যেমন না কমলা না কাগ্‌জী এক উদ্ভট তিক্ত ও অত্যম্ল ফল প্রসব করে সেই রকম আমাদের দেশের ভাব ও আদর্শগুলো আনামিত, কাফ্রি ও হিন্দুদের মস্তিষ্কে রোপিত হয়ে তার চাইতে কটু ও অত্যুগ্ররস বিষফল প্রসব করেছে।

"যাই হ'ক, ভুলটা অল্পদিনের মধ্যেই ধরা পড়েছে। আর সভ্যতা বিস্তারের কথাটাও তাই তাড়াতাড়ি 'ব্রেক' করতে হয়েছে। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ফরাসী ভাষার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় শিক্ষা ও শিক্ষা-সাধনা প্রাচ্য দেশে প্রচার করবার জন্যে ইণ্ডোচায়নায় এক বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়। তাতে পাশ্চাত্য আইন, পাশ্চাত্য রাজনীতি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শেখাবার জন্যে বহু কলেজ স্থাপন করা হয়। ঠিক ভারতবর্ষের মত ইণ্ডোচায়নার বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ে ছেলে এবং মেয়েরা আচারভ্রষ্ট, ব্যভিচারী, উদ্ভট

মস্তিষ্ক এবং আপনাপন ধর্ম্ম ও সমাজের শত্রু হয়ে উঠেছে। যাই হ'ক, ভুলটা শীঘ্রই বুঝতে পেরে ১০ বৎসর যেতে না যেতেই ইণ্ডোচায়নার বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দেওয়া হয়েছে।

"প্রত্যেক জাতির—তার নিজের জীবনের ক্রমবিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট আইন ও পথ আছে। সে আইন ও পথটা কোনো জাতিই প্রাণপণ করেও বদলাতে পারে না। কিন্তু আমরা এতই বাস্তব সত্য থেকে দূরে বাস করি যে আমরা এমনও ভাবি যে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে' সবই হতে পারে।

"আমরা মনে করি জেনিসিসের ভগবানের মত আমরাও যদি বলি, আনামিত, তুমি ফরাসী হও, তা হলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তারা ফরাসী হয়ে যাবে; কাফ্রি, তুমি সুসভ্য হও, আর অমনি প্যাণ্ট কোট পরেই কাফ্রি সভ্যতার শিখরে উঠে দাঁড়াবে—এরকম জাতিগত ভুলের আর ওষুধ নেই!

"অতএব ভাল করেই বোঝা যাচ্ছে যে জন্মজন্মের জাতিগত সংস্কারের অনুযায়ী না হলে শিক্ষা-সাধনাটা একেবারেই কোনো কাজে আসে না।

"তা হ'লে বিজিত বিদেশী জাতিদের শিক্ষার উপায় কি? শিক্ষা-সাধনা বা সভ্যতা বিস্তারের কথা একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে—যতদিন না তারা নিজের মত একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারে ততদিন কেবল তাদের সাধারণ শিক্ষার ভার নিলে কিছু ভাল ফল ফলতে পারে। তাও সাধারণ শিক্ষাটা তাদের মতন করে' না দিতে পারলে কোনো ফল নেই। একটা ইতর অথচ নিম্ন স্তরের জাতির পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। আমাদের দেশের অনেক লোকে বুঝতে পারে না যে জাতির মধ্যে সভ্যতার দিক দিয়ে ছোট বড় বা বালক ও প্রৌঢ় আছে। অনেক সময় ও বহুযুগব্যাপী ক্রমবিকাশের ফলে তবে একটা বালক-জাতি প্রৌঢ় জাতির স্তরে উঠতে পারে। তা ছাড়া সমসভ্য বা সমবয়স্ক জাতির মধ্যেও জাতীয় সংস্কার বা মনস্তত্ত্বের এত প্রভেদ আছে যে একটা জাতির শিক্ষা-ভার অপর এক জাতির হাতে পড়লেও অতি সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের মধ্যেই তারা সুশিক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ বিদেশী জাতির শিক্ষার বিষয়-তালিকাদিতে দর্শন শাস্ত্র, নীতি শাস্ত্র, ব্যবহার শাস্ত্র, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়গুলির নাম থাকতে পারে না। কারণ ওগুলি জাতীয়তা ও জাতীয় মনস্তত্ত্বের এক একটি সৌধ—যার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ উভয় জাতির সম্বন্ধেই সর্ব্বতোভাবে ক্ষতিকারক।

"তা হ'লে আমাদের শিক্ষা দেবার থাকে কি? কেবল বিজ্ঞান, বিশেষতঃ আবশ্যকীয় বিজ্ঞান (Applied Sciences)। আর এর ভিতর অনেক কিছুই শিক্ষা দেবার আছে। তা ছাড়া আবশ্যকীয় বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতর দিয়ে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষের চিন্তাশক্তি, দর্শন শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, কর্ম্মৈষণা, সত্য-নির্দ্ধারণ শক্তি ইত্যাদি অনেক গুণের উৎকর্ষ সম্পাদন করতে পারা যেতে পারে। এইরূপে তাদের শিক্ষা-সাধনা বা সমাজ-সভ্যতার সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা না করে' বিদেশী জাতিদের বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা দিলে তাদের অসন্তোষের কোনোই কারণ থাকে না, বরং তারা দুপয়সা অধিক উপায় করে আপনাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পাবে, কল কারখানায় আমাদেরও সহায়তা করতে পারে এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ভিতর দিয়ে জগৎ সম্বন্ধে অনেক সত্য ও সার্ব্বজনীন জ্ঞান পেয়ে আবশ্যক বোধে আপনাপন মন ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে।

"তাই উপনিবেশে আমাদের প্রথম গিয়েই একটি শিল্প-শিক্ষার বিদ্যালয় খোলা দরকার। তারপর আবশ্যক বোধে একটি আবশ্যকীয় বিজ্ঞান-শিক্ষালয় এবং পরে বিজ্ঞান পরীক্ষাগার খোলা দরকার। জাপানীরা ঠিক এই রকম করে ইউরোপের মাত্র আবশ্যকীয় বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষাটা নিয়েছে। তাই এতে তাদের জাতীয় সত্তার কোনোই গোলমাল হয় নি। তারা যে জাপানী সেই জাপানীই আছে—কেবল বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে বৈজ্ঞানিক কল-কব্জা নাড়ে মাত্র।

"তাও ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক শিল্পের প্রবর্ত্তন করা উচিত। প্রথমতঃ তাদের দেশস্থিত শিল্পগুলো কেমন

করে' বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নত ও আয়কর করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। যেমন কৃষিপ্রধান দেশে প্রথম বিজ্ঞান সহায়ে কৃষির কেমন করে' উন্নতি করা যায় তা ভাবা দরকার। আবশ্যকীয় জিনিষ ছাড়া কোনো জিনিষ শেখাতে যাওয়া মিথ্যা ও অনাবশ্যক অর্থব্যয়। তাই যে জেলায় বেশী কামার আছে, সেই জেলায় একটা অপেক্ষাকৃত উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে কামারের কাজ শেখবার বিদ্যালয় খোলা দরকার। তাঁতি প্রধান জেলা, ছুতার প্রধান গ্রাম ইত্যাদির পক্ষেও সেই একই ব্যবস্থা। তা'ও একেবারে আমেরিকান ট্রেকেটর বা জার্ম্মাণ ক্রুপের কারখানা অথবা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল এনে বসালে হবে না। অনেক ভেবে চিন্তে ক্রমে ক্রমে লোকের আবশ্যকানুযায়ী একটু একটু উন্নততর পদ্ধতি ধ'রে ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে ক্রুপের কারখানায় এলে ফল ভালই হবে। জাপানে তাই হয়েছে। আমাদের দেশেও ত ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়েই ক্রুপের কারখানা হয়েছে।

"তাই বলি অনবরত বিদেশী বিজিত জাতির আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের আবশ্যকতা সৃষ্টি করলে চলবে না। তাহলে তারাও আমাদের ইউরোপের মত' অনাবশ্যক আবশ্যকতা বা "খাঁই"য়ের বিষচক্রে (vicious circle) পড়ে মারা যাবে। তাড়াতাড়ি বড় কল এনে বসালে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করব, এবং এশিয়া ও আফ্রিকাবাসী জাতির ভিতরে, ইচ্ছা করে, এমন সব সমস্যার সৃষ্টি করে' ফেলব যাতে উভয়কেই মারা যেতে হবে। এই রকম একটা ভুলের জন্য তংকিং'এর অনেক সুন্দর ছোট ছোট গৃহশিল্প আজ লুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু ক্রুপের কারখানার চাইতে এগুলো মানব-সভ্যতার কম একটা অবদান নয়।

"তাড়াতাড়ি বা বিপ্লব একেবারে নয়। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে চলতে হবে। তবেই আমরা বিজিত জাতিদের প্রকৃত কল্যাণ করতে পারব। প্রবর্ত্তিত নূতন শিল্পে বা দেশীয় গৃহশিল্পে—সর্ব্বত্রই অল্পে অল্পে ক্রমউন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিক্ষা প্রবর্ত্তনই মঙ্গলকর। এমন কি সভ্য আরব, হিন্দু বা আনামিত জাতিদেরও একেবারে জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়র বা ফরাসী ডাক্তার করে' তুলতে গেলে সেই গোড়ার ভুলই করা হবে। প্রথমে ভালো 'মেক্যানিক' বা কারিকর হতেই তারা শিখুক। তারপর উন্নততর সব কিছু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাই দেওয়া যেতে পারবে। কিন্তু বিজিত জাতির শিক্ষার সভ্যতা বিস্তারের কথাটা আমাদের একেবারে নির্ম্মম-ভাবেই ভুলে যেতে হবে, কারণ সভ্যতা আমাদেরই জন্যে—তাদের জন্যে নয়। *

অনুবাদক—শ্রী হারাধন বক্সী

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ডাক্তার গুস্তাভ লে বঁ (Dr. Gustave Le Bon) তাঁর "শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব" (Psychologic de l'education) নামক পুস্তকে বিজয়ী জাতি (conquerors) বিজিত বিদেশী জাতির (conquered foreign race) কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার নিতে পারে, তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।* বর্ত্তমান প্রবন্ধটি উপরোক্ত পুস্তকের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ।—অনুবাদক।

সাবিত্রী

শ্রী ওচিং লাল

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

গুরুজি-মহারাজের হুকুম মত এই ছোট কিস্‌সাটি (১) আমি লিখেছি। এটির বিলকুল (২) বদল-মেরামৎ ক'রে দেবার ছিল তাঁর ইচ্ছা;' কিন্তু আমার নসিব (৩) মন্দ, এটি শেষ করার আগেই তিনি করলেন বৈকুণ্ঠ-বাস! (৪)

অধমের জন্ম-স্থান বেহার মুলুকের এক পাড়াগাঁয়ে; কিন্তু কর্ম্মস্থল বাংলায়। আমার মা-বাপ দুই, আপনাদের ভাষায়, খোট্টা, মেড়ো! পেটের দায়ে তাঁরা এসেছিলেন এই দেশে। এ দেশের পাঠশালে আমি বাংলা বলতে-লিখতে শিখেছি। সেই জন্যে আমার ভাষাটা না-মুরগি, না-বটের (৫)—না-বাংলা, না-হিন্দি!

গুরুজির কিন্তু এই ছিল সবচেয়ে বড়-পসিন্‌ (৬)। তিনি বল্‌তেন, থোড়া (৭) দিনের মধ্যেই হিন্দি বাংলা মেশামেশি হ'য়ে এক হ'য়ে যাবে।

রামজি তাই করুন:—
ভাই ভাই এক ঠাঁই,
ভেদ নাই ভেদ নাই॥ ইতি

লেখক।

১

সীতা দেবীর জন্ম-স্থান মিথিলা মুলুক আর এই বাংলা দেশ অনেক বিষয়ে প্রায় এক'। ভাষা, অক্ষর; চাল-চলন; মানুষের চেহারা; এসব যদি কেউ ভাল ক'রে বুঝে দেখে ত' আমার কথা মানতেই হবে।

তফাতের মধ্যে মোটা-মুটি এই দেখি এখন যে, সে-দেশের লোক এখনো সায়েব ব'নে যায় নি। তাদের ঘরে-ঘরে এখনো মুসলমানি আব্‌রুর পর্দ্দা প'ড়ে মেয়েদের কাঁচের আল্‌মারির পুত্‌লি ক'রে তোলে নি।

একদিন বাংলা দেশের পুরুষ-মানুষ অবাধে সাদির (৮) পর সাদি ক'রতো; আজ তা' প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে। মিথিলার পুরুষে আজো সেটা করে চলেছে।

কিন্তু তারও কি একটা মজা নেই? মনে করুন যদি একজন লোক তিনশো পঁয়ষট্টিটা সাদি করে ত' রোজই তার শ্বশুর-বাড়ির ভোজ খেয়ে দিন সুখে গুজরাণ (৯) হয় না?

আমাদের জমিদারের নাম ছিল মৃদংলাল। বাংলা দেশের ছেলেরা মানুষ হয় বাপের বাড়িতে। কিন্তু সে সৌভাগ্য মিথিলায় নেই। মামার বাড়িতে তারা জন্মায়, সেইখানেই বড় হ'য়ে উঠে বিয়ে-সাদি করে জীবনের পথ ধরে।

মৃদং-এর বাবুজি (১০) ছিলেন শ্বশুর-বাড়ি ভোজ মারবার একজন বেজায় মজবুৎ (১১) লোক। দর্পণ সিং-এর পেটটা জালার মত ছিল পেল্লায় মোটা; গোঁফ জোড়া ভাল্লুকের চুলের মত আধখানা নাক ঢেকে থাকত। কিন্তু তিনি বেশি দিন বাঁচলেন না। তাই মৃদংলালের ভাগ্যে কোন দিন বাপের বাড়ি চোখে দেখাও ঘটল না।

মৃদং বাচ্চা-বয়সে (১২) ঢোল বাজাতে ভালবাসত ব'লে নানাজি (১৩) আদর ক'রে তার ঐ নামটি দিয়েছিলেন।

মৃদং-এর মা রাম-পেয়ারী বাপের একমাত্র কন্যা। নানার বিষয়ে হাত লাগতে (১৪) তাই আর মৃদং-এর কোন বাধাই হ'লো না।

(১) গল্প। (২) সবটা। (৩) কপাল। (৪) স্বর্গবাস। (৫) এক রকম পাখী। (৬) পছন্দ। (৭) অল্প। (৮) বিয়ে। (৯) অতিবাহিত। (১০) পিতা। (১১) অত্যন্ত দৃঢ়। (১২) শিশু। (১৩) মাতামহ। (১৪) হস্তগত হ'তে।

২

বাপের অসংখ্য সাদিতে মার যে কত ব্যথা তা' মৃদং যেদিন বুঝলে সেদিন বয়স আর রক্তের জোরে সে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রে বসলো যে, একের বেশী সাদি সে প্রাণ থাকতে করবে না। এ যেন ঠিক তেমনি হোল, ভীষণ মদক্কির (১) ছেলের মদ না-ছোঁবার শপথ!

মৃদং সাদি ক'রে ঘরে বৌ নিয়ে এসে সংসার পাতিয়ে ভালই ব'সেছিল। কিন্তু দেবতাদের তা' সইল না। তিন মাসের কচি মেয়ে রাধো পেয়ারীকে ফেলে মৃদং-এর বৌ জনক ডুলারি, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে হঠাৎ একদিন সতীলোকে চ'লে গেল।

মৃদং-এর মা রাম পেয়ারী তাকে অনেক অনুনয় ক'রে বল্লে, বেটা, তোর বয়স কাঁচা, তুই ফের সাদি কর্। মৃদং সেই যে বল্লে "না", আর কেউ তাকে কোনদিন ফেরাতে পারলে না।

এই কথা শুনে, হালের বাংলার ভাই বহিণ (২) মৃদং-এর তারিফে (৩) ধন্য ধন্য করবেন, তা জানি; কিন্তু আমাদের দেশে হলো উল্টা বুঝলি রাম,—সবাই গেল তার উপর একদম চোটে!

তলে-তলে খবর দিয়ে রাম পেয়ারী গুরুজি মহারাজকে ডাকলে।

তিনি এসে বল্লেন, একি করচিস্ হুমু (৪)? তোর নানার মত তুইও কি নরকে স'ড়বি (৫)?

মৃদং তার ননীর পুতুল কচি মেয়ে রাধোকে দেখিয়ে বল্লে, এই আমার বেটা-বেটি দুই, মহারাজ, রামজির মর্জ্জি (৬) হয়ত মৃদং নরকেই প'চবে।

গুরুজি পিছু-হটবার পাত্র নন। তর্কের পর তর্ক ক'রে—শেষকালে মৃদং-এর পেটের কথা টেনে বার করলেন; সে বল্লে, বিধবা সাদি করতে পারে না; আমিও তেমনি আবার সাদি করতে পারি না।

অট্টহাসিতে চারিদিক কাঁপিয়ে গুরুজি বল্লেন, মেয়ে-মানুষের সতীত্ব—শাস্ত্রের কথা; আর পুরুষের ও সব বালাই—বাজে বাড়াবাড়ি, বিলকুল ঝুট্-ফুস্ (৭)।

এক-বগ্গা (৮) মৃদং কিছুতেই কিছু শুনলে না; মরদ্কা বাত হাথিকা দাঁত! (৯) যতই লোকে বলে ততই তার মন হয়ে যায় কড়া পাথরের মত।

কিন্তু মনটাতো আর সত্যি পাথর নয়! জবরদস্তির জবাবে জবরদস্তি ফুটে বেরুলো আর এক পথ দিয়ে! অপরের কি হর্জ্জা (১০) হ'লো জানিনে; কিন্তু দুঃখ পেতে হ'লো—আশ-পাশের সবাইকে।

বর্ষার দিনে কাজ্রি (১১) গাইতে গাইতে ছুটতো যখন গাঁয়ের মেয়েরা বনগামার শাল-পলাশের বনের দিকে, তখন মৃদং-এর হুকুম ইস্পাতের শিকলির মত কড়া হয়ে জড়িয়ে থাক্তো বেচারি রাধো পেয়ারীর পায়ে পায়ে!

লম্বা দড়ির দোলায় দুলতে দুলতে তাদের মিহি তাজা গলায় মেয়েরা যে সব গান গাইতো—সেগুলো মৃদং-এর কাণে এসে পৌঁছে মনে মেঘের মিঠা-মোলায়েম কোমলতা না এনে আন্তো বিজলীর চাবুকের বেদরদ বজ্র-রুদ্রতা!

৩

সে-বছর হরি-হর ছত্তরের মেলা থেকে মৃদং একটা জোয়ান বয়েল (১২) আর একটা ভারি সুশ্রী বাছি (১৩) কিনে নিয়ে এলো। যেন হর-পার্ব্বতী, যেন সাবিত্রী-সত্যবান।

আদর করে সত্যিই সে বয়েলটার নাম রাখলে সৎবান—আর কাজে কাজেই বাছির নাম হলো সাবিত্রী।

(১) নেশাখোর; মাতাল। (২) ভাই বোন। (৩) সুখ্যাতি। (৪) বাছা। (৫) প'চবি। (৬) ইচ্ছা। (৭) সব মিথ্যা। (৮) একগুঁয়ে। (৯) পুরুষের কথা আর হাতির দাঁত, কোনটারই নড়-চড় হয় না। (১০) ক্ষতি। (১১) বর্ষার উপযোগী সুর এবং কথা সম্বলিত গান। (১২) বলদ। (১৩) গোবাছুর।

এই দুনিয়ায় মানুষ নিজের বংশটিকে যেমন করেই হোক্ পবিত্র-নির্ম্মল রাখতে চায়। বাইরের ভেজাল যে কোন আকারে-প্রকারে দু' হাত দিয়ে তফাৎ করতে কার না চেষ্টা থাকে?

মানুষের মন এক জায়গায় খাড়া থাক্‌তে পারে না। হয় আগু বাড়বে (১)—নয় পিছু হাটবে; হয় উঠ্‌বে এক ধাপ, নয় নাম্‌বে তিন-ধাপ! পঞ্চম থেকে সপ্তমে—নইলে গান্ধারে।

মৃদংলালের মনটি স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে মানুষ থেকে জানোয়ারের ধাপে গিয়ে কবে, আর কি করে চ'ড়ে উঠেছিল, তা কেউ বল্‌তে পারে না!

একটু একটু ক'রে ব্যাপারটা গিয়ে শেষকালে এমন দাঁড়াল যে সাবিত্রী-সংবান মাঠে চরবার সুবিধা কোনদিন আর পেলে না।

কিন্তু তাদের তোয়াজের (২) কমি হ'লো না কোন দিন। ফলে কিছু দিনের পর সাবিত্রী একটি বাচ্ছা দিয়ে তার পবিত্র ক্ষীর-ধারায় মৃদং-এর সংসারকে সচ্ছল ক'রে তুলে ছিল।

কিন্তু বাঁধা থেয়ে, মেহনতের (৩) অভাবে সংবানের চর্ব্বি বেড়ে একটা বিশ্রী কাণ্ডকারখানা হ'য়ে গেল! একদিন কেমন ক'রে শিকলি ছিঁড়ে সংবান মৃদং-এর বাঁ উরুতে এমন চোট (৪) দিলে—যাতে চিরদিনের জন্য সেই পাখানি জখম হ'য়েই রয়ে গেল।

এত বড় ব্যাপারে কেবল বৈদ্যের ডাক প'ড়লো যে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে দৈবজ্ঞও এসে হাজির হ'লো।

দৈবজ্ঞ কিন্তু বড় কঠিন কথা ব'লে গেল; বল্লে, সংবান আর কেউ নয়, স্বয়ং শিবজি; তার গলায় শিকলি দেওয়ার অপরাধ খাটো নয়; মৃদংলালের দুর্গতির এই মাত্র আরম্ভ, কলির সবেমাত্র সন্ধ্যা!

এ-কথা ছাপা (৫) রইল না। একদিন গোয়ালার দল এসে জোড়হাতে তাদের আর্জ্জি (৬) পেশ ক'রে বল্লে, হুজুর সংবানকে স্বেচ্ছা-বিচরণ করতে দেওয়ার হুকুম হোক্!

হুজুর অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তিতে জবাব দিলেন, চোপরাও শালা সব শূ—।

৪

গরীব মানুষদের ভয়ে রাতে ঘুম হয় না। কি একটা আপদে গাঁ লণ্ড-ভণ্ড হ'য়ে যায় আর কি! কেউ বল্লে, আমরা বেকসুর (৭), মরতে ঐ মৃদং বেটাই মরবে। আর একজন বল্লে, দূর অত সহজে ওর খালাস নেই, ও বেটা নির্ব্বংশ হবে। অপরে বল্লে, আগুনে গাঁ ছারখার হবে।

বিপদ কিন্তু কোন দিনই জানা পথ ধ'রে আসে না। সেদিন সমস্তদিন আগুনের হল্‌কার মত হাওয়া ব'য়ে রাতে অসম্ভব গুমট ক'রে রইল। উত্তরে পাহাড়ের পেছন থেকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। ঝড় এলো আর কি!

হঠাৎ রাত-বারো-বাজে, মাটির মধ্যে থেকে গুরু গম্ভীর আওয়াজ (৮) উঠে, ধরতি (৯) দুলতে লাগলো।

গরীবদের খড়ের ঘরে কোন হরজা পৌঁছল না; কিন্তু জমিদারের বাড়ির চারিদিকের ইটের দেওয়াল প্নড়ে একদম পর্দ্দা ফাঁক! আর গোয়ালের মধ্যে মাটি চৌচির হ'য়ে ফেটে, উঠলো এক গরম জলের ফোয়ারা!

আর যাবি কোথা! এ খবর চারিদিকে ছিটিয়ে পড়লো। কাতারে-কাতারে লোক আস্‌তে লাগলো দেখতে।

সে একদিন ছিল—যেদিন ভগীরথের পুণ্যে নেমে এসেছিলেন স্বয়ং মা গঙ্গা স্বর্গ থেকে, কলুষনাশিনী, পতিতোদ্ধারিণী। আর আজ? মৃদং-এর পাপে, যায় বুঝি দুনিয়া ছারেখারে! ভক্ ভক্ ক'রে উঠছে বালি আর গরম জল; আর তার সঙ্গে কড়া গন্ধকের গন্ধ!

(১) অগ্রসর হবে। (২) যত্নের। (৩) পরিশ্রম। (৪) আঘাত। (৫) লুক্কায়িত। (৬) নিবেদন। (৭) নিরপরাধ। (৮) শব্দ। (৯) ধরিত্রী।

শুধু ফোয়ারা দেখে কেউ সন্তুষ্ট হ'তে পারে না। সবাই যায় মৃদংকেও দেখতে। তাদের চোখের মধ্যে এমন একটা ইসারা ছিল যা সহ্য করা মৃদং-এর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠলো।

তখন সেও দাঁড়াল কোমর বেঁধে দৈবের সঙ্গে লড়াই করতে!

একগাল পাকাদাড়ি রাজ মিস্তিরি মেহের এলো; চুণ, পাথব আরো কত কি! আর মৃদংলালের জমা টাকা জলের মত অজস্র খরচ হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো! কিন্তু দেবতার রাগ কিছুতেই থামে না।

আরে, এতো একটা সোজা কথা! যা উঠছে ভেতর দিক দিয়ে—কি করবে তার বাইরের চুণ-বালি-পাথরে?

আবার ডাক পড়লো জ্যোতিষ-পণ্ডিতদের। বগলে প্রকাণ্ড পাৎরা নিয়ে—পিঠের উপর টিক্কির গোছা ঝুলিয়ে তারা এসে বসলো গণনার শ্রাদ্ধ করতে। চিঁড়ের পর্ব্বত দেখতে দেখতে অদৃশ্য হ'য়ে যেতে লাগলো! দধি সমুদ্র নিমেষে নিঃশেষ হ'য়ে গেল!

শেষকালে তারা বল্লে, ধূর্জ্জটির কোপের আগুন থেকে উঠ্‌ছে এই আপদ। কেবল সীতা দেবীর পুণ্যফলে এব এখনো জলের আকার রয়েছে; কিন্তু সেও বেশীদিন আর থাক্‌বে না! তখন উঠবে লক্‌-লকে জিভ আগুনের প্রলয়ংকরী শিখা!

উপায়?

তারা বল্লে, দেবতার ওপর আদমির (১) জবরদস্তি? এ দেমাক (২) সইবে না দেবতা! এখনো বলচি, মুক্ত কর ঐ মূর্ত্তিমান সদা-শিব্‌কে!

কি করে মৃদং এবার! সবাই রইল কাণ খাড়া ক'রে জানবার জন্ত!

কিন্তু তার আর করবার বিশেষ কিছুই রইল না। সদা-শিব পরম করুণাময়; ব্যাপারটা নিজের হাতেই তুলে নিলেন।

একরাত্রে সংবানের স্থূল দেহটি থেকে পরমাত্মার সূক্ষ্ম সত্বটি সরে গেল। কিন্তু তাতেও অপরাধীর নিষ্কৃতি হলো না। সংবানের আচম্বিতে দেহ-রক্ষার জন্য গলার দড়ি গাছটি গলাতেই ঝুলে রইল।

মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাম্ভিক যে-দিন দ্বারে দ্বারে মৌনী হয়ে—গলাব দড়ি দেখিয়ে ভিখ্‌ মেঙ্গে ফিরতে লাগলো সেদিন জনমত ঠাণ্ডা হলো।

আর তার চেয়ে বড় তাজ্জবের (৩) ব্যাপার লোকের মুখে মুখে রটে গেল যে, প্রায়শ্চিত্তের পরের দিন গো-শালার ফোয়ারাটা একদম বন্ধ হ'য়ে গেছে!

সত্যি বন্ধ হলো কিনা, তা কেউ দেখ্‌তেও গেল না সেদিকে। সবাই বল্লে—বন্ধ যে হবে সেটা ত' একটা নিতান্ত জানা কথা!

একথা সবাই এক বাক্যে মনে মনে ধরে নিলে যে, দেবতার জাগতে একটু দেরি হ'লেও হ'তে পারে; কিন্তু যখন জাগেন তিনি,—তখন নাস্তিকের অবিশ্বাসের খুঁটিটি জড় (৪) থেকে বিল্‌কুল আলগ্‌ (৫) ক'রে দিয়ে তবে তাঁর অন্য কাজ!

৫

বসন্তে হোরি খেলার পব প্রাণী-জগৎ কেমন একটু উদ্‌ভ্রান্ত উদাস হয় না? সেবার সাবিত্রীর মনটাও কেমন যেন হ'য়ে গেল। মাটিতে পা ঘসে, ছট্‌ফট্‌ করে, আর মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদের উচ্চ চীৎকার!

গর্ভ-গোপ হুজুরের পায়ে নিভৃতে নিবেদন জানালে, বেশী নয়, দিন কয়েকের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হোক্‌……

রাগে মৃদংলালের গোঁফ জোড়া ফুলে ডবল হয়ে গেল। দুষ্টু লোকে বলে যে তারি একটা ফুল্‌কি গরীবের ঝোঁপ্‌ড়ির (৬) এক কোণে পড়ে লঙ্কা-কাণ্ড ঘটিয়ে দিলে সেদিন! কি এত বড়……?

কিন্তু তাতে কি জানোয়ারের প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস থামে?

দিনের পর দিন, মাঠে মাঠে দাগা জান্‌ওয়ারগুলো

(১) মানুষের। (২) অহঙ্কার। (৩) বিস্ময়। (৪) শিকড়। (৫) আলগা। (৬) কুঁড়েঘর।

চঞ্চল প্রমত্ততায় ফিরতে লাগ্‌লো—ঐ ব্যথার করুণ আর্ত্তনাদ শুনে।

কিন্তু জমিদারের দুর্গের নূতন প্রাচীরে ফাঁক কোথায়!

একজন কিন্তু আছেন, যাঁর মর্জ্জিতে পাহাড় সরে যায়, সাগর শুকিয়ে যায়! তাই হলো একদিন। গভীর রাতে কে খুলে দিলে সেই খিড়কির দরজা; ছিঁড়ে গেল সাবিত্রীর গলার দড়ি গাছা! চক্ষের নিমেষে সে উধাও হয়ে গেল।

৫

সকালে মৃদংলাল এই কথা শুনে রাগে ফুলতে লাগলো। কিন্তু কোন পাত্তাই (১) পাওয়া গেল না যে কেমন ক'রে দড়ি ছিঁড়ে খিড়কির দরওয়াজা খুলে সাবিত্রী চ'লে গেছে। চারিদিকে লোক ছুটলো—চোর ধরতে।

শেষকালে থানায় খবর দিতে হলো। জমাদার সায়েব মটুকধারী সিং ঘোড়ায় চড়ে এসে উপস্থিত। গর্ভুগোপের এজাহারে সে বল্লে যে শিক্‌লি পুরা মজবুৎ ছিল—আর শুতে যাবার সময় সে দেখেছিল সকল দরওয়াজা বন্‌ (২)।

মটুকধারী বল্লে, এ চোর ভিন্ন আর কেউ নয়। কিন্তু বেচ্‌বে কোথায় সেই গাই; আর ক'দিন রাখবে লুকিয়ে?

গাই যে চুরি যায় নি এমন কথা মৃদংএর মনে আস্‌ছিল; কিন্তু তার পরের কথা মনে করতে তার মন রাগে ভয়ে উঠছিল। চুরি হ'লে ত' পাওয়া গেলে ফেরৎ নেওয়া যায়; কিন্তু……

মৃদংলাল রাগে আর নিজেকে যেন সাম্‌লে উঠতে পারে না।

জমাদার বল্লে, আরে সায়েব ব্যস্ত কি? গাই আপনার আমি উপর ক'রে দেব—আর শালা চোরকে জেলে পচাব।

জমিদার বাড়িতে মটুকধারীর দিন ভালই কাটলো। পকেট মোটা হ'লো—আর পেটের কথা ব'লেই কাজ নেই—পুরী-হালুয়া-পাঁপর-দহিতে সে একটা অসম্ভব ব্যাপার!

সন্ধ্যা হয়-হয়, চৌকিদার ঘোড়ার পিঠে কম্বলটা নেয়ারের পটি দিয়ে ক'সে বাঁধচে—এমন সময় হৈ হৈ শব্দ—সাবিত্রী ফিরেচে।

ব্যাভিচারিণীর সর্ব্বাঙ্গ মাটি মাখা! পিছনে একটা প্রকাণ্ড ধাকড় (৩)।

মৃদং খোঁড়া পায়ে রক থেকে এক লাফে উঠানে পড়ে একটা বাঁশের টুক্‌রো নিয়ে সাবিত্রীকে বেদম ঠেঙ্গাতে লাগলো। মার খেয়ে সাবিত্রী ছুটে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

মটুক বল্লে, আরে সাহেব কেয়া কিয়া?

মৃদং রাগে কাঁপতে কাঁপতে বল্লে—ও গাইকে আমি আর বাড়ির ত্রিসীমানায় আস্‌তে দি?

সৎবান-সাবিত্রীর কিসসা জমাদারজির ভালই জানা ছিল; আর আরো ভাল জানা ছিল তালে কথা কয়ে পরের ধন হাতিয়ে নেওয়ায়।

* * * *

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে মটুক সিং সাবিত্রীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে চৌকিদারকে বল্লে, কিরে ডোমন্‌ কেয়সা গাই?

হুজুর, এয়সা ত' এ মুলুক মে ন মিলি।

হাসিতে মটুকের সব দাঁত গুলো বার হ'য়ে গেল। সে একান্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে বল্লে, পুরা বেকুব্‌।

---

(১) খবর। (২) বন্ধ। (৩) ধর্ম্মের ষাঁড়।

হিন্দু-মুসলমান

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

১

কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ভালবাসা আর নিদারুণ মিলনের যে সব আশ্চর্য্য লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকেই একেবারে পরম তত্ত্বে পৌঁছিয়াছেন। স্বামীজী বহুকাল পূর্ব্বেই তো বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষের মাটিতে যে বীজই ফেলা হোক ধর্ম্মের অঙ্কুর তাহা হইতে গজাইবেই, এ দেশের মাটির এ এক অদ্ভুত গুণ। তাই যখন বড় বড় ব্যক্তিরা আজ বলিতেছেন যে এই সব আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক বিভূতির মূলে দুইটি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মর্ম্মান্তিক ধর্ম্মানুরক্তি রহিয়াছে তখন কথাটা মানিয়া লইতে আমাদের বেশি চিন্তা ব্যয় করিতে হয় না।

অথচ একটু ভাবিয়া দেখিলেই জানিতে পারি যে এই দুটি জাতির ধর্ম্মানুরক্তি আজই কিছু হঠাৎ জাগিয়া উঠে নাই। হিন্দু আজই হঠাৎ ঢাক ঢোল বাজাইয়া মসজিদের পাশ দিয়া দেবতা বিসর্জ্জন দিতে আরম্ভ করে নাই, আর মুসলমানও মাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ গো-বলি দিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয় নাই। তবু আজই দেখিতেছি হিন্দুর শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে মুসলমানের ধার্ম্মিক কানগুলি ব্যথায় পীড়িত হইয়া উঠিতেছে, আর গো-বলির নামে হিন্দুরও গো-মাতার প্রেম একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

লাঠি এবং ছোরার দ্বারা এই যে রক্তাক্ত ধর্ম্মপ্রীতির চর্চ্চা সুরু হইয়াছে, ইহা বিশ্বের ইতিহাসে কোনো নূতন এবং অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার নহে। মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহার ধর্ম্মকেও সেই আগুনে ভস্মসাৎ করিবার হিতবুদ্ধি বর্ব্বর মানুষের বুকে কোনো সময়ে জাগিয়া ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যগগনে ধর্ম্মপ্রীতির এই রূপটি অপ্রত্যাশিত। ধর্ম্মের নামে মানুষের মনে যে-সব অন্ধ গোঁড়ামী সেই আদিম কালে বাসা বাঁধিয়াছিল, তাহারা আজও বাঁচিয়া থাকিয়া নির্লজ্জ ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহার চেয়ে হতাশার কথা আর কি থাকিতে পারে?

২

এই যে অপূর্ব্ব ধর্ম্মবোধের মূর্ত্তি, ইহার পানে চাহিয়া মানুষ হাসিবে, না, কাঁদিবে?

দুর্গাবাড়ীতে কালীবাড়ীতে পূজা উপলক্ষে, বিশ্বেশ্বরীর ওখানে সন্তান-সন্ততির কল্যাণ-কামনায় দেবতার প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য হিন্দু সন্তান অজস্র নিরীহ এবং অসহায় ছাগশিশুর প্রাণবধ করিয়া থাকেন। এবং উদর তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আরো বহুতর ছোট-বড় জীবশিশুর পারলৌকিক কল্যাণ করিয়া থাকেন। এবং আপনাদের ঐহিক মঙ্গলের বাসনায় আরো অনেক মহিষাদিরও নিরুপদ্রব জীবনের অবসান করিয়া থাকেন। এই সব অসহায় এবং নিরীহ জীবের প্রাণ হরণ করিতে গিয়া হিন্দুর ধর্ম্মবোধ এক তিলও ক্ষুণ্ণ হয় না। জীবনের মূল্য যে বিধাতার দরবারে মানুষ এবং ছাগলের একই, বিধাতা যে জীব মাত্রকেই এই বিশ্বের আলোক-বাতাসের উপর সমান অধিকার দিয়াছেন এবং সেই অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার অধিকার যে বিধাতা ছাড়া আর কাহারও নাই, এই সহজ কথাটি হিন্দু কি কখনো ভাবিয়া দেখেন? কোনো জীবের প্রাণ হরণ করিয়া দেবতার তৃপ্তি-সাধন

হইবে এবং সেই তৃপ্তির ফলে দেবতা তাঁহার জীবনের কল্যাণ করিবেন এত বড় মিথ্যা কথা এমন সহজ নিঃসংশয়ে কেমন করিয়া হিন্দুর মনে স্থান পাইল ? আবার সেই হিন্দুই যখন ধর্ম্মকার্য্যে অপরকে ছাগ মহিষের মতই অন্য একটি জন্তুর প্রাণ-বধ করিতে দেখিয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, তখন আর যে বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকে না ! এই গো-মাতাকে শুধু ওই মুসলমান ভ্রাতা একমাত্র ধর্ম্মের নামে ধ্বংস করিতেছেন তাহাও তো নহে ! আরো অনেক ভ্রাতা তো উদরের নামেই এই গো-মাতাকে প্রতিদিন বধ করিতেছেন, কই তখন তো হিন্দু ভ্রাতার মনে কোনো গ্লানির উদয় হয় না ! মসজিদের দিকেই গো-বলির সময় লাঠি লইয়া তাঁহারা মাঝে মাঝে ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতে অগ্রসর হন শুনিতে পাই, কিন্তু কই কসাই-খানার দিকে তো একদিনও তাঁহারা যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তার পর গো-মাতার প্রাণ রক্ষার জন্য কাতর হিন্দু, আপনার মাতা ভগ্নীর এই যে কত স্থানে কত রকমের বীভৎস অপমান হইয়া গেল, কই তাহার প্রতীকারের জন্য তো একবারও তেমন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দেখিলাম না ? এই যে এত গরু বাছুর বছর বছর কসাইখানার মধ্যে প্রবেশ করে, কাহার ঘর হইতে তাহারা যায় সে সংবাদটা তো অজ্ঞাত নাই ! মাতা ভগ্নীর মর্য্যাদা রক্ষা যাহার ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইল না, সে সামান্য একটা চতুষ্পদের প্রাণ রক্ষাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে ! ধর্ম্মবোধের এতখানি বিকৃতি আর কবে কখন হইয়াছে ?

আর আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা মসজিদের নিকটে হিন্দুর আরতি-উৎসবের বাদ্য উপলক্ষে যে-মনোভাব জ্ঞাপন করিতেছেন তাহাই বা কতখানি ধর্ম্মানুরক্তির পরিচয় দিতেছে ? মুসলমান আপনার মসজিদে একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তখন যদি পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে হিন্দু শঙ্খঘণ্টায় তাঁহার ধারণানুযায়ী সেই পরমেশ্বরেরই সম্বর্দ্ধনা করেন তাহা হইলেই তাহাকে মুসলমান ভ্রাতার ধর্ম্ম-চর্চ্চায় আঘাত পড়ে, কর্ণ তাঁহার অপবিত্র হইয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার নামাজের মুহূর্ত্তেও পাশ দিয়া একা গাড়ী চলিয়াছে, মোটর চলিয়াছে, ট্রাম চলিয়াছে, মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজিতেছে, চারিদিকে তাঁহারই সন্তানেরা হয়ত কলরব করিতেছে, কিছুতেই তাঁহার ধর্ম্মসাধন আহত হয় না, আহত হয় ঠিক যখন তাঁহার প্রতিবেশী এবং অনেক সুখদুঃখের সঙ্গী হিন্দু ভাই তাঁহার ধর্ম্ম-চর্চ্চা করেন। আবার এতদিন কিন্তু ইহাও হইত না। সম্প্রতি হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছে যে ইহাতে তাঁহার ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয়। এই যে অদ্ভুত মনোভাব, ইহাকে ধার্ম্মিক মনোভাব বলিতে পারা যায় কেমন করিয়া ? এই তো দেখিলাম অশ্বত্থ গাছটি প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া মসজিদের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার একটা ডালও বহু বৎসর হইতেই মসজিদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া আছে। এতদিন বোধ করি ছায়াটাই তাঁহার লক্ষ্যে পড়িয়াছিল, পাখীরা যে গাছে বসে এবং তাহার ফলে গাছ-তলার মসজিদ প্রাঙ্গণ যে অপরিষ্কৃত হয় সে কথাটা এতদিন চোখে পড়ে নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁহার গোচর হইয়া গেছে যে ও গাছটা হিন্দু, অমনি উহাকে নষ্ট করিবার জন্য তিনি একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। হিন্দুরও ধর্ম্ম রক্ষার দায় আছে, মনুষ্যত্ব রক্ষার দায় না থাকিলেও। তাই ভয়কম্পিত কণ্ঠে তিনি বলিয়াছেন, ভাই সাহেব, আমি মসজিদ্-প্রাঙ্গণে ছাত করিয়া দিই, তাহা হইলেই আমার ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তোমারও মসজিদ পবিত্র থাকে !—

ফলতঃ এই সব ব্যাপারের মূল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলে যাহা বলিতে হয় তাহা হিন্দু এবং মুসলমান, কাহারও ধর্ম্মানুরাগ প্রমাণ করে না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে সম্ভ্রম মনোভাব তাহারই প্রমাণ এই সব ব্যাপারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

৩

এই মনোভাবের কারণ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে হিন্দু-মুসলমানের সমষ্টিগত পরিচয়ের সন্ধান লইতে হইবে।

ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শ এবং সান্নিধ্য ঘটিয়াছে। এই দুইটি জাতির স্বতন্ত্র মনোভাব ও মনোবৃত্তির পরিচয় লইতে হইলে বেদ-পুরাণ ও কোরাণের তত্ত্বালোচনায় এবং উভয় জাতির সাধক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের উচ্চারিত বাক্য-রাশির আলোচনায় মন দিলে চলিবে না। কোনো জাতির সমূহগত সত্তার পরিচয় লইতে হইলে তাহার চলিত পূজা পার্ব্বণ এবং উৎসবের দিকে এবং অতীত ইতিহাসের ঘটনারাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই পথ ধরিয়া আমরা বর্ত্তমান ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের একটি পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

প্রত্যেক জাতির—এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরও বোধ করি,—ভগবান সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা তাহার জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে গড়িয়া উঠে। ভগবান বা ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে সেই সব বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনা ভগবানের সত্যকার পরিচয় কতটা বহন করে তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু একটি কথা এক রকম নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায় যে এই সব বিশিষ্ট বিশিষ্ট কল্পনার মধ্যে বিশিষ্ট বিশিষ্ট জাতি এবং ব্যক্তির মনোভাবের পরিচয় অতি সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্য কোনো জাতির চরিত্র বুঝিতে হইলে তাহার ভগবানের চরিত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।

তবে কি হিন্দু জাতির স্বরূপ জানিতে হইলে চাবি বেদ এবং আঠারো পুরাণের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে? এবং মুসলমানকে বুঝিতে হইলে তাহার কোরাণের অনুবাদ দেখিতে হইবে?

বোধ হয় কোনো জাতির ঐতিহাসিক সত্তার পরিচয় লইতে হইলে, কোন্ কোন্ পথ বাহিয়া, চরিত্র বিকাশের এবং নৈতিক উন্নতি-অবনতির কোন্ কোন্ চড়াই-উৎরাই পার হইয়া কোনো বিশেষ জাতি বর্ত্তমানের স্তরে পৌছিয়াছে তাহা জানিতে হইলে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কিন্তু, বর্ত্তমান আলোচনায় সেই গহন অরণ্য-পথে আমরা প্রয়াণ করিব না। বর্ত্তমান কালের মধ্যে তাহার চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক বিশেষ ভাবে ক্রিয়মান্ তাহার সন্ধান আশা করি তাহার চলিত পূজা পার্ব্বণের মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

৪

পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুর দিকে চাহিয়া তাহার দেবতার দুইটিমাত্র রূপ প্রত্যক্ষ করি।

শাস্ত্রে পুরাণে শিউজীর কত অপূর্ব্ব রূপের বর্ণনাই না পাই! কখনো তিনি যোগীশ্রেষ্ঠ, অজ্ঞানতিমিরনাশন, জ্ঞানী গুরু, সমাধির পরমানন্দে মগ্ন; কখনো তিনি প্রেমিক শ্রেষ্ঠ, সতীর মৃত দেহ মাথায় করিয়া পাগল, কখনো তিনি প্রলয়ঙ্কর রুদ্র, ত্রিশূল-পাণি, নৃত্যের রুদ্রতালে মহাবিশ্ব মহাশূন্যে লীন হইয়া যাইতেছে। এত মধুর, এত মহান্, এত মহিমাময় রূপ থাকিতে শিউজীর পূজা চলিতেছে মন্দিরে মন্দিরে কোন্ রূপে? কোনো মন্দিরে শিবের কোনো চেহারা পাই না কেন? এই যে শিউজীর পূজারীরা, ইহারা তাঁহার কোন্ মূর্ত্তি আজ কল্পনা করে? ভাঙ্-ধুতুরার নেশার রাজা যিনি শ্মশানে ঘর পাতিয়াছেন, তাঁহারই সেবা চলিতেছে দেখিতে পাই! যে দেবতার পূজা হয় সেই দেবতার বর পাওয়া যায় বই কি! ভাঙ বেচিয়া এ প্রদেশে সরকারের লাভ মন্দ হয় না বোধ হয়, আর যাহারা ভাঙ্ কিনিয়া তাহা দিয়া শিউজীর অর্চ্চনা করে তাহারাও শিউজীর প্রাণ ভরা আশীর্ব্বাদ পায়—তাই বুদ্ধির চাষ একদম বন্ধ হইয়া গেছে!

শিউজীর উপাসক সংখ্যা কিন্তু এই পশ্চিম প্রদেশে সীতারামের ভক্ত সংখ্যাকে ছাপাইয়া যায় না। এখানকার হিন্দু হিন্দুকে অভিবাদন করিবার সময় জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে 'রাম রাম' বলিয়াই অভিবাদন করে। কিন্তু 'রাম রাম' 'সীতারাম' কণ্ঠে যতই বিরাজ করুন, এই প্রদেশের মর্ম্মে যিনি আসন পাতিয়াছেন তিনি রামসীতা নহেন, তিনি রামসীতার পরম সেবক হনুমানজী। পথে ঘাটে

সর্ব্বত্র তাই হনুমানজীর বিগ্রহ। মেলার পুতুলের মধ্যেও হনুমানজীর আবির্ভাব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই।

এই প্রদেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাই হনুমানজী গন্ধমাদন পর্ব্বতখানি বামহস্তে অবলীলাক্রমে শূন্যে উঠাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, অসাধারণ দৈহিক শক্তির আদর্শরূপেই হনুমানজী এই দেশবাসীর পূজা পাইতেছেন। পূজা বলিতে আমি শুধু ফুল-পাতার অর্ঘ্য বলিতেছি না। সত্য সত্যই এদেশবাসী আখড়ায় ব্যায়াম করে গদা মুদ্গর লইয়া, ডন কুস্তি ও বৈঠকী করিয়া হনুমানজীর যথার্থ পূজা করে। আজও ব্যায়ামের আখড়া বলিয়া একটি বস্তু জনসাধারণের নিকট সমাদর পাইতেছে; পালোয়ানের দঙ্গল দেখিতে এদেশের সাধারণ লোকেরা ততটাই উৎসুক, থিয়েটার এবং যাত্রার জন্য বাঙালী যুবকেরা যতটা উদ্যোগী। এই পূজা তাই সার্থক হইয়াছে হনুমানজীর আশীর্ব্বাদে। পশ্চিমা তাই আজো দু'মুঠা ছাতু খাইয়া সুস্থশরীরে জীবন কাটায়; অরহর ডাল খাইয়া তাহার বদ্ হজমি হয় না।

আর পূর্ব্বভারতের হিন্দু দিন দিন ব্যাধি এবং অস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া এবং মন্দাগ্নি অর্জ্জন করিতে করিতে ধ্বংসের সংশয়হীন সরল পথে অগ্রসর হইতেছেন কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করিয়া?

বাঙালী হিন্দুর সব চেয়ে বড় পূজা কোন্ দেবতার, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গর্ব্ব সহকারে বলিয়া উঠিবে, আদ্যাশক্তি ভগবতীর। বঙ্কিমচন্দ্র ভগবতীর সে রূপের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি কিন্তু বুঝিয়াছিলেন মহাশক্তির সেই মহিমাময় ঐশ্বর্য্যময়, বীর্য্যময় প্রতিমা অতল কালসাগরে ডুবিয়াছে! তাহা যদি না হইত, বাঙালী যদি সত্যই ওই মহাশক্তির পূজা করিত তাহা হইলে সে কি করিয়া এত দীন এত শক্তিহীন হইয়া থাকিতে পারিত? বছরের পর বছর বাঙালী 'ধনং দেহি জনং দেহি' বলিয়া বর চাহিতে চাহিতে বরদাত্রীর ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলিল, অথচ একটি বরও তাহার করায়ত্ত হইল না কেন? ছাগশিশুর যত রক্তে ভগবতীর পা রাঙানো হইয়াছে তাহাতে একটা দেশের মাটি উর্ব্বরা হইয়া যায়, তবু ভগবতীর চরণপাতে বাঙালীর বুকে শক্তি জাগিল না কেন?

সত্যকে স্বীকার করিতে হইলে, বলিতে হইবে বাঙালী মহাশক্তির আরাধনা করে নাই। ভগবতীর পূজা করিতে গিয়া, শক্তির আরাধনা করিয়া ধন-জন-বীর্য্য পাইতে গিয়া, সে পূজা করিয়াছে তাহার মাতার, তাহার কন্যার। কোমলহৃদয় বাঙালী আত্মনির্ভরতা হইতে বঞ্চিত, তাই সে তাহার অসহায়তা ও শক্তিহীনতাকে বিস্মৃত হইতে চাহিয়াছে মায়ের উপর সব বরাত দিয়া। সে চিরকাল মায়ের কোলের শিশু হইয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইবার দুরাশা করিয়া আসিয়াছে। তাই ধন ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্জ্জনের জন্য উদ্যমী যুবকের মত কর্ম্মক্ষেত্রে সে অগ্রসর হইল না, কেবলি কচি পাঁঠার মাংসের প্রসাদ পাইতে পাইতে মায়ের নিকট ন্যাকা-আবদার করিয়া মরিল, 'ধনং দেহি জনং দেহি'—কাঙালীর 'দেহি দেহি' রব শুনিয়া যে চণ্ডী বর দিতে নামিয়া আসেন না হতভাগা তাহা বুঝিল না।

বাঙালী হিন্দু যে বীর্য্য প্রার্থনা করিয়াছে, তাহার সেই প্রার্থনার সত্যটি ধরা পড়ে তাহার কার্ত্তিক পূজায়। ব্রহ্মচারী দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় বাঙালীর ঘরে আসেন কালো-পেড়ে ফিনফিনে ধুতিতে ফুল-কোঁচা দুলাইয়া, পাম্পশু পরিয়া, নূতন জামাইটির মত টেরি-কাটা রসিক-পানা চেহারা করিয়া—যেন বাসর-ঘরে শ্যালিকাদের সহিত সরস বাক্‌যুদ্ধ করিতে চলিয়াছেন!

সে যাহাই হোক্, বাঙ্গালী এই ভগবতীর মধ্যে যে তাহার কন্যার স্মৃতিকেই পূজা করিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই! কোমলহৃদয় বাঙ্গালী পিতা-মাতা কন্যাকে তাহার পতিগৃহে পাঠাইয়া যে কি ব্যথায় ব্যথিত হয়, তাহার পরিচয় পাই এই পূজার আগমনী গানের মধ্যে। শরৎকালে এই ভগবতীর আবির্ভাবের মধ্যে সে যেন তাহার কতকালের হারানো কন্যাকে বুকে পায়। বাঙ্গালী তাহার স্নেহময় হৃদয়ের সাধনা করিয়াছে এই ভগবতীর

রূপে ; আর তেমনি তাহার প্রেমব্যাকুল ভালবাসার নিবিড় সাধনা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে রাধাকৃষ্ণের রূপে। ফল কথা বাঙ্গালী ঐশ্বর্য্যের বীর্য্যের ও মহিমার সাধনা করিতে পারে নাই ; সে সাধনা করিয়াছে তাহার সুকুমার অন্তরের স্নেহ-প্রেমের। সে সাধনায় বাঙ্গালী যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহার প্রমাণ বাঙলা সাহিত্য।

এ ছাড়া বাঙ্গালী সাধনা করিয়াছে সরস্বতীর। এমন করিয়া বাগ্দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিবার জন্য ব্যাকুল আর কোনো প্রদেশের হিন্দুই নহে। এই জন্যই বীণাবাদিনী কাব্যময়ী সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ বাঙ্গালীর মস্তকে অজস্রধারে বর্ষিত হইয়াছে। তাই পরাধীন, পরান্নপুষ্ট, ম্যালেরিয়া-অজীর্ণ-ক্ষয়-ব্যাধিক্লিষ্ট বাঙ্গালীও আজ জগদীশ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া জগৎ-সভায় গর্ব্ব করিতে পারিতেছে।

৫

হিন্দুধর্ম্ম নামে শুনিতে এক হইলেও বহুদেবতার নানা বিচিত্র সাধনার পদ্ধতি হিন্দুকে কেবলি শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্ম ঐহিকতাকে মুখ্যত বর্জ্জন করিয়া কেবলি পারলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে হিন্দুর মনকে উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার রস-সাধনা তাহাকে কেবলি কোন্ লোকান্তরের রস-দেবতার পানে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাকে মোক্ষ-সাধনার কথা শুনাইয়া শুনাইয়া ইহজগতের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে।

মায়াবাদ এবং মোক্ষ-সাধনা হিন্দুকে অধ্যাত্ম-লোকে কতখানি উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে তাহা আধ্যাত্মিক জগতের পাণ্ডা এবং কাণ্ডারীরা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের ইহলৌকিক দৃষ্টি দিয়া দেখিতে পাই যে, উক্ত আধ্যাত্মিক মনোভাব হিন্দুকে দিনের পর দিন কেবলই পরতন্ত্র নির্ব্বীর্য্য এবং দীন হীন ভিখারী করিয়া তুলিয়াছে। জীবন ক্ষণ-স্থায়ী স্বপ্ন ; এই জগৎ দুঃখভোগের কারাগার মাত্র ; সুতরাং হিন্দুর একমাত্র লক্ষ্য নাক কান চোখ বুজিয়া, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, এই জগৎকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, রূপরসগন্ধস্পর্শের মোহ হইতে মনকে স্বাধীন রাখিয়া পরলোকের জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। কোনো বিষয়েই তাই তাহার কোনোরূপ উৎসাহের অপরাধ নাই, উদাসীনতাই তাহার ধর্ম্ম। যেখানে পরলোকের পথটি সুগম এবং সুপ্রশস্ত করাই আত্মার কল্যাণের একমাত্র পথ সেখানে ইহলোকের পথ যে অব্যবহার্য্য ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি !

তাহার উপর হিন্দুর ধর্ম্ম-সাধনা ব্যক্তিগত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে। এখানে প্রত্যেকের মুক্তি-সাধনার পথটি একান্ত নির্জ্জন। এই জন্য হিন্দু মন্দির গড়িলেও কখনো সেখানে সমূহের মিলিত পূজার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ভজন-পূজনে হিন্দু একান্ত একা। তাহার আত্মার প্রয়োজনের পথে বহুর মিলিত সাধনাকে সে একটুও প্রয়োজন মনে করে নাই। হিন্দুর জাতীয়তা-হীনতার মূলে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের গুরুতর প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬

এই ত গেল হিন্দুর জীবনে ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাবের কথা। মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থে কোনো তত্ত্ববাদ আছে কিনা জানি না, তাহার জীবনে অন্ততঃ তেমন কোনো সুস্পষ্ট মতবাদের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেখানে যে ভাবের খেলা দেখিতে পাই তাহা যে তাহাকে জাতীয়তা গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিয়া পারি না।

মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুর মত ব্যক্তিগত সাধনাকেই চরম করিয়া তোলে নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্বই তাহার সমূহগত সাধন-ভজনের পদ্ধতি। হিন্দুর পূজা-সন্ধ্যা হিন্দুকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাদের প্রত্যেককে তাহার নিভৃত নির্জ্জনে লইয়া যায়, সেই পরম নির্জ্জনে হিন্দু একমাত্র আপনাকেই তাহার

দেবতার পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া, আপনার পাপক্ষালনের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। আর মুসলমান অন্য সময়ে যত বিচ্ছিন্নই থাকুক না, নমাজের তিন বেলা সে আপনাকে সমগ্র মুসলিম জগতের সহিত এক করিয়া লইয়া এক বিশাল সমূহের বেশে গিয়া আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হয়। মুসলমানের এই সমষ্টিগত সাধনার মত এমন সুন্দর ব্যাপার খুব কমই আছে।

নমাজের সময় হইয়া আসে, মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ সমগ্র মুসলিম জগৎকে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে আহ্বান করে। ভোরের আলোয় নিদ্রিত জগৎ চোক মেলিয়া চায়, মুয়েজ্জিন ডাকিয়া বলে, 'মুসলমান, রাত্রি আর নাই, ওঠো, জাগো, দিবসের কর্ম্মময় পথে নামিবার আগে এসো, সবাই খোদাকে স্মরণ করিয়া লই।' অমনি সমগ্র মুসলমান জগৎ জাগ্রত হয়। সর্ব্বত্র এক বিশাল মসজিদের প্রাঙ্গনে মুসলমান হাঁটু গাড়িয়া আল্লার নাম স্মরণ করিতে থাকে। দ্বিপ্রহরের খরতাপে দশদিক জ্বালা করিয়া উঠে, মরুর প্রচণ্ড দাহ জগতের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়। মুয়েজ্জিনের শুষ্ককণ্ঠ হইতে তবু একটি উদাত্ত আহ্বান তপ্ত আকাশের বুকে জাগে, 'মুসলমান, সত্যধর্ম্মী, মূর্চ্ছিত হইও না, এই কর্ম্ম-ঝঞ্ঝার মাঝখানে শান্ত হও, অদ্বিতীয় আল্লার মহিমাকে স্মরণ কর।' মাঠে চাষীর চাষ বন্ধ হইয়া যায়, কারখানার চাকা থামিয়া যায়, বক্তার বক্তৃতা স্তব্ধ হইয়া আসে, পাঠশালার পাঠ থামে, ঘাটে মাঠে পথের প্রান্তে গাছের তলায়, রেলে ষ্টীমারে জাহাজে, জলে-স্থলে, হোটেলে-বাজারে, আরবে-পারস্যে কাবুলে-ভারতে, মিশরে ও ইউরোপে—সর্ব্বত্র মুসলমানের নমাজের আসনখানি পাতা হয়, আবার সমগ্র মুসলিম জগৎ মিলিত স্বরে মিলিত প্রাণে পরম দেবতাকে স্মরণ করে। সন্ধ্যায় দিনের আলো ম্লান হইয়া আসে, শত সহস্র কর্ম্মের বিরতি আসে, দেহের ক্লান্তি শ্রান্তি নয়নে ঘুমের মায়া বুলাইয়া দিতে চায়। মুয়েজ্জিন আবার তখনো ডাকিয়া বলে, 'আল্লার সন্তান, যেমন প্রভাতে তেমনি দুপুরে, তেমনি সন্ধ্যায় বল আল্লার জয়! সর্ব্ব কর্ম্মের শেষে পিতার চরণে শির নত কর।' দিনান্তের ম্লান আলোকে দেখিতে পাই, পথের পথিক পথ-প্রান্তে, মাঠের চাষী প্রান্তর-বক্ষে, নদীর তীরে ঘরের দাওয়ায়, চলন্ত ট্রেণে-ষ্টীমারে-জাহাজে সর্ব্বত্র এক বিশাল মুসলমান জনতা এক হইয়া আল্লার ভজনা করিতেছে।

এই যে পরম সুন্দর সমূহ-সাধনা, ইহা মুসলমানকে আধ্যাত্মিক উন্নতি কতটা দান করিয়াছে তাহা অজ্ঞাত থাকিলেও, এই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অভ্যাস যে তাহাকে এক অপূর্ব্ব ঐক্য দান করিয়াছে ও মুসলিম জাতীয়তাবোধের মধ্যে মিলিত করিয়াছে তাহার প্রমাণ তো অত্যন্তই সুগোচর। সেই জন্যই একজন মুসলমান যখন দশজন হিন্দুকে শাসায় তখন হিন্দু কাঁপে, করযোড় করিয়া মাফ চায়!

৭

বাঙলা দেশে হিন্দুর ধর্ম্মানুভূতি তাহার মুখ দিয়া অপূর্ব্ব ভজন সঙ্গীত বাহির করিয়াছে। শুধু বাঙলার বলিয়া নহে সমগ্র উত্তর ভারতে একই ধরণের ভজন-সঙ্গীত সৃষ্টি হইয়াছে দেখিতে পাই।

দিনান্তে পথের পথিক শ্রান্ত চরণে খেয়াঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, পারের কড়ি তাহার নাই; কাতর কণ্ঠে পারের কাণ্ডারীকে সে কৃপা করিয়া এই সংসার হইতে ত্রাণ করিবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে।—পশ্চিমের ভজনে, বাঙলা দেশের বাউলে, কীর্ত্তনে, শ্যামা-সঙ্গীতে, শ্যাম-সঙ্গীতে এই একই অশ্রুময় মিনতির সুর বেদনায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহলোকের মাঝখানে থাকিয়া মানুষের অন্তরাত্মার এই যে বেদনাময় ক্রন্দন ও আশ্রয় প্রার্থনা, ইহা বোধ করি কোনো জাতি বিশেষের বা ধর্ম্ম বিশেষের সম্পদ্ নহে। খৃষ্টান-হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মর্ম্ম-মূলে এই বৈরাগ্যময় ক্রন্দন থাকিয়া থাকিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে দেখি। বাঙলা দেশের মুসলমান তেমন কোনো ভজন-সঙ্গীত গাহিয়াছে বলিয়া জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে এই পশ্চিম প্রদেশের মুসলমান এক অপূর্ব্ব ভজন-সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে।

পশ্চিমা মুসলমানের এই ভজন-সঙ্গীত যাঁহারা শোনেন নাই তাঁহারা আমার কথার তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। কি উদাস বেদনাময় আত্ম-নিবেদনের সুরই তাহার ভজনে ফুটিয়া উঠিয়াছে! ওই ভজন-সঙ্গীত শুনি আর ধ্যানদৃষ্টিতে আরবের দিগন্ত বিলীন মরু-প্রান্তরের সঙ্গহীন বিস্তীর্ণতার ছবিখানি ভাসিয়া উঠে।—ওই সীমাহারা মরু-প্রান্তরের তপ্তদগ্ধ বুকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে, আর কোন্ এক বৃদ্ধ ক্লান্ত ফকীর যেন আসন্ন রাত্রির অন্ধকারের মুখে তাহার ব্যর্থ পথ চলার ব্যথায় বসিয়া বসিয়া কেবলি কাঁদিতেছে, 'আল্লা, দিন যে আমার শেষ হইয়া গেল; মরু-প্রান্তরের তপ্ত পথ তো কোনো স্নিগ্ধ ওয়েসিসের প্রান্তে আশ্রয় পাইল না আল্লা!'

মুসলমানের ভজন-সঙ্গীতের মধ্যে যখন এই কান্নার সুর শুনি তখন যেন তাহাকে সর্ব্বকালের সর্ব্বমানবের সহিত এক করিয়া দেখিতে পাই; সেখানে যেন কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব নাই, বিরোধ নাই; সেখানে যেন হিন্দু নাই মুসলমান নাই খৃষ্টান নাই, আছে যেন সকল মানুষের মধ্যেকার একখানি সন্ধান-ব্যাকুল, বেদনা-উদাস প্রাণ! ওই ভজন-নিরত মুসলমানকে দেখি, আর ইতিহাসে এবং তাহার পর্ব্বোৎসবে তাহার যে বিকট রূপখানি অসহ্য রকমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আসিতেছে তাহার সহিত ওই রূপের কল্পনাতীত পার্থক্য দেখিয়া বিস্মিত হই।

৮

হিন্দুর লোকাতীতের সন্ধান ও পরপারের প্রতীক্ষায়, তাহার ভজন-কীর্ত্তন-বাউলের বৈরাগ্যময় ক্রন্দনে, তাহার ব্যক্তিগত একান্ত নির্জ্জন সাধনায়, মুসলমানের ভজনে-নমাজে তাহার সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্ম-সাধনায় কোথাও তো পরস্পরকে ঘৃণা করিবার পরস্পরকে লাঠি ছোরার দ্বারা ভালবাসা জানাইবার কোনো আভাস পাই না। হিন্দু-মুসলমানের ওই সুপ্রেম মনোভাবের পরিচয় লইতে হইলে একবার হিন্দু-মুসলমানের দিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া তাকাইতে হইবে।

হিন্দু তাহার ধর্ম্মতত্ত্বকে সমাজ ব্যবস্থার সহিত নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া, হিন্দুর সামাজিক জীবনকে প্রতিপদে ধর্ম্ম-তত্ত্বের অনুগত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই কারণে হিন্দুর জীবনের সর্ব্ব ব্যাপারে ওই মোক্ষলাভের কথাটাই সব চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রকে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত একান্ত প্রয়োজনের বন্ধনে বাঁধিয়া দেয় নাই। মুসলমান ধর্ম্ম কিন্তু এক আশ্চর্য্য রকমের রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম। মহম্মদ মুসলমানের ধর্ম্মকে মুসলমান রাষ্ট্রের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই কারণে তাহার ধর্ম্ম-জগতের নেতা খলিফা মুসলমান রাষ্ট্রেরও নেতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। মুসল-মানের ধর্ম্ম তাই তাহাকে মুসলিম রাষ্ট্রের একতাসূত্রেও বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম কিন্তু তাহাকে এই ভাবের কোনো ইহলৌকিক একতা দান করিতে পারে নাই। যতদিন হিন্দু রাষ্ট্র ছিল, ততদিন হিন্দুরাজা শান্ত ভাবে হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মে সহায়তা করিয়াছে, দেশ-বিদেশে হিন্দু-ধর্ম্মের উদার বাণীকেও প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়াছে, কিন্তু তাহার ক্ষাত্রশক্তি কোনো দিনই অন্য জাতিকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করিয়া টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে নাই।

হিন্দুর ধর্ম্ম ক্ষাত্রশক্তিকেও সমাজ-ব্যবস্থায় স্থান দিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাকে কখনো চরম করিয়া তুলিতে পারে নাই। ধর্ম্মের জন্য ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধকে সে কখনো স্মৃতিপটে আদর্শ হিসাবে স্থান দেয় নাই। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যকেই ধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ও তাহারই পূজায় হিন্দুর চিত্তকে প্রণত করিয়াছে। তাহার গোপন অন্তরে অরণ্যবাসী ফল-মূলাশ্রয়ী, তপঃক্লিষ্ট শান্তির সেবক সন্ন্যাসী মুনি ঋষিই পরম শ্রদ্ধার আসনখানি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। তাই স্মরণাতীত কাল হইতে যে হিন্দু-রাষ্ট্র ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছিল তাহা যখন একদিন স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল, তখন হিন্দু তাহার রাষ্ট্র যাইতেছে বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল না, ধর্ম্ম মন্দিরের ওপর বিধর্ম্মীর

অত্যাচারই শুধু তাহাকে কখনো কখনো কাতর করিয়া তুলিল। বিধর্মীর অধিকারে তাই হিন্দু যখনই নিরুপদ্রবে তাহার ধর্ম সাধনা করিতে পাইয়াছে তখনই সে একান্ত রাজভক্ত হইয়া সেই বিধর্মী রাজপ্রভুদের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছে। হিন্দুর চিত্ত তাহার ধর্ম এবং সমাজকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, রাষ্ট্রীয় অধিকারকে সে তেমন করিয়া কামনা করে নাই। হিন্দু-চরিত্রের এই কথাটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

মুসলমান ধর্ম কিন্তু ক্ষাত্রধর্মকেই চরম করিয়া ধরিয়াছে। মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থান ও বিস্তারের ইতিহাস তাই দুর্ব্বলজাতির রক্তে রঞ্জিত। একহাতে কোরাণ এবং অন্য হাতে উন্মুক্ত তরবারি লইয়া বিধর্মীর রক্তে তাহার পথখানিকে সে রক্তাক্ত করিয়া চলিয়াছে, আর দুর্ব্বল জাতিকে ভীতির দ্বারা জয় করিয়া তাহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া সে আপনাকে ধর্ম-সেবক বলিয়া, আল্লার প্রিয় সন্তান বলিয়া সগর্ব্বে প্রচার করিয়াছে। আরব দস্যুর রক্ত-পিপাসু অন্তরে ইহার চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর ধর্মের কল্পনা ও কামনা অসম্ভব ছিল। হজরত মহম্মদ পরাক্রান্ত ও বর্ব্বর আরব জাতিকে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী আদর্শেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র এবং ধর্মকে পৃথক করিলে তাহাতে মানুষের শক্তি বিখণ্ডিত হইয়া পড়িবে দেখিয়া মহম্মদ আরো একটি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গেলেন; খলিফাকে তিনি ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয়েরই নেতা বলিয়া প্রচার করিয়া গেলেন। ফলে পরাক্রান্ত মুসলমান জাতি এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইল এবং এই অদ্ভুত সমন্বয়ের শক্তিতে বলিয়ান মুসলিম সঙ্ঘ স্পেন হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহার অপ্রতিহত শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিল।

ধর্ম-সাধনায় বৈচিত্র্যকে স্থান দিতে গিয়া সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু অজস্র বিভেদ জাগাইয়া তুলিয়া যখন বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন হইয়া আসিয়াছে, মুসলমান তখন বৈচিত্র্যহীন একত্বের সাধনায় এক অখণ্ড শক্তি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল। তার পর মুসলমান শক্তি হিন্দুর মন্দির ভাঙিয়া চুরমার করিল, সেই মন্দিরের পাথর দিয়া সেইখানেই মসজিদ উঠাইয়া দিল; দুর্ব্বল হিন্দু বাহুবল দিয়া তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে পারিল না, শুধু অন্তরে অন্তরে একটি মর্ম্মান্তিক ঘৃণার অঙ্কুরে অতি গোপনে বারি সেচন করিতে লাগিল। মুসলমান তাহার তরবারির প্রীতিপূর্ণ আস্ফালনে বহু দুর্ব্বল হিন্দুকে তাহার গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া লইল, আর হিন্দু আপনাকে সঙ্কীর্ণ হইতেও সঙ্কীর্ণতর স্থানে গুটাইয়া লইয়া অবশিষ্ট সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা করিতে লাগিয়া গেল। কিন্তু স্পর্শেই যে ধর্ম কর্পূরের মত উবিয়া যায় সেই ধর্ম যে পরাক্রান্তের সংস্পর্শে বেশিদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না তাহা তো সহজেই অনুমান করা যায়। তাই ভারতবর্ষে মুসলমান কখনো হিন্দু হইতে পারিল না, অথচ হিন্দু মুসলমান হইয়া গেল।

কয়েক শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু দাস জাতি হইয়া রহিল, আর মুসলমান আপনাকে রাজার জাতি বলিয়া অবজ্ঞা এবং অপমান দিয়া হিন্দুর সম্বর্দ্ধনা করিল। মুসলমানের অন্তরের শতাব্দীপুষ্ট সেই শ্রেষ্ঠতার অহমিকা এবং হিন্দুর অন্তরের গোপন-পালিত শক্তিহীন ঘৃণার অবসান তো কখনো হয় নাই; তাহার সুযোগ কখনো আসে নাই।

১০

হিন্দু রাষ্ট্রের মত একদিন ভারতবর্ষে মুসলমান রাষ্ট্রেরও অবসান ঘটিল কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয়েই এক অবস্থায় উপনীত হইল না।

হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে হিন্দু তাহার রাষ্ট্র-স্মৃতি অতি অল্প আয়াসেই বিস্মৃতির স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া বৈরাগ্য স্তোত্র আওড়াইয়া ফোঁটা তিলক কাটিয়া যথারীতি সাড়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার সেবায় এবং পরলোকের ব্যবস্থায় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল। আর মুসলমান রাজ্য হারাইয়াও আজও পর্য্যন্ত তাহার রাজ্য শাসনের অহমিকা ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার কারণ ধর্মের সহিত তাহার রাষ্ট্রীয় স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে। কবে কোন্ সুদূর অতীতে

ভারতবর্ষ হইতে কত দূরে না জানি সে-কোথায় ধর্ম্মযুদ্ধে কাহার প্রাণ গিয়াছিল, আজও মুসলমান তাহার কবর রচনা করিয়া তাহার জন্য পাগলের মত হাহাকার করিয়া মরে! ভারতবর্ষীয় বহু হিন্দুর ধমনীতে আর্য্য রক্ত না থাকা সত্ত্বেও যেমন তাহার আর্য্যামীর অহমিকা কাটে না তেমনি ভারতবর্ষীয় মুসলমানের শরীরেও আরবী ও তুর্কী রক্ত থাকুক আর না থাকুক তাহারও মিথ্যা অহমিকা কিছুতেই যায় না। তাহার রক্তের মধ্যে যত বড় খাঁটি হিন্দুর রক্তই চলাচল করুক অন্তরে অন্তরে কিন্তু তাহার দৃঢ় ও অবিচলিত ধারণা এই যে, সে খোদ হজরতের সন্তান না হইলেও অন্তুতঃ পক্ষে তাঁহারই একেবারে পার্শ্বচর কোনো না কোনো ভক্তবীরের বংশধর। ভারতবর্ষের মুসলমানের মনে এই ধারণাটি বিরাজ করিতেছে বলিয়াই মরচেধরা তলোয়ার, ভোঁতা বর্শা আর ভাঙা ছোরার মোহ তাহার আর কিছুতেই ঘোচে না; ওইগুলাকে সে আজও মাজিয়া ঘসিয়া লইয়া পর্ব্বদিনে দল বাঁধিয়া বাহির হয়, আর সেই পূর্ব্বস্মৃতিকে জিয়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করে। তাই ভারতবর্ষের মুসলমান ভারতবর্ষকে আপনার স্বদেশ বলিয়া মনে করিতে পারিল না। ভারতবর্ষের সীমান্ত পারে যে সব জাতি ভাইরা স্বাধীন ভাবে কাল পাত করিতেছেন, ভারতীয় মুসলমান আপনাকে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া মনে করে এবং ওই জীর্ণ প্রাচীন ছোরা-তলোয়ারগুলি কাঁধে কোমরে ঝুলাইয়া দিয়া সে মনে মনে স্বপ্ন দেখে যেন খলিফা কিম্বা কাবুলের বাদশাহ আসিয়াছেন, আর সে যেন তাঁহারই সেনাপতির মত ভারতবর্ষের কাফেরকে তরবারির নীচে ফেলিয়া কোরাণের কল্‌মা পড়াইতেছে।

হিন্দু তাহার পরাধীনতার মধ্যে একেবারে অসহায় হইয়া আছে। মুসলমান তাহা হয় নাই, কারণ সে মনে করে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য তাহার কিছুই নহে, ভারত-বর্ষের বাহিরে যে 'স্বদেশ' তাহার জন্য অশ্রুপাত করিয়া দিন গোঁয়াইতেছে তাহার সুদিন-দুর্দ্দিনই তাহার সত্যকার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের নিয়ামক, এমন কি ভারতবর্ষের দুর্দ্দিন যদি কোনো প্রকারে অন্ততঃ পক্ষে কাবুলের আমীর মহোদয়ের কথঞ্চিৎ সৌভাগ্য সূচনা করে ভারতবর্ষের মুসলমান বোধ করি সানন্দে আল্লার নিকট সেই দুর্দ্দিনের সমাগম কামনা করিবে। 'মুসলমান সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান, তাহার পর ভারতবাসী।' তাই তুর্কীর দুঃখ দেখিয়া ভারতবর্ষীয় মুসলমানের অশ্রুবন্যা বহিতে দেখিয়াছি, মসজিদে মসজিদে মুসলমান ভ্রাতাকে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু ভারতের কত দুঃখের দিন যায়, মুসল-মানকে সেজন্য কাতর হইতে দেখি না। ভারতের দুঃখে তাহার কি আসে যায়! মুসলমান তো আপনাকে পরাধীন মনে করে না! সে ভাবে যদি তেমন দিনই আসে জরু-জহরত লইয়া সেদিন খাইবার-সঙ্কট পার হইয়া গেলেই হইবে। পরাধীনতার ফাঁসি তাহার গলায় কোনোদিনই তাহার দম বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে না।

মারণ-মন্ত্র

শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বীরভূমে তখন জরিপ্ চলিতেছিল।

ঢেউ-খেলানো মাটির নক্সা কাগজে ওঠে। জমিদার বলে, আমার; প্রজা বলে, আমার। মাটি লইয়া কাড়াকাড়ি চলে।

অনেকদিন পরে বেকার গাঁয়ের লোকের যাহোক্ একটা কাজ মিলিয়াছে।

জমিজমা যাহাদের এক কাঠাও নাই তাহারাও মাঠে গিয়া হাজির হয়; সারাদিন মাঠের উপর রৌদ্রের ঝাঁঝে

খাড়া দাঁড়াইয়া থাকে। একটুখানি ফাঁক পাইলেই গণ্ড-গোল বাধাইয়া দেয়। হরিপদর জমি বলে কালীচরণের, আবার কালীচরণের জমি বলে সাধন তাঁতির।...লাগুক্ ল্যাঠা! তাহাদের কি!

এমনি করিয়া মজা দেখে।

আর বাড়ী ফিরিয়া বলে, "জমি জরিপ,—এ এক ঝক্‌মারি কাজ বাবা!"

বৌ বলে, "হাঁগা, সক্কলের যেতে হয় নাকি? তোমার যদি কিছু না থাকে—তা'ও?"

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া শশধর তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। বলে, "আল্‌বাৎ!"

খানাপুরীর পর বুঝারৎ। কেউ বলে গুঝারৎ, কেউ বলে গুজ্‌রুটি।

টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া কানুনগো-সাহেব আসেন। মাঠে গিয়া কাগজের নক্সা দেখিয়া নম্বর ডাক চলিতে থাকে। বলেন, "দলিল দেখি। দেখি কাগজ-পত্তর কি আছে তোমাদের!"

"দেখাই হুজুর।"—শশী তাহার ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা দপ্তরটি খুলিতে বসে।

কানুনগো বলেন, "জল্‌দি!"

কিন্তু জল্‌দি করিতে গিয়া শশীর মাথা খারাপ হইয়া যায়। অনেক হাতড়াইয়া শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর একখানি দলিল বাহির করিয়া বলে, "এই দেখুন হুজুর, মহামায়া দেবী,—দানপত্র আমার স্ত্রীর নামে। শাশুড়ীর দেওয়া।"

খবর শুনিয়া শাশুড়ীও আসিয়া দাঁড়ায়। ভিড় ঠেলিয়া কানুনগো-সাহেবের কাছে আসিয়া বলে, "না বাবা কানুন্-গুরু, ও আমি দেব না ওকে।"

শশী বলিয়া ওঠে, "বা—। দেবে না কি রকম?"

শাশুড়ী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দেয়, "না দেব না।"

দলিলটা লেখা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু এখনও রেজেষ্ট্রী হয় নাই।

কানুনগো জিজ্ঞাসা করেন, "রেজেষ্ট্রী করনি কেন?"

"কেন করিনি তবে তাই শোনো বাছা—!"

মাথার উপর চৈত্রের রৌদ্র। দাঁড়াইয়া থাকা ভার। কানুনগো বলেন, "থাক্। পরে শুন্‌ব।"

শাশুড়ী নাছোড়বান্দা, বলে, "না, তোমাকে শুনতেই হবে।"

কানুনগো ভালমানুষ।

শেষে বাধ্য হইয়া শুনিতে হয়।

ব্যাপারটা এমন বিশেষ কিছুই নয়।

—মেয়েটি তাহার অত্যন্ত আদরের। ওই একটিমাত্র মেয়ে। বুড়া জামাই-এর হাতে দিয়াছে,—ভাবিয়াছিল হয় ত সুখে থাকিবে। কিন্তু কেমন সুখে আছে—

"আমার কথায় বিশ্বেস না হয় ত' শুধোও বাছা তোমার ওই ভীমে মুচিকে।"

লাল কালির দোয়াতটি ধরিয়া ভীমে মুচি তখন তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল।—নামেই ভীম। দেখিতে যেন ঠিক তালপাতার সেপাই।

কানুনগো বলিলেন, "কি রে? তুই আবার কি জানিস্ এর?"

পাংলা খিড়্‌খিড়ে অস্থিচর্ম্মসার ভীম একটুখানি বাঁকিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, "আমি আর কি জানবেন হুজুর! ঠাকরুণ বলছেন—বলুন!"

ভীম কিছুতেই বলিতে চাহিল না।

শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ শেষে নিজেই বলিল, "বেশি বক্‌লে-ঝক্‌লে মেয়েটি আমার সইতে পারে না বাছা,—মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মুচ্ছো যায়।"

শশী এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "ভীর্‌মির ব্যারাম আছে হুজুর! পথ-ঘাট লোকজন কিছুই মানামানি নেই হুজুর,—যখন-তখন একেবারে সবার সাক্ষাতেই...ফট্ করে' দাঁতি লেগে গেল ত' বাস্...কাপড়-চোপড়—একেবারে যা-তা...

"ওই ভীমেই ত' একদিন পুকুরের ঘাট থেকে...বল্ না রে ব্যাটা!"

ভীমে কিন্তু এবারেও কিছু বলিল না, নীরবে একটু-খানি শুক্‌নো হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল।

শাশুড়ী বলিল, "আছে বাছা, আমিই ত' বলছি,—আছে। ভেবেছিলাম আমার এই ক'বিঘে জমি ওকে দিয়ে ওরই ঘরে থাকব গিয়ে। মেয়েটা তবু চোখে চোখে থাকতো আমার।"

কথাটা শুনিবামাত্র শশী তাহার মুখখানা কিম্ভুত-কিমাকার করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "এ্যাঁ! আগে বলতে কি হয়েছিল? বিয়ে কোন্ শালা করতো তাহ'লে?"

কানুনগোর ধমক খাইয়া শশী চুপ করিল।

মেয়েটি বলিল, "অত হতো না বাছা, ওর ঘরে গিয়ে অবধি বেশি হচ্ছে। ও যে...মেয়েকে আমার...মারে। মূর্চ্ছা গেলেই মেরে খুন করে' দেয়।"

বলিতে বলিতে গলাটা হঠাৎ তাহার বন্ধ হইয়া গেল, অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া নিজেকে সে আর সম্বরণ করিতে পারিল না, খপ্ করিয়া কানুনগো-সাহেবের হাতখানা ধরিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—"তোমার মেয়ে আছে বাবা?...আজ দুটি বচ্ছর মেয়ে আমার গেছে ওর ঘরে,—এর মধ্যে ওই পুজো-পাব্বন হলেই যা দূর থেকে মুখখানি একবার.."

কানুনগো-সাহেব হাতখানা তাঁহার ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "চুপ করুন—চুপ করুন! মেয়ে আপনার পাঠিয়ে দেব।"

কথাটা শুনিয়া একদৃষ্টে মেয়েটি তাহার মুখের পানে ক্ষ্যাপার মত চাহিয়া রহিল।—"রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকি বাছা,—বাঁশের মই দিয়ে খড়ের গাদার ওপর চড়ে ওই দিক পানে তাকিয়ে থাকি...তবু দেখতে পাই না—।"

শশী কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। কানুনগো-সাহেব বলিলেন, "আজই পাঠিয়ে দেবে। বুঝলে?"

শশী হাতজোড় করিয়া ঘাড় নাড়িয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "যে আজ্ঞে হুজুর!"

কানুনগো-সাহেব' অস্ত নম্বর ডাকিলেন, "সাত শ' চব্বিশ!"—মেয়েটিকে বলিলেন, "আপনি যান এবার!"

শশী বলিল, "ওই জমিটা হুজুর......

কানুনগোর ধমক খাইয়া শশী আবার চুপ করিল।—"ফের্ জমি?"

মহামায়া মায়ের বাড়ী গেল। কানুনগো-সাহেব নিজে দাঁড়াইয়া না থাকিলে শশী হয়ত পাঠাইত না।

সুন্দরী একটি মেয়ে। তাঁহারই কন্যার বয়সী। ঈষৎ ঘোম্‌টা টানিয়া গ্রামের পথে তাঁহার সুমুখ দিয়া সে পার হইয়া গেল।

ছাতা ও দোয়াত ধরিবার জন্য ভীম মুচি রোজ ছ' আনা করিয়া পয়সা পায়। তাম্বুতে গিয়া তাহাকে লইয়া আসিতে হয়।

মাঠের আল-রাস্তার উপর কানুনগো-সাহেবের ঘোড়া চলিতেছিল। পাশে ভীম।

কানুনগো বলিলেন, "ওরা তখন তোকে কী বলতে বললে রে? বল্‌লিনে যে?"

ভীম একটুখানি হাসিল।

কানুনগো আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে? কি কথা?"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভীমকে বলিতে হইল।

বলিল,—

শশীর ঘরে সে নাকি কৃষাণ ছিল।

একদিন পথে আসিতে আসিতে দেখে, পুকুরের ঘাটে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একটি মেয়ে পড়িয়া আছে,—ঠিক যেন মড়ার মত। কাছে যাইতেই ভীম একটুখানি অবাক্ হইয়া যায়,—তাহারই মনিবের স্ত্রী মহামায়া! কি করিবে ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারে না। কাছে লোকজনও কেহ ছিল না। অনেক চেঁচামেচি করে—কিন্তু কাহারও সাড়া মিলে না। শেষে নিরুপায় হইয়া মেয়েটিকে নিজেই সে আড়-কোলা করিয়া অতিকষ্টে ঘরে তুলিয়া আনে।

এই অপরাধ !

শশী বলে, "ওর গায়ে তুই হাত দিলি কেন বল্ !"—বলিয়া তাহাকে সে বেদম্ প্রহার করে। মারিয়া ঘর হইতে তাড়াইয়া দেয়।

চাল ধান তাহার যা-কিছু পাওনা ছিল কিছুই দেয় নাই।

কানুন্‌গো বলিলেন, "মেয়েটাকেও মেরেছিল ?"

ভীম বলিল, "আমাকেও যত, ওকেও তত,—আর একটু হলে ও মরে' যেতো বাবু! আর আমারও এই সব হাড়ে হাড়ে বেদনা ছিল তিন দিন।"

ভীম তাহার পাঁজরার হাড়গুলা দেখাইল।

বলিল, "ওখানে বললাম না হুজুর, অনেক সব লোক-জন ছিল...আর আমরা আজ্ঞে ছোটলোক..."

পথ চলিতে চলিতে তাহাদের অনেক কথা হইল।—ভীমের সংসারে ক'জন লোক, কেমন করিয়া তাহার সংসার চলে, ওই রোগা শরীরে সে খাটে কেমন করিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সংবাদ।

ভীম বলিল, "খাটি 'ধাদোসে' হুজুর, বহুৎ দিনের অভ্যেস তাই খাটি। না খাটলে ধরুন—ঘরে দাদা আছে, দাদার বৌ আছে, আমি আছি, আমার বৌ,—এতগুলি পেট চলে না হুজুর।"

"সারাদিন কাজ করে' তুই ত' এই ছ' আনা পাবি—তারপর ?"

ভীম বলিল, "এই ছ' আনা,. আমাদের বৌ আনবে চার আনা, আর জ্যোস্তা রাতে রাজার জঙ্গলে গাছ কাটা চলে,—হোতা পাই আট আনা।"

কানুনগো-সাহেব চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন।

ভীম আপন মনেই বলিতে লাগিল, "গাছ কাটা আর বেশিদিন চলবে না হুজুর, জঙ্গল প্রায় সাফ্ হয়ে এলো।...দোকানের সমদার ধার আছে হুজুর তিনটাকা...আর সেই শশী ঠাকুর ধান চাল কিছুই দিলে না, নফু শুঁড়ির কাছে ধার করেছি পাঁচটাকা, তার আবার সুদ্ আছে..."

কানুনগো বলিলেন, "তোর দাদা, দাদার বৌ,—ওরা খাটে না ?"

ভীম বলিল, "ক্ষেমতা থাকলেই ত' খাটবে হুজুর, দাদার ক্ষেমতা নাই।"

"আচ্ছা, তোর ওই ধার আমি শোধ করে' দেব।"

কথাটা শুনিয়া ভীম তাহার মুখে কিছুই বলিতে পারিল না,—শুক্‌নো একটুখানি হাসি হাসিয়া আবার সে পথ চলিতে লাগিল।

জ্যোৎস্না রাত।

গাছ কাটিবার জন্য বনে যাইবার আগে ভীম বলিল, "বৌ তুইও চল্ আজ,—পাতা কুড়িয়ে আন্‌বি একবোঝা।"

বৌ বলিল, "পারব না।—কেন, এত কিসের ? খেটে খেটে তুই মরছিস্ তুই-ই মরগে যা।"

ভীম তাহার চিরাভ্যস্ত হাসি একটুখানি হাসিয়া চুপি চুপি বলিল, "টাকা পেয়েছি দশটা।—জানিস ?"

টাকার কথা শুনিয়া বৌ একটুখানি চাঙ্গা হইয়া উঠিল, বলিল, "কোথা ?"

ভীম বলিল, "কানুনগো-সাহেব দিয়েছে।—দেখবি ?"

বৌ জোরে-জোরেই বলিয়া উঠিল, "দেখাগে তোর ভাইকে, দেখাগে তোদের বৌকে,—আমাকে কেন ?"

বেগতিক দেখিয়া ভীম আর কোনও কথা বলিল না, ধীরে-ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বড় ভাই সুধন উঠানে বসিয়া পায়ে একটা ন্যাকড়া জড়াইতেছিল, বলিল, "টাকা কিসের ? টাকা টাকা করছিলি যে ?"

মদের নেশা ধরিয়াছিল, ভীম বলিল, "টাকা দিয়েছে কানুনগো-সাহেব। দোকানের ধার আর নফুর টাকা।"

"বলিহারি !" সুধনের রক্তবর্ণ বড় বড় চোখদুটা যেন কপালে উঠিয়া গেল, বলিল, "বাঃ! বেশ বুদ্ধি যাহোক্! তুই মজা মার্ আর আমাদের বৌ তদ্দিন ন্যাকড়া পরে' পরে' বেড়াক্! কাপড় আনতে হবে না ?"

ভীম বলিল, "নফু যে দিনরাত তাগাদা দিচ্ছে—?"

সুধন বলিল, "ও ব্যাটা ত' অমনি দেয়! তা আর

কি করবি? এই যে আমার ঘরের চালে বিশ গণ্ডা ফুটো হয়েছে, খড়ও ত' কিনতে হবে দু'চার পণ,—না ভিজ্‌ব বসে' বসে' বর্ষার দিনে?"

নিরুপায় ভীম চুপ করিয়া রহিল।

সুধন বলিল, "কানুনগো-বাবুকে কই বলিস্ দেখি,—বলিস্ আমার ভাই বলেছে একজোড়া জুতো দাও ত' ঠাকুর! ছেঁড়া-খোঁড়া পুরনো হলেও হবে। বলিস্! বুঝলি?"

ভীম আর সেখানে দাঁড়াইল না। বলিল, "বলব।"

সুধনের বৌ ঘরের ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল, "বল্‌বে! না বললেই নয়! কি গুণের ভাই তোমার!"

"জানি গো জানি! সুদন মুচি ঘরে বসেই সব টের পায়! লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা জমাচ্ছে, আর আমাদের বেলাতেই...আমি যে বড় ভাই!—তোর যদি কোনোদিন সুখ হয় ত'·"

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত সুধন তাহার নুলো হাত দুইটি আকাশের দিকে তুলিয়া অনুপস্থিত ভ্রাতার উদ্দেশে বলিতে লাগিল, "হে ভগমান! হে ভগমান!"

পরদিন তাম্বু হইতে পয়সা লইয়া ফিরিবার সময় কানুনগো বলিলেন, "কি রে ভীম! তোদের গাঁয়ে ত' মস্ত ভোজ লেগে গেছে দেখছি।"

ভীম হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবুদের বাড়ীতে।"

"তোদের একদিন দেবে না খেতে? কাঙ্গালী ভোজন?"

ভীম আবার একটুখানি হাসিল মাত্র।

কানুনগো বলিলেন, "কাজ আমাদের তিন দিন বন্ধ থাকবে,—বুঝলি? গাঁয়ের কোনও লোকই ত' আস্‌তে পারবে না বলছে।—তোরও ছুটি।"

ভীম আবার হাসিল।

তাহার এই সরল সুন্দর হাসিটি কানুনগো-সাহেবের বড় ভাল লাগে।

বলেন, "আমাদের দেশে যাবি ভীম?"

ভীম জবাব দেয় না—শুধু হাসে।

তাহার এই হাসিটি কাহাকেও ডাকিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করে।

কানুনগো জিজ্ঞাসা করেন, "ছেলে মেয়ে হয়নি তোর?"

ভীম হাসিয়া বলে, "না হুজুর।"

কথায় কথায় ভীমের হাজ্‌রির কথা কানুনগো সাহেবের মনে থাকে না। তিনদিন ছুটি,—সেই ছুটির হাজ্‌রি!

ভীম খানিকদূর আসিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "ছুটি কি কাল থেকেই হুজুর?"

"হ্যাঁ, কাল থেকে তিনদিন।" বলিয়া খবরের কাগজটা কানুনগো-সাহেব হাতে লইয়া ডেক্-চেয়ারে হেলান্ দিয়া চুপ করিয়া বসেন।

ভীম যেন কি একটা কথা বলিবার জন্য উস্‌খুস্ করে। খানিক্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহার পর হঠাৎ এক সময় ডাকিয়া বসে, "হুজুর!"

"কি!"—কানুনগো হাত বাড়াইয়া কাগজখানা টেবি-লের উপর রাখিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলেন, "কি রে?"

ভীম বলে, "কুষ্ঠোব্যাধি কাকে বলে জানেন হুজুর?"

কানুনগো হাসিয়া বলেন, "কেন রে?"

"এক ভাইএর যদি ওই ব্যামো হয় ত' সব ভাইএর হবে হুজুর?"

"কেন বল্ দেখি?"

ভীম হাসিয়া বলে, "আমাদের পাড়ায় আছে একজনের তাই বলছিলাম আজ্ঞে।"

কানুনগো সাবধান করিয়া দেন, "দেখিস্ যেন তার কাছে ঘন ঘন যাওয়া-আসা করিস্‌নে ভীম। হয় বৈ কি! সব ভাইএরই হয়। ও ভারি খারাপ ব্যারাম।"

সেদিন বাড়ী ফিরিতে ভীমের একটুখানি দেরি হইয়া গেল।

সুধন হামাগুড়ি দিয়া রাস্তার কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়া বাঘের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া ছিল; ভীমকে দেখিবামাত্র সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "দেখ্‌গে তোর বৌ-হারামজাদীর কাণ্ড দেখ্‌গে।"

ভীম থমকিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

সুধন বলিল, "কাজ থেকে এলো,—হারামজাদীকে বললাম, বলি, দে পয়সা চার আনা—মদ আসুক, খাই। কিছুতেই দিলে না। বলে, মর্ না তোরা আমার কি? বলে' একটা ঠ্যাঙা উঁচিয়ে আমায় মারতে এলো।…দে মেরে'—পারিস্ ত' সবাই মিলে—মার্ আমায় মেরেই ফ্যাল্…ভগমান মেরেছে, তোরা মারবি তাতে আর আশ্চয্যি কি আছে!" বলিয়া সুধন ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভীম আর কোনও কথা না বলিয়া ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল। অন্ধকার ঘরের মেঝেয় আঁচল পাতিয়া বৌ তাহার উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, পা দিয়া তাহাকে নাড়িয়া দিয়া বলিল, "এই! ওঠ্!"

বৌ উঠিল না।

ভীম বলিল, "ফ্যাল্ হারামজাদী—পয়সা ফ্যাল্ বলছি! কেন দিস্‌নি পয়সা?"

বৌ তাহার খুঁট হইতে পয়সা চার আনা খুলিয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া ঘরের চৌকাঠের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অন্ধকারে পয়সাগুলা কোন্‌দিকে যে ছিট্‌কাইয়া পড়িল,—হাৎড়াইয়া খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন!

হঠাৎ কোন্‌দিক হইতে কি যে হইয়া গেল কে জানে! যাহা সে কোনোদিন করে নাই, আজ হঠাৎ রাগের বশে তাহাই সে করিয়া বসিল। বৌএর পিঠের উপর জোরে জোরে উপরি-উপরি কয়েকটা লাথি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "এত দেমাগ্ কেনে,—বলি, এত দেমাগ্ কিসের?"

বৌ আর না চাহিল বাট্—লাথি খাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। জোরে জোরে বলিতে বলিতে গেল,—"চললাম—চললাম—তোর ঘর হতে জনমের মত চললাম হতভাগা! দাদার ওই ছুলো পা চু'টো জিব দিয়ে দিয়ে চাট্ আর পড়ে থাক্ তুই হ্যাংলা কুকুরের মত,—আমি পারব না। গতর আছে খেটে খাব,—আর তোর মত ইয়ে আমি পঞ্চাশ গোণ্ডা জুটিয়ে নেব শুনে রাখ্। বিশ্বাস না হয় ত' চোখে দেখে আসিস্ একবার।"

কথাগুলা একে একে সবই তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল। প্রত্যুত্তরে একটি কথাও ভীমের মুখ দিয়া বাহির হইল না। দুয়ারের গোড়ায় চুপ করিয়া হতভম্ব হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নধু শুঁড়ি আজ কয়েকদিন টাকার তাগাদা করিতে আসে নাই, দোকানের টাকাও দেওয়া হয় নাই।

ভীমের মুখের সে হাসি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে,—চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া ঝিমায়! এ দিকের কাজ ত' বন্ধ,—জঙ্গলে কাঠ কাটিতেও যায় না।

কানুন্‌গোর দেওয়া দশটি টাকা হইতে বারো আনা পয়সা ভাঙিয়া দ্বিতীয় দিনের খরচ চলিয়াছে।

তৃতীয় দিনে মুচিপাড়ায় এক প্রকাণ্ড মজ্‌লিস!

বাবুদের বাড়ী সেদিন নাকি কাঙ্গালী-ভোজন।

মজলিসে পাড়ার প্রায় সকলেই আসিয়া জড় হইয়াছে। বুড়া ভূষণ মুচি মদ খাইয়া একটুখানি বেশি মাত্রায় মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ ভারিক্কি বলিতে পাড়ার মধ্যে সে-ই একা।

বলে, "বল্—ক্যাঙালী কাকে বলে বল্!"

কে একজন বলিল, "যারা খেতে পায় না—উপোস দেয়।"

ভূষণ বলিল, "তবে সেই তারাই খাক্।—আমরা খাব না। ক্যাঙালী আমরা নই। খাওয়াতে হয় আমাদের আলাদা করে' খাওয়াবে।"

ভাগাড়ে সেদিন একটা আস্ত গরু পড়িয়াছিল। মদের মাত্রা সেদিন সকলের একটুখানি বেশি হইয়াছে। বলে, "ঠিক্, ঠিক্! ক্যাঙালী কোন্ শালা বলে? আমরা ক্যাঙালী নই!"

ঝুলো সুধনও মজ্‌লিসের একপাশে বসিয়াছিল। সেও বলিল, "আলবাৎ! যেতেই যদি হয় ত' আমরা আলাদা যাব।"

মজ্‌লিসে সেদিন এই বলিয়া 'রায়' পাশ হইয়া গেল যে, মুচিপাড়ার কেহই যাইবে না। যদি যায় ত' সে পাঁচটাকা জরিমানা দিবে।

ঝুলো সুধন সায় দিয়া বার কতক ঘাড় নাড়িল।

ভীমও সেখানে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কেহ কোনো কথাই শুনিতে পাইল না। মনে হইল মদে তাহার সেদিন ভাল নেশা জমে নাই।

দশ টাকা—ন টাকা চার আনায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

আজও যদি কিছু খরচ করে তাহা হইলে আর ঋণ শোধ হয় না।

ভীম ভাবিল সে যাইবে,—হোক্ মজলিস্,—তাহারা কাঙ্গালী নয়'ত কী?

কাঙ্গালীদের চার আনা করিয়া দক্ষিণা, আর দু'সের করিয়া মুড়ি।

অত লোকজনের ভিড়ে তাহাকে চিনিবেই বা কে!

কিন্তু চিনিল।

এম্‌নি দুর্দ্দৈব,—মুড়ি ও দক্ষিণা লইয়া ভিড় ঠেলিয়া বাবুদের ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র ধীরু মুচির সঙ্গে ভীমের চোখোচোখি দেখা!

দুর্ব্বল ভীমের পা দু'টা তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে!

কথাটা মুচিপাড়ায় রাষ্ট্র হইতে দেরি হইল না।

ঝুলো সুধন গর্জ্জিতে লাগিল, "দিগে জরিমানা—যা, দিয়ে আয় টাকা! মেলা টাকা হয়েছে তোর—ছোটলোক চামার কোথাকার!"

ভূষণ মুচি হুঁকা টানিতে টানিতে জানাইয়া গেল,—ষোল-আনা মজলিসের কাছে কাল যেন ও সাত হাত নাকখৎ দিয়ে আসে, আর পাঁচ টাকা জরিমানা।

ভীমের মুখে কোনও কথা নাই। সে যেন বোবা!

আঁচলের মুড়িগুলা ও কাঙালী-বিদায়ের সিকিটি সুধনের কাছে নামাইয়া দিয়া ভীম বলিল, "খা।"

সুধন বলিল, "আর তুই?"

"আমি খেয়েছি।"

ঝুলো হাতে খাইবার উপায় নাই; বৌ তাহার মুঠা মুঠা মুখে তুলিয়া দেয়, আর ঝুলো সুধন প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া সশব্দে মুড়িগুলা চিবাইতে থাকে।

আর বলে, "দে—ঝপাঝপ্ দে,—তোল্!"

ঘরের ভিতর হইতে ভীম বাহির হইয়া আসিল। মাতালের মত টলিতেছিল। বলিল, "দাদা—আমার টাকা?"

ঝুলো যেন আকাশ হইতে পড়িল। হাঁ করিয়া বলিল, "টাকা কিসের?"

ভীম বলিল, "এই যে রেখেছিলাম হাঁড়ির ভেতর। নেই ত!"

সুধনের বৌ বলিল, "তা আমরা কি জানি? সেই হারামজাদী নিয়ে পালিয়েছে হয় ত!"

সুধন বলিল, "হ্যাঁ ঠিক,—এ সেই বৌ-ছুঁড়ির কাজ!"

কিন্তু বৌ তাহার চলিয়া যাইবার পরেও টাকা সে দেখিয়াছে।

বুঝিতে তাহার কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু বলিবার কিছু নাই।

বড়-বৌ তাহার এই টাকা চুরির প্রসঙ্গে আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল।

"এই মাগী ! দেখচিস্ কি হাঁ করে ? দে—ঝপাঝপ্ দে !"—স্বধন তাহার বিকৃত কদাকার বোয়াল্ মাছের মত মুখখানা হাঁ করিয়া একমুঠা মুড়ির জন্ত সাগ্রহে ওৎ পাতিয়া রহিল।

পরদিন প্রত্যুষে পাঁচটাকা জরিমানা দিয়া ভীম মুচির কাজে যাইবার কথা।

কিন্তু কানুন্‌গো আসিলেন, আমিন্ আসিল, গ্রামের লোকজন একে একে জড় হইতে লাগিল,—ভীম আর আসে না!

দুর্ব্বল মানুষ—হয়ত বা হঠাৎ কিছু অসুখ-বিসুখ হইয়া গেছে।

কানুন্‌গো বলিলেন, "চট্ করে' একবার খবর নিয়ে এসো দেখি!"

কিন্তু সংবাদ আনিবার জন্ত কাহাকেও যাইতে হইল না, সংবাদ আপনা হইতেই আসিয়া পৌঁছিল।...অতি নিদারুণ দুঃসংবাদ!

কানুন্‌গো-সাহেব একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়া সার্ভে-টেবিলটার উপর হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন।—"তুমি দেখে এলে নিজে?"

যে-লোকটা সংবাদ আনিয়াছিল, সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ হুজুর, গলায় দড়ির ফাঁস্ লাগিয়ে ঝুল্‌ছে।"

কানুন্‌গো আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিজের ঘরে? মরেছে? বল কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর একদম শেষ! চোয়াল দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, আধহাতখানেক জিব বেরিয়ে গেছে, মাছি ভন্ ভন্ করছে দেখে এলাম।"

"চলো!" বলিয়া কানুন্‌গো টেবিল ছাড়িয়া পথ ধরিলেন, "দেখে আসি—চল!"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই চলিল।

মুচি পাড়ার কাছাকাছি আসিয়া গোলমাল হট্টগোল শুনিয়া কানুন্‌গো-সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "ওর আর কে আছে ঘরে?"

"বৌ আছে হুজুর, আর এক দাদা আছে,—নুলো-কুঠে, কুষ্ঠব্যাধি হুজুর, একেবারে এম্‌নি—!"

দূরে একটা গাছের তলায় সাদা রঙের ঘোড়াটি তাঁহার ঘাস খাইতেছিল। কানুন্‌গো বলিলেন, "পারবে? ওকে কেউ ধরে' আনতে পার তোমরা?"

বলিবামাত্র দুজন লোক ছুটিয়া গিয়া ঘোড়াটিকে ধরিয়া আনিল।

কানুন্‌গো-সাহেব টপ্ করিয়া ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন।

কে একজন বলিল, "কাজ কি তাহ'লে আজ বন্ধ থাকবে হুজুর?"

তাঁবুর দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া টুপি নাড়িয়া বলিলেন, "থাক্!"

* * *

ঘোড়া ও ঘোড়্‌শোয়ার মাঠের উপর দিয়া তখন বহুদূর চলিয়া গেছে···

বনমালি বলিল, "এ ব্যাটাও ক্ষ্যাপা দেখছি,—মাথা গরমের ছিট্ আছে।"

মহামায়ার স্বামী শশী দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "সেদিন দেখলে না—?"

রাত্রি জাগিয়া কানুন্‌গো-সাহেব চিঠি লিখিতেছিলেন—

···মাটি জরিপ করিতে আসিয়া মানুষের কত লোভের সংগ্রাম দেখি, কত সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনিতে পাই ...ভীম মুচির কথা লিখিয়াছিলাম, বোধ হয় তোমার মনে আছে। শীর্ণ দুর্ব্বল সেই নিরীহ মানুষটির মুখে সহজ সুন্দর যে হাসিটি দেখিয়াছিলাম,—তোমাকে একটিবার দেখাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আর উপায় নাই। সে হাসি আজ চিরদিনের মত নিবিয়া গেছে। শুনিলাম সে হতভাগা নাকি গত রাত্রে গলায় দড়ির ফাঁসি ঝুলাইয়া

আত্মহত্যা করিয়াছে।...তাহার সেই শুভ্র নির্ম্মল হাসিটির আড়ালে প্রাণান্তকর এত বড় দুঃখ যে সে কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল কে জানে!

...মহামায়ার মা কাল আমার কাছে আসিয়াছিলেন। মায়ের মত মাথায় হাত রাখিয়া আমায় তিনি কত আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। বলিলেন, মহামায়া বলিতেছে, আর তাহাকে যেন তাহার স্বামীর ঘরে পাঠানো না হয়। পাঠাইলে সে গলায় দড়ি দিয়া জলে ডুবিয়া কিম্বা যে কোনও প্রকারে হোক্ আত্মহত্যা করিবে।...

আত্মহত্যা......

আমাদের ডেপুটি-সাহেব বলিলেন, 'টেম্পোরারি ইন্‌সেনিটি',—ভীমকে-পাগল বলিয়া এত বড় ব্যাপারটা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু পাগলামি হোক্,—ভুল হোক্ আর যা-ই হোক্, যে দুঃখ মানুষকে তাহার চির-আকাঙ্খিত প্রাণবস্তুটিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া অতীব নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতিত করিয়া অকস্মাৎ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করাইতে পারে তাহাকে অত সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

পারিলে হয়ত' অনেকখানি স্বস্তি অনুভব করিতাম।

আজ সারাদিন কোনও কাজ করিতে পারি নাই।

প্রতি ডাকে তোমায় চিঠি না লিখিলে ব্যথা পাও তাই এই চিঠিখানি লিখিতেছি।...

বিচিত্রা

পোনাবালিয়ায় মুসলমান জনতার উপর গুলি ছোঁড়া হয়, ফলে বহু মুসলমান হত ও আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যেও অনেকেই যে গুরুতর জখম হইয়াছে তার প্রমাণ ঘটনার সময় মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৪ আর বর্ত্তমানে মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২০। আহতদের মধ্যে আর কেহ কেহ মারা যাইতে পারে এমন সম্ভাবনাও আছে।

পোনাবালিয়ায় শিব-রাত্রি উপলক্ষে হিন্দুদের মেলা বসে। প্রতিবৎসর বহু হিন্দু নরনারী এই মেলা-ক্ষেত্রে সমবেত হয়। হিন্দুর গান-বাজনা কীর্ত্তন বা শোভাযাত্রায় এবার মুসলমানরা বাধা দিতে পারে, এই আশঙ্কা ছিল, এবং সেই জন্যই পোনাবালিয়ায় সশস্ত্র পুলিশ উপস্থিত ছিল; পুলিশ সাহেব ছিলেন, মহকুমা হাকিম ছিলেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও স্বয়ং উপস্থিত হন। কুলকাটি নামক স্থানে মুসলমানরা মসজিদে জমায়েত হয়, এবং হিন্দুরা যে সংকীর্ত্তন লইয়া আসিতেছিল তাহা বাধা দিতে সঙ্কল্প করে। মহকুমা হাকিম মুসলমানদের নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু-কীর্ত্তনকারীদেরও এদিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। হিন্দুরা অপেক্ষা করে। কিন্তু এদিকে মহকুমা হাকিম, পুলিশ সাহেব মুসলমানদের কিছুতেই বুঝাইতে সক্ষম হন না,—বা তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিতে পারেন না। হিন্দুদের কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া বে-আইনী, এবং সেই উদ্দেশ্যে জমায়েৎ হওয়া বে-আইনী জনতা ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও মুসলমান জনতা চলিয়া যায় না এবং কীর্ত্তনে বাধা দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া থাকে। জনতাকে জনৈক মৌলবী উত্তেজিত করিতেছিল। মুসলমান জনতা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কথায় নিরস্ত হইতে উদ্যত হইলে উক্ত মৌলবী জনতাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ধিক্কার দিতে থাকে। ইহাতে জনতা আরো উত্তেজিত হয়। মৌলবীকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। জনতা

হইতে কেহ কেহ লেজা লইয়া আস্ফালন করিতে থাকে, কেহ কেহ নাকি লেজা ছুঁড়িয়াও মারে। জনতার মারমুখী ভাব দেখিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাণ্ডি গুলি ছুঁড়িতে আদেশ দেন। ফলে গুলি ছোঁড়া হয়, বহু মুসলমান হত ও গুরুতর রূপে আহত হয়। পরে হিন্দুরা কীর্ত্তন লইয়া যায়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাণ্ডির কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মুসলমান নেতারা সভা সমিতি করিয়াছেন। আর হিন্দুরা যে পোনাবালিয়া ব্যাপারের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে মিলিয়া সরকারের কার্য্যে নিন্দা করিতেছেন না, সেজন্য মুসলমান নেতা স্যর আবদার রহিম প্রভৃতি হিন্দুদের নিন্দা করিয়াছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য, শুধু প্রতিবাদ নহে প্রতিকারের চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য।

স্যর আবদার রহিম পোনাবালিয়ার ব্যাপারকে সাম্প্রদায়িক মনে করেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতগুলি মানুষকে এই ভাবে মরিতে দেওয়া যায় কি না? প্রশ্ন যথার্থ গুরুতর। হিন্দুরও এ বিষয়ে যেমন কর্ত্তব্য রহিয়াছে, মুসলমানেরও তেমনি। এতগুলি মানুষকে এমন করিয়া মরিতে দেওয়া যায় না। কিন্তু স্যর আবদারের কর্ত্তব্য শুধু মিঃ ব্লাণ্ডির কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা নহে, হিন্দু নেতাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা নহে, স্বসমাজের মোল্লাদের ও নেতাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করাও তাঁর কর্ত্তব্য ছিল। তাহা তিনি করেন নাই বা করিতে সাহসী হন নাই। পোনাবালিয়ার হত্যার জন্য মিঃ ব্লাণ্ডি কতখানি দায়ী, হিন্দু নেতারা কতখানি দায়ী, আর বাঙ্গলা বক্সের গুরু মিঃ গজনভী প্রভৃতি নেতারা আর সামসুদ্দিনের মত মোল্লারা কতখানি দায়ী তাহাও হিসাব করিয়া দেখিলে পারিতেন।

পোনাবালিয়া-ব্যাপারে মিঃ ব্লাণ্ডিকে সরাসরি মুসলমানদের মত নিন্দা করা হিন্দুর পক্ষে বস্তুতই শক্ত। এসোসিয়েটেড প্রেস্‌ও ফ্রি প্রেস্‌ যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। তাহাতে প্রকাশ হিন্দুর ন্যায্য অধিকারে বাধা দিতে মুসলমানেরা লাঠি ও লেজা লইয়া সমবেত হইয়াছিল, এবং মোল্লাদের মুখে, ইসলাম বিপন্ন, এই কথা শুনিয়া গায়ের জোরে হিন্দুর শোভাযাত্রায় বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল।

অবস্থা দাঁড়ায় এই, মুসলমানরা সংখ্যায় বহু, আর জোর পূর্ব্বক প্রতিবেশীর ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দেওয়ার ঝোঁক যে তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান তাহা নিঃসংশয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দুরা আত্মরক্ষায় অক্ষম। এবং হিন্দুর অধিকার রক্ষা করা সরকারের কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্য পালন না করার অভিযোগ হিন্দুরা নিয়ত করিয়া থাকে। হিন্দুর ন্যায্য অধিকারে বাধা দিতে বহু সংখ্যক মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় হিন্দুর সাধ্য ছিল না মুসলমানদের জুলুম ঠেকাইয়া নিজেদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে। এদিকে মুসলমান নেতারা গুলির পরে মিঃ ব্লাণ্ডিকে যতই দোষ দিন আর হিন্দু নেতাদের যতই ত্রুটি ধরুন, কোন মুসলমান নেতাই, তা' স্যর আবদারই বলুন আর গজনবী সাহেবই বলুন, মুসলমানদের অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন নাই—বরং অনেক নেতাই যে কথায় ও কাজে অথবা নীরবে উস্কানির সাহায্য করিয়াছেন ইহা হিন্দুর বিশ্বাস। এমন অবস্থায় হিন্দুর শোভাযাত্রায় যেখানে মুসলমানেরা জোর করিয়া বাধা দিতে উদ্যত হয়, সেখানে যদি কোনও রাজকর্ম্মচারী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বের দিক হইতে তেমন সকল মুসলমানদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করেন তবে হিন্দুর পক্ষে তেমন রাজকর্ম্মচারীর কার্য্যের নিন্দা করা শক্ত। নিন্দা করিতে গেলে হয় হিন্দুকে মুসলমানদের অত্যাচার প্রতিরোধ করিবার সম্পূর্ণ ঝুঁকি

নিজেদের নিতে হয়, আর রাজকর্ম্মচারীর সাহায্য প্রার্থনার কথা তুলিতে হয় না, অথবা মুসলমান নেতারা মুসলমান সাধারণকে ন্যায় পথে চালাইবেন এই আশায় থাকিতে হয়। বলা বাহুল্য এই তিনটির একটির উপরেও হিন্দু পরম নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে পারে না।

মিঃ ব্লাণ্ডির কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে হিন্দুর স্বতঃই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মিঃ ব্লাণ্ডি যদি জনতা ছত্রভঙ্গ না করিতেন, হিন্দু আমরা তখনকার মত কি করিতাম, আর যে সকল মুসলমান নেতা এখন কথা কহিতেছেন, তখন তাঁহারা কোথায় ছিলেন? অবশ্য সরকারের উপর হিন্দু বা মুসলমানকে আমরা নির্ভর করিয়া থাকিতে বলি না, আত্মরক্ষার শক্তি ও সামর্থ্য যেমন মুসলমানের তেম্‌নি হিন্দুর সমভাবেই অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।—কিন্তু এ ক্ষেত্রে যখন দেখিতেছি, অল্প সংখ্যক হিন্দু সংখ্যাবহুল মুসলমানের দ্বারা নির্জ্জিত, এবং প্রতিকারের জন্য সরকারের সাহায্যপ্রার্থী—অথচ হিন্দু নেতাদেরও সাধ্য নাই, তাহাদের রক্ষা করেন, তখন যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারী প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন তবে হিন্দুর পক্ষে তেমন রাজকর্ম্মচারীর নিন্দা করা শক্ত।

* *

*

ইহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়াছে যে, হিন্দুর ন্যায্য অধিকারে অন্যায় রূপে হাত দিতে মুসলমান জমায়েত হয়। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, মিঃ ব্লাণ্ডির অন্যায়কারীদের প্রতিরোধ করাই তেমন ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য হইয়াছে। এখন কথা উঠিতে পারে, এত অধিক গুলি ছাড়া সঙ্গত হইয়াছে কি না?—ইহা নির্ভর করে জনতা কতটা উত্তেজিত হইয়াছিল তাঁহা নিশ্চিত জানার উপরে। এই সম্পর্কে মুসলমান তরফের কথায় আর সরকারী তরফের কথায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। সরকারী কথায় আর বে-সরকারী সংবাদদাতাদের কথায় সাদৃশ্য আছে। সুতরাং বিভাগীয় কমিশনার তদন্ত করিয়া কি রিপোর্ট দেন তাহা না জানা পর্য্যন্ত—মিঃ ব্লাণ্ডি মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন—কি না, ঠিক বলা শক্ত। এদিকে ম্যাজিষ্ট্রেটকে এক তরফা বাহবা দেওয়াও শক্ত। জনতা সত্যই কতটা বিপজ্জনক হইয়াছিল তাহা আগে জানিতে হইবে।

* *

*

স্যর আবদার রহিম প্রভৃতি মুসলমানরা ইহা জানেন যে, বাজনা বন্ধের চেষ্টা বাংলায় নূতন। এই বাজনা বন্ধের সূত্র ধরিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মুসলমানদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে। জোর করিয়া শোভাযাত্রা বন্ধের চেষ্টা ত আছেই, প্রতিমা ভঙ্গ মন্দির দগ্ধ বিগ্রহ অপহৃত হওয়াও বাংলায় নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানদের এই সকল অন্যায় কার্য্যে মুসলমান নেতাদের উস্কানি আছে কি না, জানি না, কিন্তু তাঁহারা যে এ সকল অপকার্য্যাদির নিন্দা করেন না—ইহা সত্য। আর অজ্ঞ মুসলমানদের ধর্ম্মের নামে যে মোল্লারা ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে, ইহাও তাঁহাদের অজানা নাই—তবু তাঁহারা নীরব। এমন অবস্থায় এই সকল অজ্ঞ হইলেও দুষ্কৃতকারী মুসলমানদের যদি কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী কঠোর হস্তে দমন করিতে অগ্রসর হন, হিন্দু তেমন কঠোর শাসনকে বরাভয় মনে করিবে, আশ্চর্য্য কি? ইহা নিশ্চিত যে এই সকল অজ্ঞ দুষ্কৃতকারীদের গুরু দণ্ডের জন্য যদি কেহ দায়ী হয়, তবে যাঁহারা বাংলায় বাজনাবন্ধের ধূয়া তুলিয়াছেন দায়ী তাঁহারাই।

* *

*

রাজপথে বাজনা বাজাইবার অধিকার জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই আছে এবং থাকিবে, ইহাই আমরা বিশ্বাস করি। বাংলার মুসলমানরা কেহ কেহ বলিতেছেন যে মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া গেলে ধর্ম্মহানি, অর্থাৎ ইস্‌লামসম্মত ধর্ম্মহানি ঘটে। কিন্তু বাংলায়

মুসলমানের।" এই কথাও যে সত্য নহে তাহা অ-বাঙ্গালী মুসলমান নেতা মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুবের কথায় প্রকাশ।

নয়া দিল্লীতে এসেম্ব্লির বৈঠকে এই বাজনার কথা উঠিয়াছিল। বাংলার মুসলমান সদস্য মিঃ কবিরুদ্দিন আহম্মদ, এই মসজিদের সম্মুখে বাজনার প্রশ্নকে ধর্ম্মের অন্তর্গত বলায় মিঃ ইয়াকুব বাংলার সদস্যকে যে ধমকানি দিয়াছেন তাহাতে মিঃ কবিরুদ্দিন আহম্মদ লজ্জিত হইয়াছেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে মিঃ ইয়াকুবের একটা কথার উত্তর দিতেও সাহসী হন নাই তাহা সবাই জানে।

মিঃ ইয়াকুব বলেন—"না, বাজনার প্রশ্ন ধর্ম্ম সম্পর্কিত নয়।"

উত্তরে মিঃ কবিরুদ্দিন বলেন, "কোরাণ কি বলে?"

মিঃ ইয়াকুব বলেন—"কোরাণ যখন পড়েন নাই, তখন কোরাণের কথা তুলিয়া কোরাণের অবমাননা করিবেন না। কোরাণের কোথাও এমন কথা নাই। আমি আহ্বান করিতেছি কেহ অগ্রসর হইয়া দেখান যে, কোরাণের কোথাও এমন কথা আছে যে, মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইয়া গেলে মসজিদের বা ধর্ম্মের অবমাননা হয়।"

এসেম্ব্লির উপস্থিত কোন মুসলমান সদস্যই মিঃ ইয়াকুবের কথার প্রতিবাদে কোরাণের কোন একটি বচন-ও উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। মিঃ কবিরুদ্দিন কোরাণ পাঠ করিয়াছেন কি না তাহা মিঃ ইয়াকুবের কথার প্রতিবাদ করিয়া কোরাণের বচন আওড়াইয়া প্রমাণ করা উচিত মনে করেন নাই। কাজেই কোরাণের কথার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে কি নাই তাহা বুঝা গেল না। তবে বাজনার কথা যে কোরাণের কথা নহে ইহা নিঃসন্দেহ। বাজনায় মসজিদের অপমান হয় এ কথা কোরাণের কথা নহে।—

* *

*

কিন্তু আমাদের কথা এই যে ইহা কোরাণের কথা হইলেও ইহা চরম কথা হইত না। ভারতবর্ষে কেবল মুসলমানের বাস নহে, এখানে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান-পার্শীর সমান অধিকার। তা' ছাড়া স্বাধীন ভারত ভারতের মানুষের অধিকার কোন সরিয়তের পাতা খুলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না। আজ কেহ যদি কোরাণ খুঁজিয়া এমন কথা বাহির করিতে পারিতেন যে, কোরাণ ভিন্ন আর সকল ধর্ম্মগ্রন্থই পোড়াইয়া ফেলা ইস্‌লামসম্মত, বা মন্দির ও গীর্জ্জার চূড়া দর্শন মুসলমানের পক্ষে হারাম—তা' ভাঙ্গিয়া ফেলাই ইস্‌লামসম্মত, তবে কি আমরা তা' বরদাস্ত করিতাম?

সরিয়ত বা বাইবেল, বেদ বা গীতা মানুষের অধিকারকে স্বীকার করে ভাল, না করে, মানুষের অধিকার আজ মানুষই নির্দ্দেশ করিবে। সরিয়তের পাতা খুলিয়া আজ মানুষের অধিকার সাব্যস্ত করা চলিবে না। তাই আজ রাজপথে বাজনা বাজিবে কিনা ইহার মীমাংসা সরিয়তের মারফতে করিতে চাহি না। সেই মীমাংসার ভার আজ লইবে মানুষের স্বাধীন সত্ত্বা—রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক চেতনা। গণতন্ত্রের চেতনা যেখানে সত্য হইয়া দেখা দেয় সরিয়তের জীর্ণ পাতার অনুশাসন সেখানে অমোঘ নহে,--সেই কথা মুক্তি-পথের যাত্রী কামাল পাশার নব্যতুর্কী-সমাজ দেখায় নাই কি? রাজনীতিতে মহাত্মা একদিন জামায়ৎ উল উলেমার মৌলানা-মোল্লার মতামতের প্রাধান্য দিয়াছিলেন, তাহার দুর্ভোগ আজিও জাতি ভুগিতেছে। সুতরাং রাজ পথে বাজনা বাজিবে কিনা, এই কথার মীমাংসাও আমরা সরিয়তের পাতা খুলিয়া করিতে চাহি না।—আজিকার মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মানুষই স্থির করিবে, কোরাণ বেদ বাইবেল তাতে সায় দেয় ভাল, না দেয় কোরাণ বেদ বাইবেল মাথায় থাকুক—জয় হউক মানুষের, জয় হউক মনুষ্যত্বের, জয় হউক স্বাধীনতার।

* *

*

পোনাবালিয়া-ব্যাপারের পর বরিশালে মুসলমানদের অত্যাচার বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারের উপর মুসলমান নেতারা যতই উষ্মা প্রকাশ করুন, প্রতিকার ঐ পর্য্যন্তই।

পোনাবালিয়া-ব্যাপারে মুসলমান নেতাদের স্বসমাজের দোষ ক্রটি শোধরাইবার যে চেষ্টা করা সঙ্গত ছিল, তাহাও অনেকে হিন্দুবিদ্বেষ বশতঃ, কেহ বা সৎসাহসের অভাবে করিতে পারেন নাই। কিন্তু পোনাবালিয়ার দুর্ঘটনার প্রতিশোধ অগত্যা হিন্দুর উপরে নির্য্যাতন করিয়া লইবার ইচ্ছা বরিশালের এক শ্রেণীর মুসলমানের মনে দেখা দিয়াছে। ফলে, বরিশালে বহু হিন্দু দেববিগ্রহ মন্দির লুণ্ঠিত অপহৃত ও দগ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। মন্দির বিগ্রহ ভাঙ্গিলে হিন্দু-ধর্ম্ম রসাতলে যাইবে, ইহা আমরা মনে করি না। কোন অত্যাচারে কোন ধর্ম্ম লুপ্ত হয় নাই। বরং অত্যাচারে হিন্দুর সংহতি বাড়িতেছে ও বাড়িবে। দেববিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম রসাতলে দিতে পারিবে, এমন বিশ্বাস যদি কাহারও থাকে তবে সে ভুল ভাঙ্গিবে। যে হিন্দু তেত্রিশ কোটি দেবতার সন্ধান করিতে পারিয়াছে, সে হিন্দু অপহৃত দেববিগ্রহকেও সসম্মানেই মন্দিরে স্থান দিতে পারিবে। শুধু তাই নহে, যে ভাঙ্গা দেউলে পূজকের অভাবে আরতি বন্ধ হইতেছিল, আজ মুসলমানের অত্যাচারে নব পূজারীর সমাগমে সেই ভগ্ন দেউলে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিবে। মুসলমানের বারম্বার নারী নির্য্যাতনেই না আজ নিগৃহীতা হিন্দু নারীকে হিন্দু সমাজ সমাজে স্থান দিয়া সমাজের সমস্যা মীমাংসা করিতে বসিয়াছে? অত্যাচারে হিন্দুর মঙ্গলকেই সম্ভব করিবে। শতধা বিভক্ত হিন্দু, হিন্দু হইয়া উঠিবে। সংহতির প্রভাবে সে আত্মরক্ষায়ও পিছাইয়া পড়িবে না। সংখ্যার অল্পতা সে অন্যান্য শক্তির দৌলতে শোধরাইয়া লইবে।

কিন্তু আজ হিন্দুর কাছে ও মুসলমানের কাছে ভারতের বৃহত্তর প্রশ্ন—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রশ্নই উপস্থিত। আজ সাম্প্রদায়িক চেতনা পরিহারেরই তাগিদ' আসিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, মার্জ্জিতবুদ্ধি ব্যক্তিদের একথা স্মরণ রাখিতে বলি। জাতীয়তার খাতিরেই যেন তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের কথাগুলি বিচার করিয়া দেখেন।

* * *

হীরালাল আগরওয়ালার হত্যাপরাধে নেপালী যুবক খড়্গ সিংহ বাহাদুর অভিযুক্ত হন। বিচারে খড়্গ সিংহের ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছে।

সাধারণ খুন-জখম হইতে এই হীরালাল আগরওয়ালার খুনে তফাৎ আছে।

কোন প্রকারের হত্যা সমর্থন করাই অসম্ভব। কিন্তু হত্যাকারী মাত্রকেই অশ্রদ্ধা করা যে আরও অসম্ভব, তাহাই এই নেপালী যুবক খড়্গ সিংহ স্বীয় কার্য্যে ও কথায় দেখাইতে পারিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এই হত্যা নহে, ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই হত্যা নহে, খড়্গ বাহাদুর সমাজে নারীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মরিয়া হইয়া হত্যা করিতে অগ্রসর হইয়া ছিলেন—এই কার্য্যের ফলে তাঁহার যে ফল ভোগ করার সম্ভাবনা ছিল তাহা জানিয়াই তিনি আগরওয়ালাকে আঘাত করিয়াছিলেন—।

* * *

আমরা সবাই জানি, এই কলিকাতায় বালিকা ও যুবতীদের লইয়া অনেকে পাপ-ব্যবসায় চালাইতেছে। আদালতে কতক সাজা পায় বটে, কিন্তু যে সকল ধনী ও পদস্থ লোকের সাজা হওয়া আবশ্যক তাহারা ধনী ও পদস্থ বলিয়াই সাজা পায় না।

রাজকুমারী নেপালী বালিকা। জনৈক নেপালী পাপ-ব্যবসায়ী রাজকুমারীকে ফুসলাইয়া কলিকাতা আনে এবং হীরালাল আগরওয়ালার কাছে তাহাকে বিক্রয় করে। বালিকার কথায় প্রকাশ হীরালাল এবং হীরালালের আরো অনেক সঙ্গী তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। খড়্গ বাহাদুরও বালিকার মুখেই মর্ম্মান্তিক কাহিনী, মাতৃজাতির সতীত্ব মান ইজ্জত লুঠেদের কুকীর্ত্তি-কাহিনী শুনেন। খড়্গ বাহাদুর নিজেই বলিতেছেন—

"যখন রাজকুমারীর ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন উহার প্রতি সমিতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি বালিকাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহার নিকট যে সকল করুণ, রোমাঞ্চকর কাহিনী শ্রবণ করি তাহা এখনও মনে হইলে নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠি—আত্মহারা হইয়া যাই।

"এই অত্যাচারের আংশিক কাহিনী আদালতে প্রকাশিত হইয়াছে—শ্লীলতার অনুরোধে পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা যায় না। তবে সাধারণের অবগতির জন্য এইটুকু বলা দরকার—কলিকাতা এবং অন্যত্র কতকগুলি ধনী লোক এইরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। তাহারা সম্ভ্রান্ত এবং সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত বলিয়া কেহ কোনও সন্দেহ করে না। কিন্তু তারা যেন মনে রাখে—আমরা সকলকে চিনি, তাহারা যে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে ইহা যেন মনে না করে। যেন মনে রাখে একদিন তাহাদের নাম প্রকাশিত হইবে—এই সমাজের রোষাগ্নি তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে।"

কেন খড়্গ বাহাদুর আগরওয়ালাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন তাহাও বলিতেছেন। ১৩ বৎসর বয়স হইতে তিনি অহিংসবাদী। মহাত্মার শিষ্য। কিন্তু নারীর নির্য্যাতন তাঁহাকে বিচলিত করে।

"হত্যাকাণ্ডের তিনটি কারণ বলিতেছি :—

(১) বলপূর্ব্বক বালিকা-হরণ ও অকথ্য অত্যাচার।

(২) বালিকা আমার দূর সম্পর্কিত ভগিনী এবং নেপাল রাজবংশে তাহার জন্ম। ইংরাজ জুরিগণ বেশ উপলব্ধি করিবেন এই ব্যাপারে রাজভক্ত প্রজার মনে কিরূপ ব্যথা লাগে।

তৃতীয় কারণ—হীরালাল প্রকাশ্যে নেপালী রমণী-সমাজকে কুৎসিৎ ভাষায় গালি দিয়াছে, রাজকুমারীকে বেশ্যা বলিয়াছে এবং নেপালী কুকুর তাহার মত সিংহের কিছুই করিতে পারিবে না বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছে। তাহার ধারণা ছিল, অর্থবলে সে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, কিন্তু অর্থ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। অর্থ পাপের পথ পরিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু বাঁচাইতে পারে না। এই হত্যার অন্য কারণ, রাজকুমারীর দুর্দ্দশা, পীড়া, এবং তার অসহ্য যাতনা।

উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য আমি এই কার্য্য করিয়াছি।"

খড়্গ বাহাদুর জুরিদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"আমি কিরূপ সুন্দর ভাবে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি আপনারা বুঝিতেছেন। নীতির দিক দিয়া হউক, বা আইনের দিক দিয়া হউক, আমি কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই। পাপের নিবৃত্তি ও পাপীর শাস্তি যদি আইনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে যাহা করিয়াছি, মাতৃজাতিকে ইন্দ্রিয় সুখভোগের যন্ত্রস্বরূপ হইতে বাধা দিবার জন্য যাহা করিয়াছি. তাহা মহান্ কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে ইংরাজ জাতি শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও উহা স্বীকার করিবেন।

"আমি পুনরায় বলিতেছি, নীতি ও আইনের চক্ষে আমি নির্দ্দোষ। তবু যদি আপনারা মনে করেন, ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া অন্যায় করিয়াছি—যদি মনে হয়, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া এই সকল ব্যাপার দেখাই উচিত ছিল—যদি মনে করেন, এই ব্যাপার সংঘটন করিয়া সমাজের ক্ষতি করিয়াছি, তাহা হইলে আমাকে চরম শাস্তি দিন, আমি তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছি। আমি বধ্য-মঞ্চে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়া শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করিব—যেন মর্ত্ত্যধামে সকলে মাতৃজাতির সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারগ হয়, যেন নারীজাতি ধার্ম্মিক ও নরগণ বীরত্বের মূল্য বুঝে, যেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক আদ্যাশক্তির অংশরূপে বিরাজ করেন এবং প্রত্যেক রক্তপিপাসু দুর্ব্বৃত্ত পশু নারীজাতিকে অপমান করিতে কম্পিত হয়, তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম করিতে শিখে।"

* *
*

খড়্গ বাহাদুর নেপালী হিন্দু। যে সমাজে যে দেশে এমন তেজস্বী, বীর, সত্যবাক্, সত্যাগ্রহী ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ

করেন সে জাতি সে দেশ ধন্য। খড়্গা বাহাদুর কোন উত্তেজনার বশে এ কার্য্য করেন নাই—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তিনি যথার্থ বীরত্বের আদর্শ অটুট রাখিয়াছিলেন।—

খড়্গা বাহাদুরের আইনের বিচারে সাজা হইয়াছে। কিন্তু এ কথা সত্য বিচারকদের যদি কখনো দয়ার্দ্র চিত্তে লঘু দণ্ডের বিধান করিতে হয়, ইহা তাহার ক্ষেত্র। যে ধারায় সাজা হইল এই ধারায় এই হাইকোর্টেই ২।১ বছরের সাজা হইয়াছে, এমন নজির আছে। যাক্, এজন্যও আমরা দুঃখিত নহি। কারণ খড়্গা বাহাদুর মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া মানুষের বুক গর্ব্ব-সুখে ভরিয়া দিয়াছেন, আজ তাঁহার সাজার দুঃখের কথাও মনে আসে না। আইন মানুষকে খুন করিবার অনুমতি দিতে পারে না। কিন্তু আজ আইনের হাত এড়াইয়া যাহারা দুর্নীতির জুড়িগাড়ী সমাজের বুকের উপর দিয়া হাঁকাইয়া চলিয়াছে, নারীর ইজ্জৎ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, সমাজের শীলতা নীতি-ধর্ম্ম যাহারা পায়ে দলিয়া সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে—রাজ-শাসন বা সমাজ-শাসন যখন তাহাদের স্পর্শ করে না, তখন খড়্গা বাহাদুরের মত বীর যুবক সেই অত্যাচারের প্রতিরোধে যদি মরিয়া হইয়া প্রতিকারের জন্য অসি উত্তোলন করেন, তাহার সাজা বর্ত্তমানের আইন দিবে, কিন্তু সমাজ ও রাজশক্তি আজ সাজা দেওয়ার মুখে ইহা স্বীকার করুন, যে, অন্যায় পাপ আমাদের রোধ করা কর্ত্তব্য ছিল। আমাদের অক্ষমতায় তুমি তাহা রোধ করিতে গিয়াছ,—তোমার এই কার্য্য-প্রণালী আমরা আইন ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা-রক্ষার খাতিরে সমর্থন করিতে পারি না বটে, কিন্তু তোমার উদ্ভব যে আমাদের অক্ষমতার ফলেই হইয়াছে, ইহা স্বীকার করি, ও লজ্জায় মাথা নত করি। তোমাকে সাজা দিয়াও তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

মত মানুষকে খুনী সাজিতে হয়, আইনের রক্ষকরা ইহা বোঝেন কি?

তোমাদের অক্ষমতায় তোমাদের লজ্জা না হইতে পারে, কিন্তু যে প্রাণ সত্যই বীরের প্রাণ সে প্রাণ ত নারীর এই অত্যাচার নীরবে বরদাস্ত করিতে পারে না, পারিবে না। তোমাদেরই ত্রুটিতে রাজকুমারীর দুঃখ বাড়িতেছে, ধনী বদমায়েসদের অত্যাচার বাড়িতেছে, আর খড়্গা বাহাদুরের মত অমূল্য প্রাণ আকুল হইয়া শেষে তোমা-দেরই কারাগারে নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে।

নারীনির্য্যাতনকারীরা যখন আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সমাজে বিচরণ করিতে থাকে, সমাজের বা আইনের যখন দুষ্কৃতকারীদের সাজা দেওয়ার সাধ্য থাকে না—বা আইন ও সমাজ যখন নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নহে, তখন নারীর অসম্মানে মর্ম্মাহত হইয়া নারী-নির্য্যাতন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ নারী-নির্য্যাতনকারীকে সাজা দিতে অগ্রসর হয়, তাঁহাকে আমরা প্রশংসা করিবই। আইন হয়ত বলিবে, সবাই যদি মহৎ উদ্দেশ্যের নাম করিয়া আইন নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে যায়, তবে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে না কথাটা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে—এমন সময় মানুষের কাছে উপস্থিত হয়, যখন মানুষ আইনের পাতা না খুলিয়া অর্থাৎ আইন আমাকে এই অধিকার দিয়াছে কি না, সে কথা বিচার না করিয়া—মনুষ্যত্বের আদেশে দুষ্কৃতকারীর সাজার ব্যবস্থা নিজ হস্তে গ্রহণ করে।—

খড়্গা বাহাদুর মনুষ্যত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়া মনুষ্যত্বেরই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।—আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করি—তুমিই সত্যের বীর বান্দা।

যথার্থ বীরত্ব দেখিলে মানুষ আকৃষ্ট হয়। এমন কি মানুষ যদি ভ্রান্ত ধারণায় পরিচালিত হইয়াও কোন

আইনের রক্ষকদের অকর্ম্মণ্যতার ফলেই এমন মানুষের

স্তঞ্জয়ার বীরত্ব প্রেথায় ঐ ভ্রান্তি সত্বেও তাহার তেজস্বিতার মূল্য দেয়। খড়্গ বাহাদুরের মুখ্যে কোন ভ্রান্তি নাই। নারীনির্য্যাতনকারীর সাজা হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা মানুষের নীতি আইন সবই সমর্থন করিবে। তবে সাজা দিবার অধিকারী আইন, না, খড়্গ বাহাদুর এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। আইন অস্বীকার করিলেও মানুষ যখন দেখে যে আইন নিজ কর্ত্তব্য করিতে পারে না, তখন মানুষের নিজ হস্তে আইন গ্রহণ করার ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার আছে কি না, তাহা মানুষের সুস্থ ধর্ম্ম-বুদ্ধি বলিয়া দিবে।

এ ছাড়াও খড়্গ বাহাদুর শেষ পর্য্যন্ত যে ভাবে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন তেমন তেজস্বিতা ও বীরত্বের জন্য মানুষের মুখ হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইয়া পড়ে—, বাঃ বাহাদুর বাঃ। উত্তেজনার মুখে কোন শক্ত কাজ করা এক কথা,আর ঐ কার্য্যের ফল-গ্রহণে শেষ পর্য্যন্ত শক্ত সংযত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা আর এক কথা।

* *

*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী আবদুল রসিদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।—ধর্ম্মের নামে এমন অধর্ম্ম ও জঘন্য হত্যা বর্ব্বরতার নিদর্শন। কোন কোন মুসলমান সহযোগী লিখিতেছেন, আবদুল রসিদ আইনের চক্ষে দোষী হইল, কিন্তু ইস্‌লাম মতে সে স্বর্গে যাইবে। ইস্‌লামের মত যদি ইহাই হয় (কখনো ইহা ইস্‌লামের মত নহে—কোন ধর্ম্মেরই ইহা মত হইতে পারে না) তবে বলিতেই হইবে সে ইসলাম বর্ব্বরের জন্য। কিন্তু তাহা যে নহে, ধার্ম্মিক মুসলমানদের উক্তি হইতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

আবদুল রসিদ ভ্রান্ত-ধারণায় পরিচালিত হইয়া ঐ বিশ্বাসের জন্যই যদি হত্যা-কার্য্য করিত, আর শেষ পর্য্যন্ত নিজ বিশ্বাসে অচল অটল থাকিত, তবু মানুষ তাহাকে এই বলিয়া মনে করিত যে, না লোকটা ভ্রান্ত বটে, যথার্থ ধর্ম্ম-বুদ্ধি তাহার নাই বটে, কিন্তু লোকটা সাহসী বীর, নিজে যাহা বিশ্বাস করিয়াছে তাহা করিয়াছে, আর সেই কার্য্যের ফলস্বরূপ সকল দণ্ডই সে হাসি মুখে বিশ্বাসের জোরেই বহন করিতে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ব্বরতার মধ্যেও যতটুকু সাহস ও বীরত্ব থাকে তা' মানুষকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আবদুল রসিদের বর্ব্বরতার মধ্যে তাহা আছে কিনা দেখা যাক্।

সে 'কাফের'কে মারিয়া স্বর্গে যাইবে প্রথমটায় এমন আশা করিয়াই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল—সে বেচারী নিজে এবং তাহার আর সব মুসলমান ভ্রাতারা শেষ পর্য্যন্ত এতে বিশ্বাস রাখিতে পারে নাই। এর পরই যে পাগলামীর অভিনয় সুরু হইল তাতে বর্ব্বরোচিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মধ্যেও যে নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা মানুষের ভাবুকতাকে আকৃষ্ট করে তাহা নাই।

কোন লোক যদি বলে যে, আমি এই কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছি—সুতরাং এই হত্যা করিলাম; এর ফল যাহাই হউক আমি ধর্ম্ম-কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপই সেই দুঃখ বরণ করিব;—কিন্তু কার্য্যতঃ যখন তাহার কৃত কার্য্যের ফলে আইনের দণ্ড আগাইয়া আসে, তখন ভড়কাইয়া যায়, তথাকথিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস লুপ্ত হয়, মাথা নোয়াইয়া আসে, পাগলামীর ভাণ সুরু হয়, তখন তেমন হতভাগ্যকে জনসাধারণ যে কেবল হত্যাকারী বলিয়াই মনে করে তাহা নহে, তাহাকে কাপুরুষ হত্যাকারী বলিয়াই ঘৃণা করে।

শ্রী নলিনীকিশোর গুহ

নীলিমা বসু

এই সেদিন 'কল্লোলে' যাঁর 'বুড়ো-ঝি' পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে সত্যকারের বিশেষত্ব নিয়ে একজন নতুন লেখিকা প্রবেশ করেছেন দেখে আশান্বিত হয়েছিলাম, আজ হঠাৎ তাঁর অকাল মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে ভাবিনি। মৃত্যুকে হয়ত জীবনের ছন্দে অপরিহার্য্য ছেদ হিসাবে নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু অকাল মৃত্যু যে আমাদের বিমূঢ় মনকে বেদনায় বিহ্বল করে' তোলে, একথা ত কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না।

সাহিত্যে নীলিমা বসুর দান সত্য সত্যই আঙুলে গোণা যায়; কিন্তু সেই ক'টি লেখাতেই তিনি রচনাভঙ্গি ও বিষয়-বস্তুর নির্ব্বাচনে যে বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা' দুর্লভ বল্লে বেশী বলা হয় না। তাই তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে শুধু তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারেরই ক্ষতি নয়, সাহিত্যেরও ক্ষতি; তাঁর লেখার স্বল্পতা ও প্রচারের অভাবে সে ক্ষতি আজ সাহিত্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হোক্ বা না হোক্।

এখনও সাহিত্যের বাজারে লেখার চাতুর্য্যের চেয়ে লেখার প্রাচুর্য্যে লেখক বা লেখিকার নাম ও দাম যে সহজে বাড়ে তা জানি, কিন্তু সে-সঙ্গে এটাও মানি যে, সাহিত্যের সবটাই বাজার নয়, বিচারাগারও একটা আছে।

সে-বিচারাগারে নীলিমা বসুর লেখা উপেক্ষিত হবে না, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশেষ করে' তাঁর দু'টি গল্পের নাম করব। 'কল্লোলে' প্রকাশিত তাঁর 'ঝরাফুল' ও 'কালি-কলমে' প্রকাশিত তাঁর 'গোপন ধারা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন সাহিত্যে নতুন ব্রতী হ'লেও তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি, যে সংযম, যে নিপুণতা, যে দরদের পরিচয় দিয়েছেন তা' সহজলভ্য ও সাধারণ নয়।

১৩ই চৈত্র, '৩৩।

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র

কালি-কলম

নিবেদন

আগামী বৈশাখে 'কালি-কলম' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে।

যাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরে 'কালি-কলমের' গ্রাহক আছেন, আশা করি আগামী বৎসরেও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন।

একান্তই যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা দয়া করিয়া ইহা আমাদিগকে ১লা বৈশাখের মধ্যে জানাইবেন। নতুবা বৈশাখ সংখ্যার কাগজ যথাসময়ে তাঁহাদিগকে ভিঃ পিঃতে পাঠান হইবে।

যদি কেহ মণি-অর্ডার যোগে টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাও পাঠাইতে পারেন। বরং সেইটাই সুবিধাজনক। কেননা ভিঃ পিঃতে টাকা পাইতে কখনও-কখনও বিলম্ব ঘটে, এবং সেজন্য পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে গোল হয়।

বর্ত্তমান বৎসরের সম্পূর্ণ সূচীপত্র আগামী বৈশাখ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহাদিগকে পরে স্বতন্ত্রভাবে উহা পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

বন্ধু ও হিতৈষীবর্গকে বর্ষ-শেষের নমস্কার নিবেদন করি।

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী—কর্ম্ম-সচিব